বীরেন দাশ

মহাত্মা গান্ধী

—কে

লেখকের কথা

এই উপন্যাসখানি রচনার পেছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। অধুনালুপ্ত ইনফরম্যাশন ফিল্ম-এ চাকরীতে নিয়োগকালে গান্ধীজি প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education) নিয়ে একটি Documentary Filmএর গল্প (Script) তৈরী করার ভার আমার উপর পড়ে. এই উপলক্ষে জনকয়েক শিক্ষাবিদের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়। কয়েকটা বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রও আমি পরিদর্শন করি। 'নতুন পাঠশালা' রচনার মোটামুটি ইতিহাস এই।

দ্বিতীয়ত এই বই-এ গ্রাম ও গ্রাম্য পাঠশালার যে ছবি এঁকেছি, বলা বাহুল্য, তার সঙ্গে আমার নিজের গ্রাম, পাঠশালা ও বাল্যজীবনের স্মৃতি আংশিক জড়িত। (তা বলে আমাকে এ-কাহিনীর নায়ক বলে যেন ভুল না করেন!) গ্রামের তাঁতি ও চাষীরা, কুসীদজীবী মহাজন, কবিরাজ, পাঠশালার পণ্ডিত—এঁরা সব আমার নিজের গ্রামের লোক। এখনো আমার মনে পড়ে ঈশ্বর মাষ্টারের জন্য অপেক্ষা করে করে এক একদিন দুপুর গড়িয়ে পড়ত; তবু তাঁর দেখা নেই। তখন আমরা নিজেরাই পাঠশালার ঘণ্টা বাজিয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়তাম। ঈশ্বর মাষ্টার যে মাইনে পেতেন, পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। তাই গ্রামের মহাজনের বাড়ীতে তিনি মুহুরীর কাজও করতেন। ঈশ্বর মাষ্টারের বাইরের দিকটা যতই কর্কশ হোক, তাঁর মনটা ছিল বড় নরম। তাই তাঁর পাঠশালায় কখনো কোন ছাত্র ফেল করত না। ঈশ্বর মাষ্টার বহুকাল বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর চরিত্র আমার মনের উপর যে দাগ কেটেছে, 'নতুন পাঠশালার' পণ্ডিতই তার প্রমাণ।

আমার সেই অতি-পরিচিত পাঠশালায় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করতে গিয়ে যে নাটকীয় ও হাস্য-রসাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, পাঠকের কাছে তা উপভোগ্য হবে আশা করি। বস্তুত বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে এত বেশী আলোচনা হয়েছে যে, এর সম্যক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলবার নেই। ভারতের লক্ষ লক্ষ নিমজ্জমান গ্রামগুলোকে একমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষাই আবার আলোকোজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে পারে।

পরিশেষে আর একটা কথা না বললে, আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রবাসে বাংলা সাহিত্যের সেবা করা প্রেরণা ও উৎসাহ সাপেক্ষ। (এই বইখানির রচনাকাল ১৯৪৬ইং; স্থান—বোম্বাই)। নতুন পাঠশালা কখনো সম্পূর্ণ হত না, যদি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, শ্রীমতী পূর্ণারাণী পাল চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বিশ্বতোষ পাল আমাকে নিয়মিত উৎসাহ দান না করতেন। এঁদের আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

৩৫।১।এ বাদুরবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বীরেন দাশ

বীরেন দাশের লেখা

ছোটদের বই

খেলাঘর

রুমমেট

লক্ষ্মী ও দস্যি মেয়েদের গল্প

রাঙামাটির পাঠশালা

সহর ও রেল-লাইন থেকে অনেক দূরে ছোট্ট গ্রাম রাঙামাটি। গ্রামটিতে কয়েক ঘর ভদ্রলোক বাদে বাকী সব চাষা-ভূষোরই বাস। একবালে রাঙামাটির অবস্থা ছিল উন্নত। গ্রামের পাশের ছোট নদীটি তখন মজে নি। মাঠে ফলত প্রচুর ধান, আর নদীতে মাছ। লোকের আর্থিক অবস্থা ছিল ভাল। তাঁতিপাড়ায় দিনরাত চলত তাঁত। গ্রামবাসীদের চাহিদা মেটাতে তাঁতিরা হরেকরকম কাপড় বুনত। আর জমিদার বাড়ীতে বারোমাসে তের-পার্ব্বণ লেগেই থাকত। আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়ার ধুম পড়ত

তখন! প্রৌঢ় চাষীরা তামাকু টানতে টানতে ছেলেবেলার গল্প বলে, যেন স্বপ্নের কথা। অভাব-অনটনগ্রস্ত আজকার চাষীদের কাছে, সে-সব কথা স্বপ্নের মতই মনে হয়। রাঙামাটিতে আজ আর উৎসব নেই—আনন্দ নেই। বছরে একবারও অভাবগ্রস্ত চাষীদের জীবনে ছুটীর দিন আসে না। একটানা নিরানন্দ অভাবের সংসার। অলস মুহূর্ত্তগুলো দুশ্চিন্তায় ভারী। আধপেটা খেয়েও ভাঙ্গনের স্রোত আটকানো যায় না—দিনের পর দিন মহাজনের খাতা সুদের অঙ্কে ভারী হয়ে উঠে।

সেই ত একই মাঠ—কিন্তু আগের মত ফসল কোথায়? সেই নদী—কিন্তু স্রোত আর নেই। মজে গেছে। বর্ষায়ও অনায়াসে হেঁটে নদী পার হওয়া যায়। সেই রাঙামাটি আর এই রাঙামাটি! অল্পবয়সেই দুশ্চিন্তাভারে চাষীরা বুড়িয়ে যায়। বাকা মেরুদণ্ড—কুঁজো হয়ে চলে।

হঠাৎ গ্রামে ঢুকে—রাস্তার ধারে পুরানো বটগাছের ছায়ায় যদি কেউ এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়, সেদিনকার রাঙামাটি তার চোখের উপর চঞ্চল প্রাণবন্যায় জীবন্ত হয়ে উঠে। সেদিনও বুঝি গাঁয়ের ছেলেরা এমনি বটগাছে ছুটোপাটি করত—হাসি-কান্না, কলহ-বিবাদে গ্রামের নির্জ্জন রাস্তাটি দুপুর-বেলা মাতিয়ে তুলত। প্রকৃতির নিয়ম এখানে অলজ্ঘনীয়। শুধু এখানটায় রাঙামাটির কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। সেদিনকার মত আজও, দুরন্ত ছেলেরা বটগাছের ডালে ডাং-ডিং খেলে। গাছের মগডাল থেকে টুক্ করে নীচে লাফিয়ে পড়ে, কারো হাত-পা একটু মচকায় না।

নতুন পাঠশালা

পোয়া মাইল দূরে আশ-শ্যাওড়ার জঙ্গলে ভর্ত্তি গোচারণের মাঠের পাশে পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালা। জীর্ণ ইস্কুল-ঘরখানি দেখে মনে হয়, বৈশাখী ঝড়ে যে-কোন মুহূর্ত্তে বুঝি পড়ে গেল। কিন্তু নতুন বাঁশের টি ঁকে বছরের পর বছর কালবৈশাখীর হাত থেকে ঘরখানিকে দাঁড় করিয়ে রাখে।

পণ্ডিতমশাই নিজেই ইস্কুলের সেক্রেটারী, শিক্ষক ও চৌকিদার। পণ্ডিতমশাই প্রাচীন লোক। অনেককাল পাঠশালায় পড়াচ্ছে। গাঁয়ে সম্ভবতঃ একটি চাষীও নেই, যে পণ্ডিতের পাঠশালায় এসে অন্তত দু'চারদিন বসে নি। চাষীর ছেলে পাঠশালায় দু'চারদিনই আসে, তারপর আর আসে না। দু-আখর লেখাপড়া ওদের জীবনে কী-বা কাজে আসে! তাই পণ্ডিতের পাঠশালা নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না। ছেলে পাঠশালায় যাচ্ছে—কথাটা প্রতিবেশীদের সঙ্গে বলাবলি করতে বেশ ভালই লাগে। পণ্ডিতের পাঠশালা যেন অনেকটা সখের ব্যাপার।

আর পণ্ডিত কি নিজেই তা মনে করে না? পণ্ডিতের পাঠশালায় আসার কোন নিয়মিত সময় নেই। কোনদিন আসে—কোনদিন আসেই না। পণ্ডিত না এলে ইস্কুলের ঘণ্টা বাজে না। পাঠশালার উঠানের মাঝখানে যতক্ষণ না ছায়া গড়ায়—ছেলেরা পণ্ডিতের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর নিজেরাই ছুটীর-ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে, হুল্লোড় করে বেরিয়ে পড়ে মাঠে।

ভারী মজার পাঠশালা। নয় কি? এমন পাঠশালার ছাত্র কে না

হতে চায়। কিন্তু পণ্ডিতমশায় বড় বদরাগী লোক। একবার রেগে গেলে আর রক্ষা থাকে না। হাতের বেত ভেঙ্গে যায়, কিন্তু পণ্ডিতের 'গোঁসা' ভাঙ্গে না। মাথায় যেন খুন চেপে যায়। ছেলেদের একমাত্র ভরসা, মাসে দশদিন পণ্ডিত পাঠশালায় আসে না। দশদিন এমন অবেলায় আসে—পড়া জিজ্ঞেস করবার আর সময় হয়ে উঠে না। বাকী ক'টা দিনই যত বিপদ।

একটা ঝোপের আড়ালে সবুজ ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে বাবলু পণ্ডিতমশাইর কথাই ভাবছিল। পাশেই তার বইখাতা ও শ্লেট-পেন্‌সিল। কাল পরশু দু'দিন পণ্ডিত পাঠশালায় আসে নি। আজ নিশ্চয়ই আসবে। তাই বাবলু আজ পাঠশালা পালিয়েছে। বই পড়ার চেয়ে ছুটোছুটি দাপাদাপি করতে বাবলুর অনেক বেশী আগ্রহ। পাঠশালার ঐ ছোট ঘরে বন্দী হয়ে সারাদিন বসে থাকতে ওর ভাল লাগে না। অবশ্য পাঠশালা সে যে রোজই পালায়, এমন নয়। কিন্তু আজ তার পাঠশালায় যেতে মোটেও উৎসাহ ছিল না।

দূরে পাঠশালা থেকে ছেলেদের কলকণ্ঠ সপ্তম রাগিণীতে ভেসে আসছে। পণ্ডিত এখনো আসে নি। বাবলু হাই তুলে উঠে বসল।

সামনে ঝোপের উপর একটা লাল ফড়িং বন্ বন্ করে ঘুরছে। ফড়িংটা একটা পাতার উপর বসতেই বাবলু পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। কিন্তু বাবলু হাত নামাতে-না-নামাতেই ফড়িংটা উড়ে গিয়ে আর একপাশে বসল। একবার দু'বার—অবশেষে বাবলু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে ফড়িংটা ধরল। পকেট থেকে সুতো বার করে

ল্যাজে বেঁধে দিয়ে বাবলু ফড়িংটা ছেড়ে দিলে। ফড়িংটা উড়ে খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। অনায়াসে সুতো ধরে ফড়িংটাকে কাছে টেনে আনা যায়। কিন্তু ফড়িংএর ঘুড়ি উড়াতে বাবলুর আজ তেমন উৎসাহ নেই।

পাঠশালা পালিয়ে আজ তার ভাল লাগছে না। সূর্য্য মাথার উপর হেলে পড়ছে। ছেলেদের কলকণ্ঠ সমান তালে ভেসে আসছে। পণ্ডিতমশাইর আজও ক্লাসে আসার আর কোন সম্ভাবনা নেই। বাবলু উঠে দাঁড়াল শ্লেট্ বই খাতা হাতে নিয়ে।

ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে পাঠশালার ঘণ্টা বেজে উঠতেই বাবলু পাঠশালার দিকে ছুটতে লাগল।

পাঠশালার ছেলেরা তখন কলরোল তুলে বটগাছের দিকে ছুটে চলেছে। বাবলু এসে দলে যোগ দিল।

ছেলেরা কেউ মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে চেঁচাচ্ছে। কেউ কেউ গলা জড়াজড়ি করে এক পদ গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে। কেউ বা সোজা বটগাছের দিকে দৌড়তে সুরু করেছে।

বাবলু ভোলাকে আটকে বললে : এই ! যাচ্ছিস কোথা ?

ভোলা বললে : ছিলি কোথায় এতক্ষণ ?

বাবলু রেগে বললে : যেখানেই থাকি—তোর কি ?

ভোলা বললে : দাঁড়া তোর বাবাকে আমি বলছি গিয়ে, পাঠশালা পালিয়েছিলি।

বাবলু রাগ সামলাতে না পেরে ভোলাকে কষে' এক চড় বসাল।

নতুন পাঠশালা

পরক্ষণে ভোলা বাবলুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। দুপক্ষ থেকে কিল চড়-চাপড়, অবশেষে কুস্তি সুরু হল। যে-সব ছেলে পেছনে ছিল, তারা বাবলু ও ভোলার পক্ষ নিয়ে দু' দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলল না। ভোলা পরাজয় স্বীকার করতেই বাবলু ভোলাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ছেলেদের ভেতরও যুদ্ধ থেমে গেল সাথে সাথে।

বাবলু বললে ঃ চল সব। বটগাছের ছায়ায় কপাটী খেলব।

ঃ চল।

বাবলু ও ভোলার পিছু পিছু ছেলেরা সব এগিয়ে চলল। নোংরা সার্ট ও প্যান্ট সবার পরনে। প্রায় কারো সার্টেই বোতাম নেই। অপরিপাটি এলোমেলো বেশ-ভূষা। কারো বা নাক দিয়ে অনবরত সর্দ্দি ঝরছে। মাথার চুল অবিন্যস্ত নোংরা।

বুড়ো দ্বারিক মিত্তির রাঙামাটির একমাত্র মহাজন—গ্রামের আর সব খাতক। দ্বারিকের মহাজনী ব্যবসা শুধু রাঙামাটিতেই নয়—আশেপাশের আর পাঁচটা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বারিক মহাজনের নগদ টাকাকড়ি নাকি প্রচুর। কিন্তু সংসারে দ্বারিকের আপন বলতে কেউ নেই। দ্বারিক একা। ঘরের দুয়ার বন্ধ করে একা একাই টাকা গুণে। নিজের হাতে রান্না করে—নিজেই বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়। দাওয়ায় বসে খাতকদের সঙ্গে টাকাপয়সা লেন-দেন করে। পাশে বসে পণ্ডিত দড়ি বাধা নিকেলের চশমা

নাকের ডগায় ঝুলিয়ে অনন্যমনে দলিল লেখে। কিম্বা পুরানো দলিলে সুদের অঙ্ক হিসাব করে।

পাঠশালার পণ্ডিত দ্বারিক মহাজনের মুহুরী। অবশ্য তার জন্য দ্বারিককে পয়সা দিতে হয় না। দলিল লেখার পয়সা খাতকেরাই দেয়। দ্বারিকের দাওয়ায় প্রতিদিনই পণ্ডিতের কিছু-না-কিছু কাজ থাকে। যেদিন খাতক থাকে না, পণ্ডিত দ্বারিকের পুরানো দলিল-গুলোর তারিখ দেখে দেয়। তামাকু টানতে টানতে দুটো সুখ-দুঃখের কথাও হয়। পণ্ডিতের হাতে সব সময়ই হুঁকোটা রয়েছে। যেখানে পণ্ডিত যায়—হুঁকোটিও সাথে যায়।

দ্বারিকের দাওয়ায় বসে পণ্ডিত হুঁকো টানছিল। সামনে মাদুরের উপর ছড়ানো একগাদা তমস্সুক।

দ্বারিক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দলিলগুলো সযত্নে একটা ঝাঁপির ভেতর রেখে, ঝাঁপিটা তালা বন্ধ করে বললে: তা'হলে পণ্ডিত, আজ আর পাঠশালায় যাচ্ছ না ?

নাক দিয়ে একরাশ ধুঁয়ো বার করে পণ্ডিত বললে: না, আজ আর যাব না।

দ্বারিক বললে: আজ তোমার কিছু হল ?

পণ্ডিত মুখে মুখে হিসাব করে বললে: তিনখানা তমস্সুক। ছ' আনা দু'খানা আর একখানা আট আনা—তোমার গিয়ে হল চৌদ্দ আনা।

পণ্ডিত কাঁছার খোট থেকে পয়সা বার করে গুণতে লাগল।

দ্বারিক বললে ঃ তার মানে দু'আনা কম এক টাকা। বাদিতপুরের হরিচক্কো তমসুক লেখার কাজটার জন্য আমাকে কত মিনতি করে। বলে, তোমার হিসেব-নিকেশ সব-কিছু আমি করে দোব, দ্বারিক-খুড়ো !

পণ্ডিত রেগে বললে ঃ হরিচক্কো ! তমসুক লেখার সে জানে কি ! নিয়ে এস না, তোমার গিয়ে হরিচক্কোকে, তোমাকে সুদ্ধ. যদি না ডুবিয়ে যায় ত আমার নাম রামতারক পণ্ডিতই না।

দ্বারিক বললে ঃ তা কি আর আমি জানিনে। তাই ত. হরিচক্কোকে মুখের উপর বলে দিলাম। পণ্ডিত তমসুক লিখে-লিখে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলল, আর সেদিনের ছোঁড়া হরিচক্কো কিনা আসবে .তার সাথে টেক্কা দিতে।

পণ্ডিত খুসী হয়ে হাতের হুঁকোটা দ্বারিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে ঃ নাও।

দ্বারিক হুঁকোটা নিলে। গলার স্বর নামিয়ে বললে ঃ তুমি দুটো পয়সা পাচ্ছ দেখে, ওদের চোখ টাটাচ্ছে পণ্ডিত ! কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি কখনো ছাড়ব না।

পণ্ডিত হাই তুলে বললে ঃ .রহমত উল্লার দলিলখানি আর একবার দেখতে হয়। ম্যাদ ফুরিয়ে এসেছে।

এমনি সময় গোপাল ছুটতে ছুটতে এসে একখানি চিঠি পণ্ডিতের হাতে দিয়ে বললে ঃ বাবা ডাকঘর থেকে নিয়ে এসেছে পণ্ডিতমশাই !

পণ্ডিত চিঠিখানি হাতে নিয়ে চশমাটা নাকের ডগায় লাগাতে

লাগাতে আড়চোখে বারেক ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললে ঃ গোপাল! আজ পাঠশালায় যাওনি কেন?

গোপাল ভয়ে ভয়ে বললে ঃ বাড়ীতে কাজ ছিল, পণ্ডিতমশাই!

অভ্যাসমত হুমকি দিয়ে পণ্ডিত বললেঃ চুপ্! মিথ্যেবাদী কোথাকার!

গোপাল এবার কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে ঃ মা যেতে মানা করলে পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত ভেংচি কেটে বললে ঃ মা!

দ্বারিক ঝাপিটা ঘরে রেখে বারান্দায় ফিরে এসে বললে ঃ ডাকের চিঠি? কোত্থেকে এল হে?

পণ্ডিত এতক্ষণে চিঠির শিরোনামার দিকে তাকাল।—এ্যাঁ? এ যে ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের চিঠি! বিস্ময়ে পণ্ডিতের দুচোখ কপালে উঠে গেল।

পণ্ডিত চিঠি খুললে। সুযোগ বুঝে গোপাল এক পা এক পা করে পিছু হটে পণ্ডিতের দৃষ্টির বাইরে এসে, এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে তখন দ্বারিক বলছিল ঃ মুখখানি অমন গোমড়া করলে কেন হে? দুঃসংবাদ কিছু না ত!

দুঃসংবাদ! পণ্ডিত উঠে দাঁড়াল ঃ তার চেয়েও বেশী। সাব-ইন্‌স্পেক্টার আজই ইস্কুল পরিদর্শনে আসছে।

দ্বারিক বলল ঃ বস বস। আজ আর পরিদর্শন হবে না। ছেলেরা এতক্ষণে বাড়ী চলে গেছে।

নতুন পাঠশালা

পণ্ডিত কিন্তু বসল না। একলাফে দাওয়া থেকে নীচে নেমে বললেঃ কোথায় গেল ছেলেটা! তারপর মোলায়েম স্বরে ডাকলঃ বাবা গোপাল! চল বাবা, সবাইকে ডেকে নিয়ে ইস্কুলে চল।···তাই ত দেখতে দেখতে ছেলেটা কোথায় মিলিয়ে গেল।· আমারও হয়েছে যত!

পণ্ডিত ছাতা বগলে নিয়ে বললেঃ মহাজন, আমি পাঠশালায় চললাম।

পাঠশালা কম্পাউণ্ডের আশে-পাশে তখন কেউ ছিল না। পণ্ডিত দরজা খুলে হুঁকো-কল্কে ঘরের কোণে ভাঙ্গা দেশলাই কাঠের বাক্সে লুকিয়ে রাখল। ইস্কুলের ভেতর হুঁকো টানা নিষেধ। সেবার এই জন্য পণ্ডিতকে সাব-ইন্‌স্পেক্টারের কাছে ধমক খেতে হয়েছিল।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পণ্ডিত ছেলেদের খোঁজে মাঠের দিকে চলল।

খানিকটা তফাতে একদল ছেলে ঝোপের ছায়ায় বসেছিল। দূর থেকে দেখতে পেয়ে পণ্ডিত গলার স্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে ডাকলঃ হাঁদু—গদু—ভোঁদু—ন্যাপলা—বাবলা, তোরা সব ফিরে আয় বাবারা, সাব-ইন্‌স্পেক্টার·এসেছেন!

পণ্ডিতের গলার স্বর শুনে ছেলেরা সব ছুটে পালাল।

পণ্ডিত রেগে বললেঃ মূর্খের দল! কাল মজা টের পাওয়াব'খন।

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টারের কথা মনে পড়তেই তার রাগ জল হয়ে গেল। আপন মনে বললেঃ এদের দূর থেকে ডাকাই আমার মূর্খামো।

ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে পণ্ডিত এবার এগিয়ে চলল। ছেলেদের মুখোমুখি একবার দাঁড়ালে কেউ পালাতে সাহস করবে না—একথা পণ্ডিত ভাল করেই জানে।

এদিকে পণ্ডিতের মনে পড়ল, এতক্ষণে সাব-ইন্‌স্পেক্টার হয়ত এসেই গেছেন। পণ্ডিত মনে মনে যুক্তি আঁটলে, সাব-ইন্‌স্পেক্টারকে বলবে, ছেলেদের নিয়ে সে খেলতে গিয়েছিল। সাব-ইন্‌স্পেক্টার লোকটাও আবার যেমন,—কিছুতেই পণ্ডিতের কথা সে বিশ্বাস করতে চায় না। পণ্ডিত যা বলে, তার উল্টোটি ধরে নেয়।

ঝোপের ওপাশে পায়ের শব্দ শুনে পণ্ডিতের মুখখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই ওখানে বাবলুর দল তাস পিটছে। এই যে পাতার ফাঁকে জামার ঝুল দেখতে পাচ্ছে পণ্ডিত। পা টিপে টিপে এগিয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে পণ্ডিত জামার আস্তিন ধরে টানলে।

ওপাশে রাঙামাটির কবিরাজ ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে বসে স্বপ্নাদ্য-মাতুলির জন্য শিকড় তুলছিল। পেছন থেকে জামার আস্তিনে টান পড়তেই, কবিরাজ প্রাণভয়ে লাফিয়ে উঠল।

—বাবা রে! গেলাম রে! বলে সে চেঁচাতে লাগল।

এপাশ থেকে পণ্ডিত বেরিয়ে এসে কবিরাজকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটল। হিংস্র জানোয়ারের বদলে নিরীহ পণ্ডিতকে দেখে কবিরাজের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। নিশ্বাস নিয়ে বললে: তোমার এই কাজ! ছেলেদের সাথে তুমিও কি আজকাল লুকোচুরি খেলছ পণ্ডিত?

পণ্ডিত আমতা আমতা করে বললে: ঠিক তা নয়।

কবিরাজ বললেঃ আর একটু হলেই আমি হার্ট-ফেল করে মারা যেতাম! উঃ, খুব বেঁচে গেছি!

পণ্ডিত কবিরাজের হাতে শিকড় দেখে বললেঃ স্বপ্নাদ্য-মাদুলির শিকড় তুলছ নাকি?

কবিরাজ রেগে বললেঃ সে খবরে তোমার দরকার কি?

পণ্ডিত কি বলতে যাচ্ছিল। সহসা বটগাছের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলঃ পেয়েছি—হতভাগাদের পেয়েছি। পণ্ডিত আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না। বটগাছের দিকে প্রায় ছুটতে লাগল। কবিরাজ অস্ফুটস্বরে কি একটা বলে, হাঁটু গেড়ে বসে আবার শিকড় তুলতে লাগল।

বটগাছের ছায়ায় ছেলেরা দলে দলে বসে তাস পিটছিল। ভোলা বাবলুর মুখের উপর তাস ছুঁড়ে মেরে দাঁড়ালঃ জোচ্চোর কোথাকার!

বাবলুও আস্তিন গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালঃ আবার গাল দিবি ত মুখ ভেঙ্গে দোব!

সহসা পেছনে পণ্ডিতের ছায়া পড়তেই এক মুহূর্ত্তে ছেলেদের কলরব বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হল তাসখেলা। বাবলু ও ভোলা মাথা নীচু করল।

পণ্ডিত রেগে বললেঃ এ্যাঁ! এ যে দেখছি রীতিমত তাসের আসর সুরু হয়েছে। তা আর হবে না—

(সুর করে) তাস—দাবা—পাশা
তিন—সর্ব্ব—নাশা!

ছেলেদের কারো মুখে কথা নেই। পণ্ডিত একটু থেমে বলতে লাগল ঃ ছুঁচোর দল! কতদিন না বলেছি বেলা না পড়ে এলে পাঠশালা থেকে বেরোবি না!

বাবলু কি বলতে যাচ্ছিল, পণ্ডিত ধমক দিয়ে বললে ঃ চুপ কর ডেঁপো ছোকরা। আমি পাঠশালায় আসি কি না-আসি, তোদের কি এঁ্যা? পড়া শিখে এসেছিস্?

বাবলু মাথা নীচু করল।

পণ্ডিত বললে ঃ ওদিকে হয়ত সাব-ইনস্পেক্টার এসে বসে আছেন। চল সব পাঠশালায়।

ছেলেরা মাথা নীচু করে পণ্ডিতের পিছু পিছু এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে বারেক পেছন ফিরে তাকিয়ে পণ্ডিত বললে ঃ সাব-ইনস্পেক্টার যদি জিজ্ঞেস করে, বলবি ম্যাচ খেলছিলি। তাসের কথা বলিসনি যেন বাছারা!

ছেলেরা মাথা নেড়ে সায় দিল।

রাখালের সংসার

সকাল বেলা। দ্বারিকের উঠানে এরি মধ্যে গ্রামের চাষীদের ভীড় জমেছে। রহিম, ভরত, গোবিন্দ, শরাফত। প্রায় সবাই খাতক। এখন চাষের সময়। চাষীরা দ্বারিকের কাছে টাকা ধার নিতে এসেছে। উঠানের এককোণে চাষীদের বসবার খান কয়েক তক্তা। সামনে দ্বারিক মাদুর পেতে পিতলের ঝাঁপি নিয়ে বসেছে। পণ্ডিত মাদুরে উপুড় হয়ে বসে খাতকদের দলিল লিখছিল। ওর দড়ি-বাধা চশমাটা নাকের ডগা থেকে যে-কোন মুহূর্তে ফসকে যেতে পারে।

দ্বারিক খাতকদের প্রয়োজন যাচাই করে দেখছিল।—পঁচিশ টাকা। দ্বারিক রহিমকে বললে: পঁচিশ টাকায় কি করবে মিঞা?

রহিম মাথা চুলকে' বললে: হালের বলদ একটা কিনব মহাজন!

দ্বারিক বললে: বলদ ত পনের টাকায়ও মিলে। পনের টাকার বেশী আমি দিতে পারব না।

তারপর পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বললে: পনের টাকা লেখ পণ্ডিত!

খাতকদের পেছনের সারিতে এককোণে রাখাল কখন এসে বসেছিল, কেউ লক্ষ্য করে নি। একসময় চাষীরা একে একে সবাই বিদায়

নিল। উঠান খালি। এতক্ষণে দ্বারিক রাখালকে দেখতে পেল। হাই তুলে তুড়ি মেরে দ্বারিক বললেঃ রাখাল যে! কখন এলি?

রাখাল মাথা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললেঃ এলাম মহাজন!

দ্বারিক বললেঃ তারপর কি খবর বল্।

রাখাল মাথা চুলকে বললেঃ সুতো কিনতে কাল সহরে যাব, পনেরটি টাকা চাই, মহাজন।

দ্বারিক বললেঃ হুঁ। পনের টাকায় একমাসে পঁচিশ টাকা দিতে হবে বাপু! আর অমনি একজোড়া তাঁতের গামছা-ও।

রাখাল সবিনীত মাথা নেড়ে বললেঃ তা আর দোবনি মহাজন! আপনার দয়ায়ই ত বেঁচে আছি।

পণ্ডিত দড়ি-বাঁধা চশমা খুলে পকেটে রেখে, ছাতা বগলে উঠে দাঁড়াল। দ্বারিক বললেঃ অমনি রাখালের দলিলটাও লিখে যাও, পণ্ডিত!

পণ্ডিত বললেঃ আজ পাঠশালায় যেতেই হবে। রাত্তিরে এসে লিখে দোব'খন মহাজন, পাঠশালার বেলা হয়ে গেছে।

পণ্ডিত চলে গেল।

দ্বারিক বললেঃ তা'লে রাখাল, টাকাটা তুই কাল এসে নিয়ে যাস। রাত্তিরে আর ঘরের টাকা বার করব না।

রাখাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেঃ তা মহাজন, আমি কালই সহরে যাচ্ছিলাম কি না।

দ্বারিক বললেঃ কাল না গিয়ে পর্শু যাস্।

রাখাল একটু ভেবে বললেঃ মহাজন যখন বলছেন, তাই যাব।

রাখাল নমস্কার করে চলে যাচ্ছিল।

কি ভেবে দ্বারিক কাছার খোঁট থেকে তিনখানি পাঁচ টাকার নোট বার করে রাখালের হাতে দিয়ে বললে, এই নে' টাকা। কাল সকাল-বেলা এসে কাগজে টিপসই দিয়ে যাস্।

নোট ক'খানি হাতে নিয়ে রাখাল মাথা নীচু করে নমস্কার করে বললেঃ ভোরেই আসব মহাজন!

রাখাল নোট তিনখানি ধুতির খোঁটে বেধে খুসীমনে বাড়ীর পথ ধরল।

রাঙামাটির তাঁতিপাড়ার সবেধন নীলমণি একমাত্র তাঁতি রাখাল। আর সব তাঁতিরা গ্রাম ছেড়ে কবে চলে গেছে। কিন্তু রাখাল আজো আছে। ছোট্ট সংসার রাখালের। বাবলু, টবু, বুবু ও তাদের মা। সম্পত্তি বলতে একটা গোরু, একখানি তাঁত ও একটুকরো জমি। গরীব তাঁতির সংসার—দিন আনে দিন খায় রাখাল। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খেটেও অভাব ঘোচে না। সুতো কেনবার জন্য প্রতিবারেই মহাজনের কাছে হাত পাততে হয়। তাঁতের গামছা বেচে যা দু'পয়সা লাভ হয়, মহাজনের ধার শোধতেই সব চলে যায়।

মা ঘর ঝাট দিচ্ছিল। টবু ও বুবু মায়ের উপদেশ মত তাঁতের গামছাগুলো ভাঁজ করে রাখছিল।

রাখাল বাইরে থেকে হাঁক দিলেঃ ও বাবলুর মা!

বাবলুর মা মাথার কাপড় টেনে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললে : দিলে টাকা মহাজন ?

বারান্দায় উঠে রাখাল একগাল হেসে নোট ক'খানি বাবলুর মার হাতে দিয়ে বললে : তা আর দেবে না! রাখালচন্দ্র যেখানে হাত পাতবে, সেখানেই টাকা পাবে। পয়সা নেই গিন্নী, কিন্তু দশটা লোকের কাছে ইজ্জত এখনো আছে।

বাবলুর মা নোটগুলো বাক্সের ভেতর রেখে বললে : তা এবারে সুদ কত দিতে হবে ?

সুদের কথা শুনে রাখালের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ম্লানস্বরে বললে : তা ত দিতেই হবে, সুদ না দিলে টাকা ধার দেবে কেন? পনের টাকায় এক মাসে পঁচিশ টাকা শোধ দিতে হবে।

বাবলুর মা বিস্মিতস্বরে বললে : পঁচিশ টাকা!

রাখালের মনে পড়ল ; বললে : আর অমনি একজোড়া গামছাও।

বাবলুর মা আর কিছু বললে না, ঘরের কাজ করতে লাগল নীরবে।

রাখাল অসহায় ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বললে : উপায় কি ?

তারপর দাওয়ায় বসে হুঁকো টানতে সুরু করে, গুড়ুর গুড়ুৎ-গুড়ুৎ!...

রাখালের দু'খানা মাত্র ঘর। বাইরের ঘরটায় তাঁত খাটানো। বাড়ীতে আত্মীয়বন্ধু কেউ এলে তাঁতের পাশেই শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সুতো, চরকী, বুনাগামছা প্রভৃতি রাখাল ভেতরে নিজের

শোবার ঘরে রাখে। বাইরের ঘরের এক পাশে চাল বাড়িয়ে দিয়ে মনার থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মনা গোরু হলেও রাখালের পরিবারেরই যেন একজন। মনার আদর-যত্নের সীমা নেই।

ভেতরে বড় ঘরটায় সবাই শোয়। মেঝেতে মাতুর পেতে বসে বাবলু ইস্কুলের পড়াও তৈরী করে। পেছন দিকটা রান্নাঘর।

রবিবার। আজ পাঠশালায় যাওয়ার হাঙ্গামা নেই। সকাল-বেলা বাবলু ঘরের কাজে—মাজা-ঘষায় মাকে সাহায্য করে। কিন্তু মাঝে মাঝে বাবলুর টিকিটিও দেখার উপায় নেই, সেই যে ভোরে পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায়—ফিরে সন্ধ্যায়। ঘরের কাজ ত পরে—চান নেই, খাওয়া নেই ছেলের। মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। রাখাল রেগে বলে: তুমিই ত আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছ!

মা নীরবে অভিযোগ মেনে নেয়—পাছে বাবলুকে মার খেতে হয়।

এক একদিন বাবলু লক্ষ্মীছেলে হয়ে উঠে। ঘরের কাজ সেরে মনাকে কচি ঘাস খাওয়াতে মাঠে নিয়ে যায়। রাখাল হুঁকো টানতে টানতে খুসীর স্বরে বলে: ছেলেটার মতিগতি মাঝে মাঝে কেন যে বিগড়ে যায়, তাই ভাবি।

বাবলু মনাকে নিয়ে দুপুরের আগেই ফিরে আসে। গোয়ালে বাঁধতে বাঁধতে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দেয়। কৃতজ্ঞতায় মনার চোখ বুজে আসে। আস্তে আস্তে বলে: মো-উ-উ। টবু-বুবু ছুটে এসে মনার গলা জড়িয়ে ধরে।

চান করে খেয়ে দেয়ে বাবলু হাটে গামছা নিয়ে যাবার জন্য তৈরী

হয়। বাবলুর উপর রাখাল সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে। বুঝি রাখালকে ঠকানোও সম্ভব, কিন্তু বাবলুকে কেউ ঠকাতে পারে না। বাবলুকে নিয়ে রাখাল গর্ব্ব বোধ করে।

মাল এক গাঁটের বেশী হলে রাখালও যায় সঙ্গে। দোকান তুলবার আগে বাবলুর হাতে দু'আনা পয়সা দিয়ে বলে: তোর ইচ্ছাখুসী কিছু কিনে খাগে।

বাজার নিয়ে বাপ-বেটা বাড়ী ফিরে। টবু-বুবু তাদের অপেক্ষায় বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। রাখাল কোমর থেকে কলাপাতায় মোড়া জিলিপি বার করে টবু-বুবুকে ভাগ করে দেয়।

উঠানে পা দিয়েই বলে: বুঝলে গিন্নী, মাছটা আজ সস্তা। তাই কিছু বেশী করেই নিয়ে এলাম।

মা দা নিয়ে মাছ কুটতে বসে। টবু-বুবু মাকে ঘিরে দাঁড়ায়।

বাবলু সবার অলক্ষিতে আগচালার বাঁশের খুঁটির গর্ত্তের ভেতর দু'আনিটা ফেলে দেয়। ওটা বাবলুর 'হোম সেভিংস্ ব্যাঙ্ক'। কিন্তু বাড়ীর কেউ বাবলুর ব্যাঙ্কের সন্ধান জানে না।

কোন কোন দিন বাবলু একাই হাটে গামছা বিক্রী করে, বাজার নিয়ে আসে। রাখাল দাওয়ায় বসে তামাকু টানে।

বাবলুর ফিরতে দেরী হলে মার উদ্বেগের সীমা থাকে না। ঘরের কাজ ফেলে মা বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তা দিয়ে যে কেউ যায় তাকেই শুধায় বাবলুর কথা: হ্যাঁ গা, আমার বাবলুকে রাস্তায় দেখলে?

প্রতিবেশী বলে : হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ত সে আমার আগে আগে আসছিল।

মা উদ্বিগ্নস্বরে বলে : আগে আগে ? তবে সে এখনো কেন এল না কুশীমামা ?

কুশীমামা যেতে যেতে বলে : তাই ত! তবে কি বাবলু আমার পিছু পিছু আসছিল!...আর তাই বা কেমন করে হয় ? আমি তাকে রাস্তায় দেখেছি।

বলতে বলতে বাবলু এসে পড়ে। মার হাতে বাজারের ঝুড়িটা দিয়ে বলে : সবগুলো গামছা বিক্রী হয়ে গেল মা!

মা খুসীর স্বরে বলে : সবগুলো ?

: হুঁ-উ।...বাবলু মার সাথে সাথে দাওয়ায় উঠে বলে : টবু-বুবুদের দেখছি নে যে!

রান্নাঘর থেকে টবু-বুবু বেরিয়ে আসে। বাবলু বলে : এই যা। তোদের কথা একদম ভুলে গেছলাম।

টবু-বুবু কিন্তু বাবলুর খেলা জানে। অধৈর্য্য হয়ে বলে : কই, কি এনেছ—বের কর না দাদা!

জামার পকেট থেকে বাবলু বিস্কুট বার করে টবু-বুবুর হাতে দেয়।

মাটির প্রদীপের আলোয় রাখাল পয়সা গুণে। না, হিসাবে একটা পয়সাও ঘাটতি পড়ে নি। বাবলুর মাথা আছে, পয়সাগুলো বাক্সে তুলতে তুলতে রাখাল ভাবে।

ইতিমধ্যে বাবলু পুকুর-ঘাট থেকে হাতপা ধুয়ে এসে পড়তে বসে।

কিন্তু পড়ায় বাবলুর মন নেই। কিছুক্ষণ বই-পত্র নাড়াচাড়া করে; বলে: দু'আনা আমি নিয়েছি বাবা।

: বেশ করেছিস্। রাখাল বলে।

রান্নাঘর থেকে মাছ ভাজার গন্ধ ভেসে আসে। টবু-বুবুর টুকরো কথা। মা রান্না করছে। টবু-বুবু উনুনের পাশে বসে আছে।

বাবলু বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। রাখাল বলে: কই, পড়তে তো শুনলাম না তোকে।

বাবলু আস্তে আস্তে বললে: সকালে পড়ব।

রাখাল মনে মনে বিরক্ত হয়, কিন্তু কিছু বলে না।

রান্নাঘর থেকে মা বলছিল: হ্যাঁগা, তা'লে কালই সহরে যাচ্ছ?

রাখাল বললে: কাল আমাকে যেতেই হবে।

মা বললে: সহরে যাচ্ছ—এবার সুন্দীর বাসায় একবার যেয়ো কিন্তু।

সুন্দী সম্পর্কে বাবলুদের মাসীমা। সহরে নার্সের কাজ করে।

এ ঘর থেকে রাখাল বললে: যাব ত, কিন্তু গেলেই সুন্দী বলবে টবু-বুবুদের নিয়ে আস নি কেন? তখন কি বলব?

টবু-বুবু কান পেতে শুনছিল। বায়না ধরল: আমরা যাব মা!

মা বললে: না না, তোমাদের যেয়ে কাজ নেই।

রাখাল হুঁকোটা মুখে তুলে বললে: তা ওদের নিয়ে গেলে হয়। সুন্দী কত করে বলে দিয়েছে!

বাবার কথা শুনে টবু-বুবু রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল, আবদারের সুরে বলতে লাগল দুজনে: আমরা যাব বাবা।

মা বাধা দিয়ে বললে : না বাপু, ওদের ছেড়ে আমি একদিনও থাকতে পারব না।

রাখাল বললে : টবু-বুবুদের দেখে সুন্দী কত খুসী হবে। এক রাত্তিরের ত ব্যাপার! সকালে যাব, পরদিন ফিরে আসব।

মা এবার উত্তর দিল না। ভাতের হাঁড়ি নামাতে লাগল।

রাখাল বলতে লাগল : না, আমি ভাবছি বুবু-টবুদের নিয়েই যাব।

মা এবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বললে : নিয়ে যেতে চাও, আমি আটকাব কেন ? কিন্তু সহরের কথা ভাবতেই ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপে। সেখানে কত লোক, কত গাড়ী-ঘোড়া!

রাখাল হুঁকো টানতে টানতে রান্নাঘরে ঢুকে বললে : তুমি কিচ্ছু ভেবো না বুবুর মা।

টবু-বুবুর আনন্দ আর ধরে না। এই প্রথম তারা গাঁয়ের বাইরে যাচ্ছে। খুসীতে টবু নাচতে লাগল। বুবু বাবলুর ঘাড়ে চড়ে বসল। বাবলু ধমক দিয়ে বললে : না-ও, হয়েছে। সহরে যাওয়ার আনন্দ আর ধরে না।

বাবলুর কথা শুনে রান্নাঘরে রাখাল ও বাবলুর মার চোখ চাওয়া-চাওয়ি হল। রাখাল বললে :. পূজোর ছুটীতে তোকে নিয়ে যাব'খন বাবলু। এখন পাঠশালা-কামাই করে গেলে পড়ায় পিছিয়ে যাবি।

মা ডাকলে : খেতে এস সব!

বুবু-টবুর সফর

রাঙামাটি থেকে সহর চার ঘণ্টার পায়ে-হাঁটা পথ। কিছুদিন হল সরকারী সড়কে বাস্-সার্ভিস্ স্বুরু হয়েছে। বাসে করে সহরে পৌঁছুতে আধঘণ্টার বেশী লাগে না। সারাজীবন রাখাল পায়ে হেঁটেই সহরে গেছে। আবার কাঁধে করে মাল বয়ে নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু বাস্-সার্ভিস্ স্বুরু হওয়ার পর আজকাল আর তার হাঁটুতে জোর নেই। বাসের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে, তবু গাঁয়ের লোকেরা আজকাল পায়ে হেঁটে সহরে যাবে না। এতখানি হাঁটবার কথা যেন আর ভাবাই যায় না।

খুব ভোরে চান করে এসে মা তাড়াতাড়ি ভাতে-ভাত রেঁধে দিলে। খেয়ে দেয়ে রাখাল টবু-বুবুদের নিয়ে শ্রীদুর্গা বলে পথে বেরিয়ে পড়ল।

যাবার বেলা মা টবু-বুবুর কড়ে-আঙ্গুল কামড়ে দিলে। কড়ে-আঙ্গুল মা কামড়ে দিলে নাকি কোন আপদ-বিপদ হয় না।

বুবু-টবুদের নিয়ে সড়কে বাস্-ষ্টপে এসে দাঁড়াল রাখাল। পুকুর-ঘাট থেকে বাস্-ষ্টপটা চোখে পড়ে।

কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই একখানি বাস্ এসে থমকে দাঁড়াল। রাখাল টবু-বুবুকে নিয়ে বাসে চড়ল। বাস্ ছেড়ে দিল।

নিশ্বাস ছেড়ে মা পুকুর-ঘাট থেকে ফিরে এল।

নতুন পাঠশালা

মফস্বলের ছোট্ট বাস্, যত না ধরে, সবসময়ই তার বেশী যাত্রী নিয়ে চলে। ভেতরে বসবার তিনখানি বেঞ্চ—দু'খানি দু'পাশে, একখানি মাঝখানে। না বসা যায় ভাল করে, না দাঁড়ানো যায়। রাখালের কোলে বসেও ভীড়ের চাপে টবু-বুবুর নিশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। অবশেষে বাস্খানি সহরে—বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াল।

যাত্রীদের পিছু পিছু রাখাল টবু-বুবুর হাত ধরে নীচে নেমে বাস্-ভাড়া চুকিয়ে দিলে।

রাখাল দু'হাতে দু'জনকে ধরে ফুটপাথ ধরে চলল। বললে: উই যে সামনে বড় বাড়ীটা দেখছিস্, এর পেছনে মাসীর বাড়ী।

গ্রামের পথ হলে টবু-বুবু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে রাখালকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত: এটা কি, ওটা কি……। কিন্তু সহরের ফুটপাথে তাদের মুখে কথা নেই। টবু-বুবু নীরবে বাবার হাত ধরে এগোতে লাগল। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় ওদের যে উৎসাহ ছিল, এখন আর তা নেই।

এ-যেন কেমন ধারা অদ্ভুত জায়গায় তারা এসে পড়েছে। মফস্বলের সহর। ছোট ঘিঞ্জি রাস্তা, গাড়ী-ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে গর্জ্জন করে একে অন্যের গায়ে এসে পড়ছে যেন। রাস্তাভর্ত্তি লোক ছুটে চলেছে। কেউ কারো মুখের দিকে তাকায় না—কেউ কাউকে জানে না। ঠেলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। রাঙামাটির চাষীদের মত নয় এরা।

যেতে যেতে রাখাল টবু-বুবুর দিকে তাকায়। বলে: এই যে, আমরা মাসীর বাড়ী এসে পড়েছি।

রাস্তার দু'পাশে উঁচু উঁচু দালান-বাড়ী। গাড়ী-বারান্দা ফুটপাথের উপর। সহসা দেখে ভয় হয়, এক্ষুণি বুঝি মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে। টবু-বুবুর কেমন যেন ভয় লাগে। শক্ত করে রাখালের হাত চেপে ধরে তারা।

মোড়ে এসে রাস্তা পার হতে গিয়ে টবু-বুবু কিছুতেই এগোতে চায় না। তাদের ভয়, এই বুঝি গাড়ী এসে পড়ল ঘাড়ের উপর। রাখাল অভয় দিয়ে বললে: গাড়ী আসবার আগেই আমরা ওপাশে চলে যাব।

অবশেষে রাখাল টবু-বুবুদের দু'হাতে দুপাশে তুলে রাস্তা পার হল।

নীচের তলায় একখানি মাত্র ঘর। সামনে একটুখানি বারান্দা। এখানে থাকে সুন্দী মাসী।

সিঁড়িতে পা দিয়ে রাখাল ডাকলে: কই গো সুন্দী!

ডাক শুনে সুন্দী বেরিয়ে এল বারান্দায়। খুসীর স্বরে বললে: জামাই বাবু! টবু-বুবুদের নিয়ে এসেছেন!

রাখাল টবু-বুবুদের নিয়ে বারান্দায় উঠল। টবু-বুবুদের পেয়ে সুন্দীর খুসীর সীমা নেই। দু'জনকে কোলে তুলে, আদর করে বললে: এতদিন বাদে মাসীকে মনে পড়ল!

রাখাল বললে: ওদের মা কি আর আসতে দেয়! এবার জোর-জবরদস্তি করে নিয়ে এলাম।

সুন্দী বললে: বেশ করেছেন। এনেছেন যখন, কালই এদের যেতে দিচ্ছিনে।

রাখাল হেসে বললে: কিন্তু ওদিকে তোমার বোনটি যে খাওয়া-

দাওয়া ছেড়ে দেবে, সুন্দী। আমি জানি, আজই ওর খাওয়া হবে না। টবু-বুবুদের এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল করতে পারে না।

সুন্দী বললেঃ কি গো টবু-বুবু! মাসীর বাড়ীতে হু'চার দিন থাকবে, না চলে যাবে?

বুবু এরি মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছিল। সুন্দীর কোল থেকে নেমে বললেঃ বাড়ী যাব বাবা!

সুন্দী রাগের ভাণ করে বললেঃ এক্ষুণি চলে যাও। তারপর টবুর দিকে তাকিয়ে বললেঃ তুমি?

টবু মাথা নীচু করল। উত্তর দিল না। রাখাল একখানি চেয়ারে পা তুলে বসে বিড়ি টানছিল। বললেঃ গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের সহর কি আর ভাল লাগে? সত্যি বলতে কি, আমারও ভাল লাগে না। একদিনেই আমি হাঁপিয়ে উঠি।

সুন্দী রান্নাঘর থেকে থালায় করে কিছু মিষ্টি ও হু'গ্লাস জল নিয়ে এল। রাখালের সামনে থালাটা রেখে টবু-বুবুর হাতে মিষ্টি তুলে দিয়ে বললেঃ খাও।

রাখাল হুটো মিষ্টি মুখে পুরে এক গ্লাস জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল। বললেঃ আমি বাজারে চললাম সুন্দী!

সুন্দী বললেঃ ভাত খেয়ে যাবেন না?

রাখাল বললেঃ না। সকালবেলা খেয়ে এসেছি। রাত্তিরে ফিরে এসে খাব।···তারপর নীচে নামতে নামতে বললেঃ এদের দেখো, যেন রাস্তায় না বেরোয়।

রাখাল চলে গেল। সুন্দরী টবু-বুবুদের সঙ্গে ভাব করতে লাগল।

বিকালবেলা বারান্দায় বসে টবু-বুবু খেলছিল। সুন্দরী রামচরণকে বললেঃ দু'ঘণ্টার ভেতর আমি ফিরে আসব রামচরণ, তুমি রান্না চাপিয়ে দাও।

রামচরণ মাথা নেড়ে বললেঃ হ্যাঁ মা!

সুন্দরী জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললেঃ আর টবু-বুবুদের একটু দেখে রেখো।

রামচরণ আবার মাথা নাড়লঃ হ্যাঁ মা!

সুন্দরী হাইহিল জুতোর খট্-খট্ শব্দ তুলে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেঃ টবু-বুবু, আমি বাইরে যাচ্ছি। এক্ষুণি ফিরে আসব। কান্নাকাটি করো না যেন।

টবু মাথা নাড়ল। বুবু ঘৃণাভরে বললেঃ আমি কাঁদি না। দিদি ছিঁচ-কাঁদুনে।

টবুও ভীষণ আপত্তি জানালঃ আমি কখন কাঁদি?

সুন্দরী হেসে বললেঃ টবু-বুবু কেউ ছিঁচ-কাঁদুনে নয়। বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরোবে না। এখানে বসে খেলা কর। তোমাদের জন্য চকোলেট্ নিয়ে আসব'খন।

খট্-খট্ খট্-খট্—সুন্দরীর জুতোর শব্দ রাস্তায় মিলিয়ে গেল। বুবু বললেঃ চকোলেট্ কি দিদি!

টবু বুবুর চেয়ে বয়সে বড়। বুবুর কাছে নিজের অজ্ঞতা জানাতে

সে রাজী নয়। তাই একটু ভেবে বললেঃ চকোলেট্ খুব সুন্দর দেখতে।

বুবুর কাছে ব্যাখ্যাটা খুব স্পষ্ট হল না। তা না হলে এক্ষুণি সে বায়না ধরতঃ আমি নোব দিদি!

ঃ চাই ঘাস, ঘাস চাই!

রাস্তা দিয়ে ঘাসওয়ালা চলেছে ভার-ভর্ত্তি সবুজ ঘাসের আঁটি নিয়ে। বুবু দেখতে পেয়ে বললেঃ ঘাস দিদি!

ঘাসওয়ালা যেতে যেতে বারেক দাঁড়িয়ে হাঁকলেঃ কচি নরম ঘাস!

বুবু বললেঃ মনার জন্য নিলে হত দিদি!

টবু বললেঃ কিন্তু নেবে কেমন করে?

বুবু একটু ভেবে বললেঃ ওকে বললে আমাদের বাড়ী দিয়ে আসবে না?

টবু বললেঃ আমাদের বাড়ী এখান থেকে অনেকদূর।

ঘাসওয়ালা ততক্ষণে চলে গেছে। বুবু হতাশস্বরে বললেঃ চলে গেল যে!

টবু বললেঃ মনাকে আজ ঘাস খাওয়াবে কে? দাদা পাঠশালায়, আমরা এখানে। বেচারা মনাকে না খেয়েই থাকতে হবে।

বুবু ভেবে কোন কূলকিনারা না পেয়ে বললেঃ তবে কি হবে দিদি!

বুড়ো রামচরণ রান্না করছিল। উনুনে কড়া চাপিয়ে তেলের বোতল উপুড় করেও এক ফোঁটা তেল পড়ল না কড়ায়। রামচরণ

বিরক্ত হয়ে বললে : দূর ছাই! রান্নার সময় বোতলে তেল যাবে ফুরিয়ে!

খালি বোতল হাতে বারান্দায় বেরিয়ে এসে রামচরণ টবু-বুবুদের সামনে দাঁড়াল। বললে : উই যে সামনে মুদীর দোকান—দু'আনার তেল নিয়ে এস ত বাছারা!

টবু-বুবু পরস্পরের দিকে তাকাল।

রামচরণ বললে : ভয় লাগছে? গাড়ী-ঘোড়ার ভয়? কিছু ভয় নেই বাছারা! ঐত সামনে, রাস্তাটা পার হয়েই দোকান। বরদা মুদীকে আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি।

টবু-বুবু কখনো মার অবাধ্য হয় নি। অবাধ্য হতে তারা জানে না। রাস্তায় নামতে তাদের হাতপা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে আসছিল। কিন্তু রামচরণকে না বলার সাহস টবু-বুবুর ছিল না।

রামচরণ দু'আনা পয়সা টবুর হাতে দিয়ে বললে : এই নাও পয়সা।

তেলের শিশি ও পয়সা নিয়ে টবু-বুবু উঠে দাঁড়াল।

রামচরণ বললে : মুদীকে পয়সা দিয়ে বলবে, দু'আনার তেল চাই।

টবু মাথা নাড়ল।

রামচরণ বললে : বল ত কি বলবে মুদীকে?

: দু'আনার তেল চাই।

: বাঃ বেশ!...রামচরণ বললে : এবার চটপট বেরিয়ে পড় ত বাছারা! কিছু ভয় নেই। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও টবু-বুবু ফুটপাথে নামল।

নতুন পাঠশালা

রামচরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে রান্নাঘরের দিকে ছুটল। কড়ায় আগুন ধরে আর কি! রামচরণ কড়ায় জল ঢেলে মশলা বাটতে বসল।

টবু-বুবু হাত ধরাধরি করে আস্তে আস্তে পথে নামল। তাদের কান ঘেঁষে ভোঁ করে একখানি মোটর চলে গেল। তারা লাফিয়ে উঠল। আর একটু হলে বুবুর হাতের শিশিটা পড়ে ভেঙ্গে যেত আর কি! অবশেষে তারা রাস্তা পার হয়ে ফুটপাথে এসে উঠল। ফুট-পাথে গোঁফওয়ালা ইয়া-জোয়ান একটা লোক, তাদের দিকে আড়চোখে দেখছিল। টবু-বুবুর মনে হল, লোকটা যেন কটমট করে তাকাচ্ছে। সামনে মুদীর দোকান।

দোকানে ভীড় ছিল না। একজন লোক পুটলি হাতে নিয়ে পয়সা গুণছিল। টবু-বুবু দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই বললে: গাঁয়ের ছেলেমেয়ে দেখছি যে! এখানে এল কেমন করে?

লোকটা উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে পুটলি নিয়ে চলে গেল।

মুদী টবু-বুবুর দিকে তাকিয়ে বললে: কি চাই বাছারা!

রাস্তা পার হওয়ার উত্তেজনায়, গোঁফওয়ালা লোকটার ভয়ে টবু-বুবু কি নিতে এসেছে, ভুলে গেছল। টবুর মুখ লাল হয়ে উঠল দোকানীর কথার উত্তর দিতে না পেরে।

মুদী বুবুর হাতে শিশি দেখতে পেয়ে—শিশিটা হাতে নিয়ে শুঁকে বললে: ও, তেল কিনতে এসেছ?

এতক্ষণে টবুর মনে পড়ল।

: দু'আনার তেল চাই। টবু বললে।

খানিকটা দূরে রাস্তায় সোরগোল উঠেছে। দু'তিনজন লোক ঝগড়া করছে।

দোকানী সেদিকে বারেক তাকিয়ে, টবুর হাত থেকে দু'আনিটা নিয়ে, শিশিতে তেল ভর্ত্তি করে দিয়ে বললে ঃ দু'আনার তেল।

টবু একহাতে বুবুকে ধরে ও অন্য হাতে শিশিটা নিয়ে ফুটপাথ ধরে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল। রাস্তা দিয়ে গাড়ী-ঘোড়ার স্রোত চলেছে। টবু-বুবু পরস্পরের গা ঘেঁষে ফুটপাথে দাঁড়াল। ট্রাফিক একটু কমলেই রাস্তা পার হবে। তাদের পাশে আরো দু'তিনজন লোক রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

ওদিকে ফুটপাথের ঝগড়া চরমে উঠল। ইতিমধ্যে ফুটপাথে ভীড় জমে গেছল। সহসা 'মার' 'মার' শব্দ উঠতেই, ইতস্তত লোক পালাতে লাগল। টবু-বুবুর আশে-পাশে যারা ছিল তারাও পালিয়ে গেল। কোন্ দিকে পালাবে বুঝতে না পেরে টবু-বুবু থতমত করছিল, এমনি সময় একটা ছোট ছেলে এসে পড়ল টবুর উপর। ধাক্কা লেগে টবুর হাত থেকে তেলের বোতলটা ফুটপাথে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ফুটপাথে তেল ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেটা পেছন ফিরে টবু-বুবুর দিকে ভেংচি কেটে চলে গেল।

দুঃখে অপমানে টবু-বুবুর চোখে জল এল। টবু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে ঃ তেলের শিশি!

ফুটপাথের সোরগোল বেড়ে গেল। যে যেদিকে পারে, ছুটতে লাগল। এক থুর্‌থুরে বুড়ী পালাতে পালাতে বললে ঃ পালা বাছারা!

নতুন পাঠশালা

পুলিশ! সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের ধাক্কা খেয়ে জনৈক গুণ্ডামত লোক এসে ছিটকে পড়ল টবু-বুবুর সামনে ভাঙ্গা কাচের উপর। টবু-বুবু আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না। পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরে ফুটপাথ ধরে সোজা ছুটতে লাগল। মুহূর্ত্তের জন্য তেলের শিশির দুঃখও তারা ভুলে গেল।

কয়েক মিনিট ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ছুটে তারা একটা পার্কের ভেতর এসে ঢুকল। পার্কে তখনো লোকজন জমে নি।

টবু-বুবু কোন্‌দিকে যাবে কিছু বুঝতে না পেরে পার্কে লনের উপর বসে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। পার্কের বাইরে রাস্তায় এত লোকজন ; কিন্তু ভেতরে কেউ আসে না।

ঃ ওঁো ওঁো ওঁো—মার কাছে যাব! বুবু ফোঁপাতে লাগল।

টবু ছোটভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে ঃ কেঁদো না বুবু! কিন্তু নিজেই সে কাঁদতে লাগল। সুন্দী মাসীর বাড়ী এখন তারা কেমন করে খোঁজ পায়! এই অচেনা অজানা সহরে, কেউ তাদের সাহায্য করতে আসবে না, এ-কথা ছোট টবু বুঝতে পেরেছিল।

বুবু কাঁদতে লাগল ঃ দিদি রে!

টবু বললে ঃ কেঁদো না-ভাই! মাসীর বাড়ী খুঁজে বার করতে হবে না?

বুবু মাথা নেড়ে বললে ঃ না না—আমি মার কাছে যাব। আবার সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সামনের বড় রাস্তায় অগণিত মানুষের স্রোত। দু'পাশে ইটের

দালান আকাশে মাথা ঠেকিয়েছে। মাঝখানে লোহার রেলিং-এ ঘেরা জনহীন পার্ক। এমন ভয়াবহ জায়গা টবু-বুবু জীবনে দেখে নি—যেন দৈত্যপুরীর বন্দীশালা! চারদিকে এত মানুষ—কেউ তাদের কাছে আসছে না!

বুবু ফোঁপাতে লাগল: দিদিরে! আমি মার কাছে যাব।

হতাশ হয়ে ভাইবোন পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে ঘাসের উপর বসে রইল। দেখতে দেখতে সুন্দী মাসীর বাড়ীটি যে কোথায় মিলিয়ে গেল, টবু ভেবেই পেল না।

: ও মা! মা-গো! আমি মার কাছে যাব।···বুবু কাঁদতে লাগল: দিদিরে! মার কাছে নিয়ে চল্।

টবুও নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। সহসা কর্কশস্বরে কে পেছন থেকে ডাকলে: এই!

টবু মুখ তুলে তাকাল ভয়ে ভয়ে। সেই গোঁফওয়ালা লম্বা লোকটা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললে: এই তোরা এখানে কি করছিস্?

বুবু ভয়ে চোখ বুজলে। টবুর গলা দিয়ে আওয়াজ বার হল না। লোকটা বললে: হয়েছে কি! কাঁদছিস্ কেন? কাদের ছেলেমেয়ে তোরা?

বুবু সাহস সঞ্চয় করে বললে: মা মা···মার কাছে যাব।

লোকটা বললে: মা কে?

টবু বললে: মা, আমাদের মা। মার কাছে নিয়ে চল না আমাদের।

বুবু আবার ফোঁপাতে লাগল।

লোকটা বললে: হুঁ! কাঁদলে আমি তোমাদের এখানে ফেলে

চললাম। আচ্ছা, উঠে আমার হাত ধর ত দু'জনে।...হ্যাঁ বেশ। এবার বল ত তোমার মা কোন্ পাড়ায় থাকেন।

টবু বললে ঃ বাড়ীতে।

লোকটা টবু-বুবুকে নিয়ে এগোতে লাগল। বললে ঃ হুঁ! বুঝতে পেরেছি। বাড়ী কোন্ দিকে ?

টবু হতাশ স্বরে বললে ঃ এখান থেকে বাসে করে যেতে হয়।

লোকটা বললে ঃ ও হো! বুঝেছি। তোমরা এখানে এলে কি করে?

টবু বললে ঃ বাবার সাথে মাসীর বাড়ী এসেছি।

ঃ মাসীর বাড়ী!...লোকটা গোঁফে তা দিয়ে একটু ভেবে বললে ঃ কিন্তু রাস্তায় এলে কেমন করে ?

টবু বললে ঃ ঐ যে বুড়ো না,—দু'আনার তেল কিনতে আমাদের পাঠিয়েছিল।

লোকটা সহসা প্রায় লাফিয়ে উঠল ঃ তেলের শিশি হাতে একটু আগে তোমরা মুদীর দোকানের দিকে যাচ্ছিলে, না? কিন্তু শিশি কোথায় ?

টবু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে ঃ ধাক্কা মেরে ফেলে ভেঙ্গে দিলে।

লোকটা বললে ঃ বুঝেছি। রাস্তায় মারামারি সুরু হয়েছিল, না?

টবু মাথা নাড়ল।

লোকটা বললে ঃ আচ্ছা, ঐ দোকানটার সামনে গেলে বাড়ী চিনতে পারবে না?

টবু বললে ঃ হুঁ—উ। ... ...

দেখতে দেখতে আধঘণ্টা কেটে গেল। টবু-বুবু ফিরে এল না দেখে দুশ্চিন্তার সীমা রইল না রামচরণের। চিন্তিতমুখে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। মুদীর দোকানের সামনে তখন লোকজন নেই। ফুটপাথ খালি। মুদী বসে বসে ঝিমাচ্ছিল।

রামচরণ ব্যাকুলস্বরে বললে : হ্যাঁগা, দুটো ছেলেমেয়ে তেল নিতে এসেছিল একটু আগে, তাদের দেখেছ ?

মুদী উদাসস্বরে বললে : কৈ না, দেখি নি ত !

সহসা সামনে রামচরণের দৃষ্টি পড়ল। ফুটপাথে তৈলসিক্ত ভাঙ্গা কাচের টুকরোগুলো তখনো ইতস্তত পড়ে আছে। রামচরণ চেঁচিয়ে উঠল : এই যে আমার তেলের শিশি ! কে ভাঙ্গলে গো ! আর ছেলেমেয়ে দুটোই বা গেল কোথায় ?

মুদী চমকে উঠল ; বললে : একটি ছোট মেয়ে আর একটি ছেলে দু'আনার তেল নিতে এসেছিল, না ?

: হ্যাঁ হ্যাঁ ! তারপর—তারপর ?···রামচরণ শুধাল।

মুদী বলল : আমি ত ভাই তেল দিলাম। ওরা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই রাস্তায় মারামারি সুরু হল।

: মারামারি !···রামচরণ মাথায় হাত দিয়ে ফুটপাথে বসে পড়ল : ওরে আমার কি হল রে ! আমি কি করলাম রে ! কেন এদের তেল কিনতে পাঠালাম রে !

রামচরণের কান্না শুনে ফুটপাথে একজন দু'জন করে লোক জড় হতে লাগল।

নতুন পাঠশালা

একটু বাদেই টবু-বুবুদের নিয়ে লোকটি দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। বললে : এ-দোকানেই তোমরা তেল কিনতে এসেছিলে, না ?

টবু-বুবুদের দেখে মুদী লাফিয়ে উঠল : এই যে, এই যে !

রামচরণ তখনো কাঁদছিল। মুখ তুলে তাকিয়ে টবু-বুবুদের দেখে তার খুসীর সীমা রইল না। কান থেকে একটা বিড়ি বার করে লোকটার হাতে দিয়ে বললে : আজ তুমি যে আমার কি উপকার করলে দাদা !

লোকটা বিড়ি ধরিয়ে বললে : হুঁ, বুঝেছি !

রামচরণ টবু-বুবুকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে বাড়ীর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। বললে : তোমাদের ত ফিরে পেলাম, কিন্তু আমার তেলের শিশি—তেল ! এখন আমি রান্না করি কি দিয়ে !

তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে : সোনা যাদুরা, মাসীকে যেন বল নি। বললে মাসী আমাকে বকবে।

রামচরণের প্রতি অনুকম্পায় তাদের মন ভরে উঠল। তারা মাথা নেড়ে জানাল, রাস্তায় হারিয়ে যাওয়ার কথা কাউকে বলবে না।

সুন্দী বাসায় ফিরে দেখে বাড়ীতে রামচরণও নেই, টবু-বুবুও নেই। রান্নাঘরে উনুনের আগুন অনেকক্ষণ নিভে এসেছিল। বুড়ো রামচরণ বাজার করা ছাড়া বাড়ী ছেড়ে বড় একটা বাইরে যায় না। আধখানা রান্না বাকী রেখে, সহসা রামচরণ টবু-বুবুদের নিয়ে কোথায় যেতে পারে, সুন্দী ভেবে উঠতে পারল না।

তবে কি কোন—? ভয়ে আশঙ্কায় সুন্দীর বুক কেঁপে উঠল।

পরের ছেলেমেয়ের দায়িত্ব অনেক। ভগবান না করুন, যদি কিছু ঘটে থাকে, রাখালের কাছে সুন্দী কি বলে মুখ দেখাবে!

এক মুহূর্ত্ত সুন্দী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দে সুন্দীর চমক ভাঙ্গল। তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। রামচরণ টবু-বুবুদের নিয়ে তখন উপরে উঠছে।

সুন্দী রেগে বললেঃ ব্যাপার কি রামচরণ?

রামচরণ মাথা চুলকে বললঃ বাছাদের একটু বেড়িয়ে নিয়ে এলাম মা!

সুন্দী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রামচরণের দিকে তাকিয়ে বললেঃ রান্না-বান্না ফেলে?

রামচরণ মাথা চুলকাতে লাগলঃ আজ্ঞে—

সুন্দী বললেঃ আসল ব্যাপারখানা কি বল দিকি!

রামচরণ আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেঃ কি কুক্ষণেই না আমি এদের মুদীর দোকানে তেল আনতে পাঠিয়েছিলাম! তেল গেল, তেলের শিশি গেল—শেষ পর্য্যন্ত বাছারা আমার হারিয়ে গেছল।

সুন্দী বিস্মিতস্বরে বললেঃ বল কি রামচরণ!

টবু ও বুবু পরস্পরের দিকে তাকাল। বুড়ো শেষকালে নিজেই সব ফাঁস করে দিল।

রামচরণ বললেঃ গ্রহের ফের!···ভগবানের দয়া যে এদের ফিরে পেলাম।

নতুন পাঠশালা

সুন্দী টবু-বুবুদের কোলে নিয়ে আদর করে বললেঃ পথ হারিয়ে ফেলেছিলে বুঝি ?...তারপর রামচরণের দিকে তাকিয়ে বললেঃ তোমার যেমন বুদ্ধি। যাও, চটপট্ রান্না শেষ করগে।

সুন্দী টবু-বুবুর হাতে দু'প্যাকেট চকোলেট্ দিয়ে বললেঃ খাও। আর কখনো রামচরণের কথায় রাস্তায় যেয়ো না, কেমন ?

টবু-বুবু মাথা নাড়ল।

সুন্দী একটি প্যাকেট খুলে, দু'জনকে দু'টুকরো দিয়ে তৃতীয় টুকরো নিজে মুখে পুরল। বুবু নিজের প্যাকেটটা পেন্টের পকেটে রেখে দিল।

একটু বাদেই রাখাল ফিরে এল। সঙ্গে তার সুতোর বাণ্ডিল। সুন্দীকে সামনে দেখে রাখাল বললেঃ বুঝলে সুন্দী, সুতোর দাম যেমন বেড়ে যাচ্ছে—তাঁতের গামছা বানিয়ে আর সংসার চলবে না।

সুন্দী সুতোর বাণ্ডিল একপাশে রেখে বললেঃ চান করে নিন। কলে জল এখনো রয়েছে।

রাখাল বললেঃ কলে জল যখন রয়েছে, চানটা করে নি।... হুঁ, টবু-বুবুদের সঙ্গে দেখছি বেজায় জমিয়ে তুলেছ। তা বেশ ভালই। কিছুদিন এরা থাকুক তোমার কাছে। সামনের বারে যখন সুতো কিনতে আসব—তখন সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কি বলিস্ রে তোরা ?

টবু-বুবু ভীষণ আপত্তি জানাল, বাবার সঙ্গে কালই বাড়ী যাবে।

সুন্দী রাখালের হাতে গামছা ও সাবান দিয়ে বললেঃ থাকতে চাইলেই ওদের রাখছে কে ?

টবু-বুবু মাসীর মুখের দিকে তাকাল।

ফুলবিহার

টবু-বুবুদের অভাবে বাড়ীটা কেমন নিঝ্ঝুম হয়ে উঠেছে। সুতো নেই—তাঁতের ঘর বন্ধ। এমন যে দুরন্ত মনা, সেও আজ চুপ-চাপ গোয়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

মা দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে কাঁথা সেলাই করছিল।

বাবলু আস্তে আস্তে মার পাশে এসে দাঁড়াল। বললে ঃ ওরা আজ আসবে না, না মা ?

মা মুখ তুলে বললে ঃ সুন্দী আজ ওদের নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না।

মা আর কিছু বললে না। বাবলু এ-ঘর ও-ঘর করে আস্তে আস্তে উঠানে নামল।

বাবলুকে দেখতে পেয়ে মনা ডাকলে ঃ হেম্-বা !

বাবলু গোয়ালে ঢুকে মনার গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে ঃ টবু-বুবু নেই, তাই একা একা ভাল লাগছে না বুঝি !

মনা ঘাড় নাড়ল,—যেন সায় দিয়েই।

বাবলু বলতে লাগল ঃ যাও, খানিকটা চরে ফিরে এস।

মনা কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। বাবলু বললে ঃ ওরা কালই ফিরে আসবে। তোমার জন্য কি আনবে বল ত !

মনার চোখ মিটমিটে হয়ে এল, আদরে।

ঃ মোঁ-উ-উ !

নতুন পাঠশালা

বাবলু বললে ঃ ঘুঙুর। টবু-বুবু না আনুক, আমি তোমার গলায় ঘুঙুর পরিয়ে দোব।

পাশের বাড়ীর গোপা ছুটে আসছে দেখে বাবলু গোয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এল! গোপা বাবলুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস-ফিস করে বললে ঃ দ্বারিক বেরিয়ে গেছে।

বাবলু বললে ঃ বেরিয়ে যেতে তুই ওকে দেখেছিস্?

গোপা বললে ঃ এই ত একটু আগে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাবলু একটু ইতস্তত করে বললে ঃ কিন্তু যদি এক্ষুণি ফিরে আসে?

গোপা ঠোঁট উল্টিয়ে বললে ঃ এক্ষুণি বেরিয়ে এক্ষুণি আবার কেউ ফিরে আসতে পারে নাকি!

বাবলু আর ইতস্তত করল না, বললে ঃ তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া। আমি হাবু-গবু-হ্যাপা-ক্ষেপা-ভোলা, সবাইকে ডেকে আনছি।

পরক্ষণেই বাবলু ও গোপা দু'জন দু'দিকে ছুটতে লাগল।

রাঙামাটি গ্রামে ফুলবিহারের কথা কে না জানে। গ্রামের জমিদার বুড়ো রায়মশাই নিজের তদারকে এই বাগান-বাড়ীখানি তৈরী করেন। বিদেশ থেকে নানা ফুল ও ফলের চারাগাছ আনিয়ে নিজের হাতে রোপণ করলেন। দেখতে দেখতে বাড়ীখানি ফলে-ফুলে এক আশ্চর্য্য শোভায় সুশোভিত হয়ে উঠল।

নতুন পাঠশালা

গাঁয়ের লোকেরা বাড়ীখানির নামকরণ করল, ফুলবিহার। বাড়ীর সমুখে চৌধুরীমশাই দীঘি কাটিয়ে দিলেন। গাঁয়ের গরীব-দুঃখী যাদের নিজেদের পুকুর-ঘাট নেই, তাদের জলকষ্ট দূর হল।

গ্রামের চাষী-মেয়েরা কলসী কাঁখে সকালবিকাল দীঘিতে জল নিতে আসে। দীঘির ঘাট তাদের কলহাসিতে মুখরিত হয়ে উঠে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা ফুলবিহারে আসে খেলতে। আর বাড়ীর মাঝখানকার উঁচু মাঠখানি বুঝি ছোটদের খেলাধূলোর জন্যই তৈরী হয়েছে। বর্ষায়ও জল জমে না ওখানটায়।

তারা গাছে উঠে, দাপাদাপি লাফালাফি করে। গাছ থেকে রাশি রাশি ফুল দুরন্ত শিশুদের উপর ঝরে পড়ে। যত খুসী ফল পাড়ে তারা। বুড়ো রায়মশাই দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে খেলায় মত্ত শিশুদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ফুলের মত পবিত্র, সুন্দর শিশুদের আগমনে, বাগান-বাড়ীর ফুলবিহার নাম সত্যিই সার্থক হয়ে উঠেছে।

এদিকে বাগানের মালী এসে বললেঃ হুজুর, গাঁয়ের ছেলেদের কিছুতেই আটকাতে পারছি না।

রায়মশাই চমকে উঠে বললেনঃ আটকাবে! ওদের জন্যই ত আমি বাগান-বাড়ী করেছি।

মালী মাথা চুলকে বললেঃ কিন্তু হুজুর, গাছের ডালপালা সব ভেঙ্গে ফেলছে ওরা!

রায়মশাই বললেনঃ তা ভাঙ্গুক। গাছে আবার নতুন ডালপালা

গজাবে। ফুলবিহার গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের। ওদের নামেই আমি বাড়ীখানি দানপত্র করে যাব।

মালী সেলাম দিয়ে চলে গেল।

সে অবশ্যি অনেক-কাল আগের কথা। দেখতে দেখতে কত-বছর কেটে গেছে। দীঘিতে কত ঢেউ জাগল, কত ঢেউ হারিয়ে গেল, কেউ তার হিসাব রাখে নি। সেদিন ছিল যারা শিশু, আজ তারা প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে পৌছল।

বুড়ো রায়মশাই যখন মারা যান, তাঁর শিশুপুত্র সুরথ তখন সহরে মামাবাড়ী থেকে কলেজে পড়ছিল। রায়মশাইর আর্থিক সঙ্গতি কোনদিনই ছিল না। একদিকে ঋণের ভার যেমন বেড়ে চলল, অন্যদিকে পোষ্যি ও আশ্রিতের সংখ্যা তেমনি দিন দিন বাড়তে লাগল। মুক্তহস্ত রায়মশাই আয়-ব্যয়ের হিসাব কখনো রাখেন নি। সম্পত্তিতে ভাঙ্গন আগেই ধরেছিল। বুড়োবয়সে মহালগুলো এক এক করে নিলাম হয়ে গেল। বাকী যা-ও ছিল, রায়মশাইর মৃত্যুর পর, জ্ঞাতিগোষ্ঠিরা ও পাওনাদার সব দখল করে বসল। সুরথকে সাংসারিক অবস্থার কথা জানালে, পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে—সেজন্য রায়মশাই শেষ পর্যন্ত তাকে কিছু জানান নি। সুরথের অবশ্য জানতে কিছুই বাকী ছিল না। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি তারও ছিল না।

রায়মশাইর শ্রাদ্ধের পর সুরথ আবার মামাবাড়ী ফিরে গেল। ঘর-বাড়ী ও জায়গা-জমি (অল্প স্বল্প যা কিছু ছিল) পড়ে রইল পেছনে।

নতুন পাঠশালা

সুরথের চলে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখল 'ফুলবিহার' দ্বারিক দখল করে বসেছে। দ্বারিক গ্রামের মহাজন। বিপদে আপদে গাঁয়ের সবাইকে তার দ্বারে হাত পাততে হয়। দ্বারিকের বিরুদ্ধে কাণাঘুষা করার সাহস কার আছে!

তা ছাড়া যার বাগান-বাড়ী সে-ই যখন খবর নিচ্ছে না, গাঁয়ের লোকের এমন দায়টা কিসের?

বাড়ী দখল করে দ্বারিক সবাইকে জানিয়ে দিলে, পাওনা টাকার উপর সে ফুলবিহার অধিকার করেছে। দ্বারিক ফুলবিহারের প্রবেশ-পথে কাঠের দরজা বসিয়ে ভারী এক তালা ঝুলিয়ে দিলে দরজায়। কাঠের দরজায় খড়িমাটি দিয়ে লিখে দিলে: প্রবেশ নিষেধ। মালিক শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র।

গ্রামের ছেলেরা দরজায় তালা ও খড়িমাটির লেখা দেখে, হতাশ হয়ে প্রথম দিন ফিরে গেল।

দ্বিতীয় দিন বাবলু খড়িমাটির লেখা মুছে দিয়ে গেল। এত সহজে তারা ফুলবিহারের আশা ছাড়তে পারে না।

তৃতীয় দিন—দ্বারিকের অন্তরঙ্গ গাঁয়ের কবিরাজ খবরটা দিলে দ্বারিককে।

সকালবেলা দ্বারিক নিজের হাতেই উঠানটা পরিষ্কার করছিল। কবিরাজ বাইরে থেকে ডাকলে: মহাজন, বাড়ী আছ নাকি হে!··· এই যে তুমি।

নতুন পাঠশালা

দ্বারিক উঠানটা ঝাট দিতে দিতে বললেঃ বস কবিরাজ বস।

কবিরাজ বললেঃ কাল বিকেলে তুমি বাড়ী ছিলে না বোধ হয়?

মহাজনী কারবার। সুদের তাগিদে প্রায়ই দ্বারিককে খাতকদের বাড়ী যেতে হয়। মহাজনী কারবারে লাভ দু'পয়সা আছে বটে, কিন্তু দ্বারিকের খাটুনিটা বড্ড বেশী।

দ্বারিক বললেঃ কেন?

কবিরাজ বললেঃ ফুলবিহারে ঢুকে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা হুলুস্থুল করছে দেখলাম। ডালপালা ভেঙ্গে একাকার।

দ্বারিক লাফিয়ে উঠে বললেঃ এ্যাঁ বল কি?

কবিরাজ বললেঃ ঐ যে রাখাল তাঁতির ছেলে গো—বাবলু। ঐ ত প্রথম দরজা বেয়ে ভেতরে ঢুকে ভেতরকার খিড়কী-দুয়ার খুলে দিলে।

দ্বারিক হাতের ঝাড়ু শূন্যে তুলে বললেঃ সত্যি বলছ কবিরাজ! রাখালের পো'র এত সাহস!

কবিরাজ হাত নেড়ে বললেঃ ঐ ছোকরাটাই ত যত নষ্টের গোড়া। যাকে বলে পাজির পা-ঝাড়া!

দ্বারিক মাথা নীচু করে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবতে লাগল।

কবিরাজ বললেঃ তুমি দেখে নিও, ওকে আমি একদিন এমন মার দোব, হ্যাঁ—ছোকরা জীবনেও ভুলবে না।

একটু থেমে বললেঃ আর সত্যি বলতে কি, তুমি-ই ত আস্কারা দিয়ে দিয়ে রাখালকে মাথায় তুলেছ। ছোটলোকদের পায়ের নীচে

চেপে রাখতে হয়। তুমি যদি টাকা ধার না দাও, ওকে আর তাঁত চালিয়ে করে খেতে হবে না।

দ্বারিক বললে: ঠিক বলেছ কবিরাজ, তুমি ঠিকই বলেছ। মন আমার বড় নরম কবিরাজ, কারো বিপদ-আপদ দেখলে চুপ করে থাকতে পারি না। তাই জন্যই ত লোকগুলো বড় আস্কারা পেয়ে গেছে।···বস না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

কবিরাজ দাওয়ায় উঠে বসে গলার স্বর নামিয়ে বললে: এক কাজ করতে পার? দশটাকা দিয়ে পনের টাকার দলিল লিখিয়ে নেবে।

দ্বারিক বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে: তা কি আর পারি রে ভাই! মন আমার বড় নরম।

হুঁকো টানতে টানতে পণ্ডিত উঠানে প্রবেশ করে বললে: এই যে কবিরাজ, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

কবিরাজ হুঁকোটি পণ্ডিতের হাত থেকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে একদম লাগিয়ে, এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে: আমার কথা!

পণ্ডিত কবিরাজের পাশে বসে বললে: আমার ভাল হজম হচ্ছে না। গোটা কয়েক হজমী-বটিকা নিয়ে যাব।

কবিরাজ বললে: সে দোব'খন। বুঝলে পণ্ডিত, মহাজন অতগুলো টাকা দিয়ে ফুলবিহার কিনলে কিনা, গাঁয়ের পাঁচভূতে লুটে খাবে বলে?

পণ্ডিত অন্যমনস্ক ভাবে বললে: তা ত খাবেই। কে আটকায়?

নতুন পাঠশালা

দ্বারিক চটে গেল পণ্ডিতের কথায়। বললে : বলি পণ্ডিত, তুমি গাঁয়ের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাচ্ছ—না চুরি করা শেখাচ্ছ?

পণ্ডিত বললে : অর্থাৎ?

কবিরাজ হুঁকোটা পণ্ডিতের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে : অর্থাৎ কিনা, তুমি হচ্ছ চোরের সর্দ্দার।

: চোরের সর্দ্দার!

দ্বারিক বললে : যার পাঠশালার ছেলেরা পরের বাগানে ঢুকে ফলমূল চুরি করে তাকে আর কি বলা যায়!

: কি, এমন কথা!...পণ্ডিত ফেটে পড়ল : আমাকে চটিও না বলছি, মহাজন,—হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দোব। গাঁয়ের ছেলেরা যদি খেলতে ফুলবিহারে ঢুকেই থাকে, এমন কিছু অপরাধ করে নি তারা। সব কথা আমার জানা আছে মহাজন!

দ্বারিক সহসা গলে জল হয়ে গেল। হাসি-হাসি মুখে বললে : আহা পণ্ডিত, তুমি ঠাট্টাও বোঝ না। তোমাকে নিয়ে যে কি করি! বস বস, উঠলে কেন?

পণ্ডিত মাদুরে এসে বসল আবার।

পণ্ডিতের কথায় কবিরাজ বিস্মিত হল। দ্বারিককে চটাতে পারে এতখানি সাহস পণ্ডিতের নেই বলেই সে জানত। তবে কি সত্যিই ফুলবিহার নিয়ে কিছু একটা কেলেঙ্কারি হয়েছে?

দাবার দান আনতে দ্বারিক ঘরে ঢুকল। কবিরাজ পণ্ডিতের কানে কানে আস্তে আস্তে বললে : সত্যি!

পণ্ডিত হুঁকোয় গোটা কয়েক দম দিয়ে বললেঃ কি যে বল! মহাজন আর আমার ভেতর এ রকম কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে। হে-হে-হে!

দ্বারিক দাবার দান নিয়ে বেরিয়ে এল। কবিরাজ বললেঃ খেলতে পারি মহাজন এক সর্ত্তে। দুপুরের আগে তুমি উঠতে পারবে না। দু'দান খেলেই যে উঠে যাবে, তা হবে না।

দাবার গোটী মাদুরে রাখতে রাখতে দ্বারিক বললেঃ রাজি।

পণ্ডিত বসে বসে খেলা দেখতে লাগল। সে দু'দিন আগের কথা।

একদিকে বাবলু, অন্যদিকে গোপা—খবরটা সারা গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের ভেতর ছড়িয়ে দিলে, দ্বারিক বাড়ী নেই। দেখতে দেখতে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা ফুলবিহারের সামনে এসে জড় হল। ফুলবিহারের পাশেই দ্বারিকের বাড়ী। তাই ফুলবিহার দখল করে দ্বারিক বুড়ো মালীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাগানটা সে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসেই দেখা-শোনা করতে পারে। মিছিমিছি আবার মাইনে দিয়ে মালী রাখা কেন!

বাবলু পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে আর একবার দেখে এল। সত্যিই দ্বারিকের ঘরে তালা ঝুলছে। না, ভয়ের কোন কারণ নেই।

অভ্যাসমত বাবলু গেট ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকে খিড়কী-দরজা খুলে দিতেই ছেলেমেয়েরা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সুরু হল শিশুদের উল্লাস। কেউ গাছে উঠে পেয়ারা চিবোতে লাগল। কেউ

ফুল কুড়োতে সুরু করল। ছোটরা দলে দলে ছুটোছুটি লাফালাফি করছে। বাবলু সমবয়সীদের নিয়ে কপাটি খেলছে।

সেদিন দ্বারিক কিন্তু সত্যি-সত্যিই বাইরে যায় নি; ঘরে তালা দিয়ে, ছেলেদের ধরবার জন্য পুকুরঘাটে লুকিয়েছিল। ছেলেমেয়েদের জয়-উল্লাস কানে যেতেই দ্বারিক দ্রুত বেরিয়ে এসে বাগানে ঢুকে, দরজা আগলে দাঁড়াল। হাতে তার গোরু তাড়াবার সরু লাঠি। এক মুহূর্ত্ত দ্বারিক কি করবে ভেবে পেল না।

একটি ছোট মেয়ে কোঁচড়-ভর্ত্তি ফুল নিয়ে যাচ্ছিল। সে-ই প্রথম দ্বারিককে দেখতে পেল। যমদূতের মত লাঠিহাতে সামনে দ্বারিক দাঁড়িয়ে আছে দেখে মেয়েটি প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে উঠে উল্টোদিকে ছুটতে লাগল। কোঁচড়ের ফুলগুলো ঘাসের উপর ছড়িয়ে পড়ল। দ্বারিক একপা এগিয়ে এসে অজান্তে ফুলগুলো পায়ে মাড়িয়ে দাঁড়াল।

ততক্ষণে বাগানে ছেলেমেয়েদের ভেতর হুলুস্থূল পড়ে গেছে। যে যেদিকে পারে ইতস্তত ছুটছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাবলু চেঁচাচ্ছে: এই চুপ কর—সবাই চুপ কর। অবশেষে বাবলু বাড়ীর মাঝখানে সবাইকে জড় করে বললে: এখানে সব দাঁড়াও।

অতবড় বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের পিছু পিছু ছুটে কাউকে ধরা সম্ভব ছিল না। তাই হাতের লাঠি শূন্যে তুলে আস্ফালন করে দ্বারিক চেঁচাতে লাগল: এই কঞ্চি যদি তোদের পিঠে না ভাঙ্গি ত আমার নাম দ্বারিক মহাজন না। দেখি আজ কোন্‌দিক দিয়ে তোরা বেরোস্! পাঁজি নচ্ছারের দল!

নতুন পাঠশালা

সত্যিই ঐ খিড়কী-দুয়ার ছাড়া বাগান থেকে বেরোবার আর কোন উপায় ছিল না। চারদিকে কাঁটা-তারের বেড়া। বেড়ার নীচেই জলভর্ত্তি খাল। দ্বারিক যে আজ সত্যিই তাদের পিঠে লাঠি ভাঙ্গবে, এ-সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই।

ছেলেমেয়েরা মাঠের মাঝখানে বসে আছে দেখে, দ্বারিকও নিজের জায়গায় বসে পড়ল। ছেলেমেয়েদের আজ সে এমন শাস্তি দেবে, আর কোনদিন ফুলবিহারে ঢুকতে তারা সাহস পাবে না।

গোপা বাবলুকে বলছিল ঃ যতক্ষণ না ও যায়, আমরা বসে থাকব।

বাবলু বললে ঃ কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে যে !

যে ছোট মেয়েটি বাবলুর পাশে বসেছিল, কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে ঃ দেরী হলে মা বকবে।

বাবলু এক মতলব আঁটলে। গোপা ও আরো কয়েকটি ছেলে বাবলুর মতলব মত পেয়ারাগাছে উঠে, হুল্লোড় করে কাঁচা পেয়ারা পেড়ে দ্বারিকের দিকে ছুড়ে মারতে লাগল।

গাছের কচি পেয়ারা এমনভাবে ওরা নষ্ট করছে দেখে দ্বারিক আর সহ্য করতে পারল না।

ঃ তবে রে ছুঁচোর দল !···বলে, নিজের মতলব ভুলে লাঠি নিয়ে পেয়ারাগাছের দিকে ছুটল দ্বারিক। সুযোগ পেয়ে বাবলু খিড়কী-দুয়ার দিয়ে এক এক করে ছেলেমেয়েদের বার করে দিতে লাগল।

পেয়ারাগাছের তলায় ছেলেমেয়েদের চীৎকার শুনে দ্বারিক পেছন ফিরে দেখে সবাই পালাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে দ্বারিক দরজার দিকে

আবার আসতে লাগল। এবার গোপা ও ছেলেরা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল নীচে।

ততক্ষণে বাবলু প্রায় সবাইকে বাইরে বার করে দিয়েছে। বাবলু ইচ্ছা করলে নিজেও পালাতে পারত; কিন্তু গোপা ও ভোলাদের ফেলে সে পালাল না। ছুটে এসে মাঝখানের উঁচু মাঠে দাঁড়াল। দ্বারিক দিক্-বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে বাবলুর পিছু পিছু ছুটতে লাগল। বাবলুকে প্রায় ধরে আর কি! কিন্তু বাবলুকে ধরা কি অত সহজ! ততক্ষণে গোপারাও বাইরে বেরিয়ে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে দ্বারিক। শিকারগুলো এমন ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে, দ্বারিক ভাবতেই পারে নি। যত রাগ তার পড়ল গিয়ে বাবলুর উপর।

বাইরে থেকে তখন ছোট ছেলেমেয়েরা টিটকারি দিচ্ছিল: দ্বারিক মহাজন, ধরতে পারলে না ফোঃ! তারা এক পা তুলে ধেই-ধেই করে নেচে নেচে ছড়া কাটতে লাগল:

ছেলেরা সব পালাল,
দ্বারিকের আসা ফুরুল,
হায়রে কপাল!
এবার নিজের পিঠে ভাঙো লাঠি দম্-দমা-দম্।
দ্বারিক মহাজন!
ফো ফো ফো!
ধরতে পারলে না!

অবশেষে দ্বারিক লাঠি ছুড়ে মারতেই শিশুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

কে যায়—কে যায় ?　　পৃঃ ৫১

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ছুটে ছুটে বাবলু ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এক জায়গায় এসে বাবলুকে দ্বারিক প্রায় ধরে ধরে। নিরুপায় বাবলু কাঁটা-তারের ভেতর দিয়ে শরীর গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে একলাফে খাল পার হয়ে চম্পট দিল।

ঝোঁকের মাথায় দ্বারিকও বাবলুর পিছু পিছু লাফ দিল। কিন্তু অক্ষম শরীর নিয়ে দ্বারিক খাল পার হতে পারল না, খালের জলে খাবি খেতে লাগল।

তখন পথে অন্ধকার নেমেছে। কবিরাজ সেদিক দিয়ে ফিরছিল। সহসা খালের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে চমকে উঠল। খালের জলে কি একটা নড়ছে দেখে, ভয়ে কবিরাজের হৃৎকম্প সুরু হল। দ্বারিক তখন খাবি খেতে খেতে অস্ফুটস্বরে চেঁচাচ্ছিল: কে যায়—কে যায়?

জলের শব্দের সাথে দ্বারিকের কণ্ঠ মিলে এক অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল।···প্রেতিনী! শনিবারের সন্ধ্যায় প্রেতিনী ছাড়া অমন অস্বাভাবিক স্বরে কে চেঁচাতে পারে!—ভাবলে কবিরাজ। তার পা টলতে লাগল। সে ইষ্টনাম জপ করতে লাগল: হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ···

কবিরাজের গলা শুনে দ্বারিকের সাহস ফিরে এল। পায়ের উপর ভর করে সে জলের ভেতর উঠে দাঁড়াল। ওমা, এ যে কোমর জল!

প্রেতিনী জলের ভেতর থেকে উঠে আসছে! কবিরাজ রাস্তা থেকে দেখতে পেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। এক নিশ্বাসে কবিরাজ এসে থামল দ্বারিকের দরজায়। বুকখানি তার তখনো ধুক-ধুক করছিল।

একটু বাদেই দ্বারিক এল,—কাপড়-জামা সব ভিজে। দ্বারিক দরজার তালা খুলতে লাগল। কবিরাজ হাঁফাতে হাঁফাতে বললেঃ প্রেতিনী! ঐ খালটায় নিজের চোখে প্রেতিনী দেখে এলাম মহাজন!

দ্বারিক আলো জ্বালতেই কবিরাজের দৃষ্টি পড়ল; বললেঃ এ কি! এই অবেলায় চান করলে যে বড়?

দ্বারিক কাপড় বদলাচ্ছিল, ঘরের ভেতর থেকে বললেঃ ম্‌-মাছ ধরছিলাম।

কবিরাজ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেঃ হুঁ!

দ্বারিক বললেঃ ধরতে কি আর পারলাম ছাই! কাপড় ভেজানোই সার।

কবিরাজ বললেঃ আমার একটু কাজ আছে মহাজন, চলি।

দ্বারিক পিছু ডাকলঃ সে কি! তোমার প্রেতিনীর গল্পটা শোনা হল না যে! বস বস, তামাক সাজছি।

কিন্তু কবিরাজ ততক্ষণে অদৃশ্য।

দ্বারিক ঘরে ঢুকে রাত্রের রান্নার বন্দোবস্ত করতে লাগল। বিকালের কথাগুলো এক এক করে তার মনে পড়ল। এমন করে ছেলেমেয়েদের পেছনে ছুটাছুটি করাটাই বোকামো হয়েছে। পাড়ায় জানাজানি হলে সবাই তাকে নিয়ে হাসি-তামাসা করবে। হুঁ, শাস্তি দিতে হয় ত ঐ বাবলু-ছোড়াটাকেই। দ্বারিক আপন মনে বললেঃ অমন বজ্জাত ছেলে বাপের জন্মে দেখি নি! আজকের শোধ যদি না তুলি ত আমার নাম দ্বারিক মহাজন না,—হুঁ!

বাবলুর হারমোনিয়াম

অদূরে চৌমাথায় গোপা দাঁড়িয়েছিল। বাবলু ছুটতে ছুটতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল ঃ হা হা হা, হি হি হি !···জানিস্ গোপা···হি হি হি, আমাকে তাড়া করতে গিয়ে বুড়ো খালের জলে পড়ে গেছে ! হা হা হা !

গোপাও সে হাসিতে যোগ দিয়ে বললে ঃ ঠিক হয়েছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আমাদের মারতে চেয়েছিল। তাই ত খালের জলে নিজেকে পড়তে হল গিয়ে।

ছ'জনে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল।

গোপা যেতে যেতে বললে ঃ তোর জন্য আমার যা ভয় হয়েছিল বাবলু। যদি বুড়ো তোকে ধরে ফেলত !

বাবলু ঘৃণাভরে বললে ঃ আমাকে আর ধরতে হবে না ওর।

পরেশবাবুর বাড়ী থেকে হারমোনিয়ামের সুর ভেসে আসছিল। বাবলু ও গোপা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগল।

ঃ হারমনি !···গোপা বললে।

বাবলু খুসীর স্বরে বললে ঃ পরেশবাবু,—না রে ?

গোপা বললে ঃ কাল রাত পরেশবাবু আর তাঁর মেয়ে এসেছেন, তুই জানিস্ না ?

নতুন পাঠশালা

পরেশবাবু বিদেশে ব্যবসা করেন। প্রতি বছরেই একবার দেশে এসে কিছুদিন থাকেন। পরেশবাবু গাইয়ে লোক। গ্রামে যে-ক'দিন থাকেন, গান-বাজনা নিয়েই কাটে তাঁর। সেজন্যই পরেশবাবুর নামে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের এত উৎসাহ। পরেশবাবু বাড়ী এলেই সারা গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে পরেশবাবু জাতীয়-সঙ্গীত শেখান। অবশেষে একদিন গানের আসর বসে। পাঁচটা গাঁয়ের লোক সে আসরে গান শুনতে আসে।

রাঙামাটি গ্রামে বাবলুর গলার মত মিষ্টি গলা আর কারো নেই। বাবলু না এলে পরেশবাবুর গানের আসর জমে না। রিহার্সেলে বাবলুর গান শুনতে পাড়ার লোক ছুটে আসে।

সে বছর পরেশবাবু রাখালকে বলেছিলেন ঃ রাখাল, বাবলু সুযোগ পেলে মস্তবড় গাইয়ে হবে। তোমার বংশের নাম রাখবে।

ছেলের প্রশংসা শুনে রাখাল হাতজোড় করে বলেছিল ঃ ওকথা বলবেন না বাবু! গরীব তাঁতির ছেলে, এ-বেলা জুটে ত ও-বেলা জুটে না। গান-বাজনা কি আমাদের পোষায়!

পরেশবাবু উত্তরে বলেছিলেন ঃ তুমি জান না রাখাল, বড় বড় গাইয়েদের কত মান-সম্মান, প্রতিপত্তি। বাবলু তোমার অবস্থা ফিরাবে। ওকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিও।

ঃ হারমনি!...রাখাল হাসতে লাগল ঃ হো-হো-হো, হারমনি!... যেন এত বড় একটা মজার কথা আর হয় না!

পরেশবাবু বলেছিলেন ঃ টাকা পনেরর ভেতর আমি সহর থেকে

একটা ভাল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড হারমোনিয়াম কিনে দোব, বাবলুকে। হ্যাঁ, পনের টাকাই যথেষ্ট।

পরেশবাবু চলে গেলে রাখাল হুঁকোয় গোটা কয়েক দম মেরে বলেছিল : হারমনি! গরীবের ছেলের ঘোড়ারোগ।

হারমোনিয়ামের কথাটা রাখাল কানেই তুলে নি। কিন্তু বাবলু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, হারমোনিয়ামের পনের টাকা সে যোগাড় করে পরেশবাবুকে দেবেই।

সেই থেকে দেড়টা বছর বাবলু হারমোনিয়াম কিনবার জন্য পয়সা জমাচ্ছে। বাবা কিংবা মার কাছ থেকে যখনই সে দু'-এক পয়সা আদায় করে, বাঁশের খুঁটির গর্ত্তে, তাই জমা রাখে। সপ্তায় দু'দিন —হাট-বার। হাট-বারে বাবলু তার 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে' তিন-চার আনা জমায়। সারাটি বছর নিজেকে বঞ্চিত রেখে বাবলু পয়সা জমিয়েছে হারমোনিয়াম কিনবে বলে। বাঁশের গর্ত্তের কথা বাবলু কাউকে বলে নি; এমন কি টবু-বুবুকেও না। সময় এলেই বাবলু বাঁশ কেটে পয়সাগুলো বার করে পরেশবাবুর হাতে দেবে। তাই পরেশবাবু বাড়ী এসেছেন শুনে বাবলুর উৎসাহের সীমা ছিল না। এতদিন বাদে সত্যি-সত্যিই বাবলুর একটা হারমোনিয়াম হবে।

: গোপা!...বাবলু বললে : জানিস্ এবার আমি হারমোনিয়াম কিনব।

গোপা বললে : কিন্তু টাকা?

বাবলু বাড়ী ঢুকতে ঢুকতে বললে : কাল বলব।

নতুন পাঠশালা

ঘরে ফিরে বাবলু দেখে মা শুয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলা মা কখনো বিছানা নেয় না। তবে কি মার অসুখ করল? একটা অজানিত ভয়ে বাবলুর মুখখানি শুকিয়ে গেল।

বেড়ার দিকে পাশ ফিরে শুয়েছিল মা। বাবলু পা টিপে টিপে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াতেই, মা বললেঃ কোথায় ছিলি সারা বিকাল! ডেকে ডেকে হয়রান।

বাবলু ঢোঁক গিলে বললেঃ তোমার অসুখ করেছে মা? ওষুধ আনতে কবিরাজের কাছে যাব?

মা এতক্ষণে বাবলুর দিকে পাশ ফিরে বললেঃ না না এখন আর যায় না। তা ছাড়া ব্যথাটাও কমে গেছে।...হাঁড়িতে ভাত-তরকারি রয়েছে, নিজে নিয়ে খেয়ে নাও। আমি বিছানা থেকে উঠতে পারব না বাবা!

বাবলু মার পাশে বিছানায় বসে বললেঃ আমি খাব না মা, ক্ষিধে নেই।

মা বাবলুর মাথায় একখানি হাত রেখে বললেঃ আমার শরীর ভাল নেই বলে, তুই খাবি নি? চট্ করে খেয়ে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও ত বাবা!

বাবলু তবু বসে রইল। মা বললেঃ বেশী কথা কইলে, ব্যথাটা আবার বেড়ে যাবে বাবলু!

বাবলু আর আপত্তি করল না। সুবোধ ছেলের মত রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি থেকে ভাত-তরকারি নিয়ে সে খেতে বসল। কিন্তু খেতে

সত্যিই সে পারল না। মার সেই পুরানো ব্যথাটা যে খুব খারাপ, বাবলুর জানতে বাকী ছিল না। ক'মাস আগে সেবার যখন ব্যথাটা উঠেছিল, বাবা সারারাত জেগে মার কোমরে গরম সেঁক দিয়েছিল।

দু'তিন গ্রাস মুখে দিয়ে বাবলু থালায় জল ঢেলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। গামছায় মুখ মুছতে মুছতে মার পাশে এসে দাঁড়াল বাবলু।

মুখ না ফিরিয়েই মা বললে : কিছু খেলি নি ত!

: খেয়েছি ত।...বাবলু বললে।

মা বললে : আমার মাথার কাছে একগ্লাস জল এনে রাখ বাবা!

বাবলু গ্লাস-ভর্ত্তি জল মার মাথার কাছে রেখে বিছানার এক কোণে বসে রইল। আজ রাত সে ঘুমোবে না—বাবলু মনে মনে স্থির করল।

কিন্তু কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই মা বললে : বসে আছিস্ কেন? শুয়ে পড়।

বাবলু বললে : আমি শোব না মা!

মা বিরক্তস্বরে বললে : যা বলছি কর। দরকার হলে আমি জাগাব 'খন।

বাবলু মার পাশে শুয়ে পড়ল। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বাবলু ভাবল, আজ রাত কিছুতেই সে ঘুমোবে না—কিছুতেই না।

ভোর রাতে মায়ের ব্যথাটা আবার বেড়ে গেল। যন্ত্রণায় মা গোঙ্গাতে লাগল। বাবলুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। লাফিয়ে উঠে বসল সে বিছানায়। ছোট বাবলু এক মুহূর্ত্ত কি করবে ভেবে পেল না।

নতুন পাঠশালা

জানালা দিয়ে প্রথম ভোরের রূপালি আলো ঘরের ভেতর এসে পড়ল। বাবলু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। পরক্ষণেই প্রথম ভোরের প্রায়ান্ধকার নির্জ্জন পথ ধরে ছুটতে লাগল সে।

ধাইমা সবেমাত্র দরজা খুলেছে,—বাবলুকে ছুটে আসতে দেখে উঠানে নেমে বললে : কি বাবলু!

বাবলু কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে : মার অসুখ! সেই পুরানো ব্যথাটা আবার উঠেছে।

ধাইমা আর ঘরে ঢুকল না। বাবলুর আগে আগে রাস্তায় বেরিয়ে বললে : পুকুরঘাট থেকে হাতমুখ ধুয়ে আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। তুমি একবার কবিরাজকে ডেকে আনতে পার কিনা, চেষ্টা করে ছ্যাখো।

বাবলু মাথা নেড়ে কবিরাজের বাড়ীর পথ ধরল।

কবিরাজ তখন পুকুরঘাটের দিকে চলেছিল। দূর থেকে বাবলুকে ছুটে আসতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললে : বলি ব্যাপারখানা কি, এ্যাঁ? ভোরবেলা আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

বাবলু ধরাগলায় বললে : মার বড় অসুখ। আপনাকে একবার আসতে হবে কবিরাজমশাই।

কবিরাজ ভুরু কপালে তুলে বললে : তোর মার অসুখ ত আমার কি ছোকরা। দায়ে পড়লেই কবরেজকে মনে পড়ে, না? সেই গেল-বারের ওষুধের দাম পাঁচটাকা আজো পাইনি। আমি যেতে পারব না।

বাবলু এবার কেঁদে ফেললে। কান্না-জড়িত স্বরে বললে : আপনার পায়ে পড়ি কবরেজমশাই, একবারটি আসুন।

কবিরাজ বললে : যাব না কেন—একশ'বার যাব। টাকা আছে ?

বাবলু কেঁদে বললে : আপনার সব টাকা আমি দিয়ে দোব কবরেজমশাই !

: সব টাকা দিয়ে দিবি, এঁ্যা !···কবিরাজ বললে : তবে তাই নিয়ে আয়। আগেকার পাঁচটাকা, আর আজকের দর্শনী ও দু'হপ্তা ওষুধের দাম একুনে দশটাকা।

বাবলু কাতরস্বরে বললে : আমার কাছে টাকা আছে কবরেজমশাই !

কবিরাজ বললে : বটে ? কোথায় পেলি অত টাকা ?

বাবলু বললে : জমিয়েছি।

: হুঁ !···কবিরাজ হুঙ্কার ছেড়ে বললে : তবে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন ? টাকা নিয়ে আয়। টাকা হাতে পেলেই আমি রওয়ানা হব।

বারেক কবিরাজের দিকে তাকিয়ে বাড়ীর পথ ধরল বাবলু।

ধাইমা মার কোমরে সেঁক দিচ্ছিল। মা তখনো ব্যথায় কোঁকাচ্ছে। বাবলু ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে দাঁড়াতেই ধাইমা বললে : এল না ত কবরেজ ? আমি জানতাম। আগাম টাকা নিয়ে আজকাল ও রোগীর বাড়ীতে যায়। পয়সার ভাঁগাড়।

বাবলু মুহূর্ত্তে তার কর্ত্তব্য স্থির করে নিল। তার এতদিনকার কষ্টে জমানো পয়সা,—সাধের হারমোনিয়াম ! বাবলুর চোখে জল এল। শুধু কি হারমোনিয়ামের জন্যই ? না,—মায়ের কষ্টেও। ছোট বাবলু হারমোনিয়ামের চেয়ে মাকে বেশী ভালবাসে।

নতুন পাঠশালা

বাইরে বেরিয়ে এসে দা দিয়ে বাঁশের খুটীর একপাশটা কেটে বাবলু এতদিনের সঞ্চিত পয়সা আনি দুআনি ও সিকিগুলো বার করল। গুণে দেখবার সময় নেই এখন বাবলুর।

হাটের লম্বা থলেটা রেজকীতে ভর্ত্তি হয়ে উঠল।

বাবলু আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না,—থলেটা হাতে করে ঊর্দ্ধশ্বাসে কবিরাজের বাড়ীর দিকে ছুটল। কবিরাজকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে সে।

বাবলু চলে গেলে, কবিরাজ আপন মনে বললেঃ ছোকরা পাবে কোথায় পয়সা?···বাবলু যে সত্যি-সত্যিই টাকা নিয়ে আসবে কবিরাজ বিশ্বাস করতে পারে নি। বাবলুর জন্য অপেক্ষা না করে কবিরাজ দ্বারিকের দাওয়ায় চলল।

দ্বারিক দাওয়ায় বসে তামাকু টানছিল। কবিরাজ এসে তার পাশে বসে বললেঃ কাল রাত্তিরে গরমে ঘুম হয় নি মহাজন! এবারে গরমটাও পড়েছে।

দ্বারিক হুঁকো টানতে টানতে বললেঃ তা ত পড়েছেই। গরমের দিন গরম, শীতের দিনে শীত যদি না পড়ে ত বিধাতার সৃষ্টিই উল্টে যাবে।

কবিরাজ বললেঃ তোমার ঘুম হয়েছিল ত?

দ্বারিক বললেঃ ঘুম আমার কোনদিনই হয় না কবিরাজ!

ঃ বল কি!···কবিরাজ বিস্মিতস্বরে বললে।

দ্বারিক এতক্ষণে হুঁকোটা কবিরাজের হাতে দিয়ে বললেঃ আমার

মত যদি সুদী কারবার করতে, বুঝতে পারতে কবিরাজ। কোন্ খাতকের আর্থিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে—কে জায়গাজমি বেনামী করে আমাকে ঠকাবার চেষ্টায় আছে, এসব গোপনীয় খবরও আমাকে রাখতে হয় কবিরাজ।

এদিকে বাবলু কবিরাজকে বাড়ী না পেয়ে ছুটতে ছুটতে দ্বারিকের উঠানে এসে করুণ-স্বরে বললেঃ কবরেজমশাই, টাকা এনেছি। আপনার পায়ে পড়ি এক্ষুণি আমার সাথে আসুন।

বাবলু থলেটা কবিরাজের পায়ের কাছে রেখে দিল।

ঃ টাকা এনেছিস্?…কবিরাজের দু'চোখ জ্বলে উঠল। থলেটা তুলে ধরে বললেঃ এ্যাঁ! এযে দেখছি রেজকী!

থলের মুখটা খুলে কবিরাজের ত চক্ষুস্থির। দ্বারিকও ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

ঃ এত পয়সা!…দ্বারিক বললে।

একমুহূর্ত্ত কবিরাজ ও দ্বারিকের চোখাচোখি হল।

দ্বারিক কবিরাজকে বললেঃ কিসের টাকা?

কবিরাজ উঠে দাঁড়াল থলে হাতে; বললেঃ আমার পাওনা।

দ্বারিক বাবলুর দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেঃ এতগুলো রেজকী কোথায় পেলি?

বাবলুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে উত্তর দিতে পারল না এক মুহূর্ত্ত। দ্বারিক কবিরাজকে বললেঃ ছোকরা মিট্‌মিটে শয়তান।

কবিরাজ উঠানে নেমে বললেঃ তা কি আর আমি জানিনে?

বলতে বলতে কবিরাজ বাবলুর দিকে তাকাল : টাকা কোত্থেকে চুরি করেছিস্ বল্ ছোকরা !

অপমানে, উত্তেজনায়, ভয়ে বাবলুর গলা কেঁপে উঠল, বললে : চুরি করি নি কবরেজমশাই, এগুলো আমার সারা বছরের জমানো পয়সা !

: জমানো পয়সা !···কবিরাজ ভেংচি কাটলে : দুর্ব্বাঘাসের শিকড় খাইয়ে কত দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিলাম,—আর আমার সাথে ফাঁকিবাজী ! সত্যিকথা বল বাবলু, তা না হলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দোব।

দ্বারিক দাঁতে দাঁত ঘষে বললে : কাল বিকেলের শোধ এখন কড়ায়-গণ্ডায় তুলব। বুঝলে কবরেজ, ঐ বদমায়েস ছোকরাই কাল সন্ধ্যাবেলা আমায় খালের জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল।

: এ্যাঁ, এতখানি ? কবিরাজ বললে।

দ্বারিক বললে : প্রথমে প্রহার-পর্ব্ব। তারপরে পুলিশে দেওয়া। ব্যস্ !

কবিরাজ পায়চারি করে বললে : সে ত দিতেই হবে।

বাবলুর দিকে ফিরে বললে : বাঁচতে চাস্ ত এখনো সত্যিকথা বল ছোকরা। চুরি করে কেউ কখনো ফাঁকি দিতে পারে না। এখনো সময় আছে, সত্যিকথা বল কার ক্যাশ ভেঙ্গেছিস্। তাকে এখানে ডেকে এনে একটা মিট-মাট করিয়ে দিচ্ছি।

বাবলু কবিরাজের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। সে চোর ! তাকে চোর বলতে এদের বিবেকে বাধল না !

পরক্ষণেই বাবলু এক ঝটকায় পয়সার থলেটা কবিরাজের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। টানাটানিতে থলের আধেক পয়সা উঠানে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল।

কবিরাজ ততক্ষণে 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচাতে সুরু করেছে। বাইরের পথ দিয়ে কয়েকজন চাষী মাঠে যাচ্ছিল। চীৎকার শুনে উঠানে প্রবেশ করল তারা।

কবিরাজ বলতে লাগল ঃ এই ছোকরা টাকার থলে চুরি করেছে। এই ছাখো তোমরা সব।

থলে উঁচু করে কবিরাজ চাষীদের দেখাতে লাগল।

গোবিন বললে ঃ তুই রাখালের ছেলে, না?

রহিম এগিয়ে এসে বললে ঃ রাখালের ছেলে চোর!

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললে ঃ এমন ভালমানুষ রাখাল, আর তার ছেলে হল কি না চোর! ছি ছি!

দ্বারিক এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এগিয়ে এসে বললে ঃ চোর না ডাকাত! চুরি করে ধরা পড়েছে। আবার থলেটা কবরেজের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পালাতে চাইছিল!···বলে, ঠাস্ করে এক চড় লাগাল বাবলুর গালে। মারটা কে আগে সুরু করবে সবাই অপেক্ষা করছিল। চাষীরা এবার বাবলুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ ওর চুলের মুঠো টেনে ধরে শাসাতে লাগল। কেউ বা পিঠে দু'ঘা বসিয়ে দিল। মুহূর্ত্তের ভেতর দ্বারিকের উঠানে রীতিমত হট্টগোল সুরু হল।

বাইরের রাস্তা দিয়ে সুরথ পরেশবাবুর বাড়ীর দিকে চলেছিল।

নতুন পাঠশালা

হট্টগোল শুনে দ্বারিকের উঠানে প্রবেশ করল। সুরথকে দেখে চাষীরা বাবলুকে ছেড়ে দিলে। মুহূর্ত্তের জন্য সুরথ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ঃ সুরথবাবু যে !

ঃ ছোটবাবু !

ঃ নমস্কার ছোটবাবু !

এমন কি দ্বারিকও খুসীর স্বরে বললে ঃ কবে বাড়ী এলে, বাবাজী !

বাবলু তখন চোরের মত মাথা নীচু করে উঠানের এককোণে দাঁড়িয়েছিল। সুরথ কারো কথায় কোন উত্তর না দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে বললে ঃ ব্যাপার কি ! এই ছোট ছেলেটিকে আপনারা সবাই মারপিট করছেন ! কিন্তু কেন—কি করেছে সে ?

কবিরাজ হাতের থলেটা দেখিয়ে বললে ঃ এই টাকার থলে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল।

সুরথ বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললে ঃ ছি ছি ! তুমি চোর !

রহিম বললে ঃ সাধুর ছেলেই চোর হয়। তা না হলে রাখালের ছেলে হয়ে, ছোকরা চুরি করত না।

সুরথ এক মুহূর্ত্ত চুপ করে কি ভেবে বললে ঃ ছোট ছেলে যদি চুরি করেই থাকে—তাকে এমন করে মারতে আছে ?

তারপর কবিরাজের দিকে তাকিয়ে বললে ঃ থলের মালিক কে ?

কবিরাজ বললে ঃ সেজন্যই ত ওকে মারা হচ্ছে। মালিকের নামটা যদি ও বলে দেয়, ওকে আমরা ছেড়ে দি'। কিন্তু ছোকরা কিছুতেই স্বীকার করবে না।

সহসা বাবলু কান্না-জড়িত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল : থলের মালিক আমি। আমার টাকা।

বাবলুর কথা শুনে এক মুহূর্ত্ত সব চুপ-চাপ। শরাফত ঘন ঘন দাঁড়ি নাড়তে লাগল : তাই ত, ছোকরা বলে কি!

কবিরাজ বাবলুকে শাসিয়ে বললে : এখনো সত্যিকথা বলবি নি ছোকরা!...বেশ, পুলিশের গুঁতো খেলেই ঠিক হবে।

সুরথ বিস্মিত দৃষ্টিতে দ্বারিকের দিকে তাকিয়ে বললে : ব্যাপারটা কি আমি বুঝে উঠতে পারছি নে। ও বলছে, টাকার থলে ওর। আপনাদের অবিশ্বাস করবার কারণ?

দ্বারিক বললে : মিছে কথা, স্রেফ মিছে কথা বলছে। দু'দিন আগে রাখাল আমার কাছ থেকে সুতো কিনবে বলে পনের টাকা—অর্থাৎ কিনা পঁচিশ টাকা ধার নিয়েছে।

সুরথ কবিরাজের হাত থেকে থলেটা নিয়ে বললে : থলের মালিক খুঁজে বার করে, ওকে চোর ধরুন কবরেজমশাই!

কবিরাজের মুখ অন্ধকার হয়ে এল; বললে : তা'লে তুমি বলতে চাও, ছোকরা চোর না!

সুরথ বাবলুর দিকে তাকাল। বাবলু কান্না-জড়িত স্বরে বললে : আমার সাথে আসুন।

সুরথ কবিরাজ ও দ্বারিকের দিকে তাকিয়ে বললে : আসুন, ওর সাথে যাওয়া যাক্। টাকার থলে কোত্থেকে নিয়েছে জানা যাবে।

ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে দ্বারিক রণে ভঙ্গ দিল; বললে :

না না, এখন আমার বেরোবার উপায় নেই। খাতকেরা আসছে।··· কার টাকা, কে মালিক, কে চোর তোমরা বুঝ গিয়ে, আমার এত সময় নেই।

চাষীরাও এক এক করে সরে পড়ল।

একজন বললেঃ যাই, মাঠে যেতে হবে।

অপরজন বললেঃ গোরুগুলো এখনো নায়াওনো হয় নি।

অবশেষে উঠানে রইল কবিরাজ, সুরথ আর বাবলু। সুরথ কবিরাজের দিকে তাকাতেই কবিরাজ বললেঃ বেশ ত, এস না। হাতে-নাতে ওকে আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। ফাঁকিবাজী আমার সাথে চলবে না। দুর্ব্বাঘাসের শিকড় খাইয়ে কত রোগী আরোগ্য করে দিলাম!

কবিরাজ, সুরথ ও বাবলু চলে গেলে দ্বারিকের দৃষ্টি পড়ল উঠানে ছড়ানো রেজকীগুলোর উপর। দেখতে দেখতে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল লোভে। উঠানে হামাগুড়ি দিয়ে সে রেজকীগুলো কুড়াতে সুরু করল।

এদিকে সুরথ ও কবিরাজ বাবলুর পিছু পিছু রাখালের উঠানে ঢুকল। ঘরের ভেতর মার কোঁকানো বন্ধ হয়ে এসেছে। মা অনেকটা সুস্থ এখন। দরজায় দাঁড়িয়ে ধাইমা বাবলুর সঙ্গে সুরথ ও কবিরাজকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

বাবলু বারেক সুরথের দিকে তাকিয়ে সদ্যকাটা বাঁশের খুটীটা দেখিয়ে দিল। ঃ পয়সাগুলো—বাবলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেঃ সারা বছর ধরে এর ভেতর জমিয়েছিলাম, হারমনি কিনব বলে।

সুরথ বললে : তারপর তারপর ?

বাবলু বলতে লাগল : কবরেজমশাইকে ডাকতে গেলাম, মার জন্য। বললে, দশটাকা নিয়ে এস। তা নইলে আসব না।···বাড়ী এসে খুটী কেটে পয়সা বার করে ওর কাছে নিয়ে গেলাম। সেখানে আমায় চোর ধরে মারলে।···বাবলু ফোঁপাতে লাগল দু'হাতে মুখ ঢেকে।

বাবলুর ফোঁপানো শুনে মা বিছানা থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এল।

ধাইমা এগিয়ে এসে কবিরাজকে বললে : এতটুকুন ছেলেকে মিথ্যে মার-ধর করতে তোমার লজ্জা করল না ?

লজ্জায় কবিরাজ মাথা নীচু করল। আস্তে আস্তে সে রাস্তায় অদৃশ্য হল।

সুরথ বাবলুর মাথায় হাত রেখে বললে : কেঁদো না বাবলু। এ লজ্জা তোমার নয়, এ লজ্জা তাদের যারা তোমায় মিছামিছি অপমান করল।

মা কাছে এসে দাড়াতেই, আকুল-কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বাবলু মায়ের বুকে মুখ লুকাল।

মারও চোখে জল এসে পড়ল। ধরাগলায় বললে : আমার জন্য আজ তোকে এত লাঞ্ছনা সইতে হল বাবলু !

মা ও ছেলের দিকে বারেক তাকিয়ে সুরথ আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতে লাগল। ধাইমা পিছু ডাকল : বসবেন না ?

সুরথ যেতে যেতে বললে : আর একদিন আসব। আজ আসি।

নতুন পাঠশালা

বাবলুকে হাত ধরে টেনে তুলে মা বললে ঃ ঘরে আয় বাবলু !

ধাইমা থলেটা উঠান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বললে ঃ এ কি ! থলেটা খালি যে ?

বাবলু চোখ মুছে বললে ঃ থলে ভর্ত্তি রেজকী ছিল। সব দ্বারিকের উঠানে ছড়িয়ে ফেলে দিলে।

মা বললে ঃ বলিস্ কি বাবলু !

দুঃখে অপমানে বাবলু ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

ধাইমা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে ঃ ভগবান এর বিচার করবেন।

মা বাধা দিয়ে বললে ঃ কাউকে শাপমন্যি দিতে নেই দিদি। ওতে নিজের অনিষ্ট হয়।

রান্নাঘরে ঢুকে মা বললে ঃ বেলা অনেক হল। খুব ক্ষিধে পেয়েছে, না ? চিড়ে কলা খেয়ে নে এখন, রান্না হতে দেরী হবে।

বাবলু বললে ঃ না মা, কিছু খাব না।

ঃ বাবলু !...মা আব্দারের সুরে বললে ঃ যারা তোকে মেরেছে তাদের খেতে না পাওয়া উচিত ; তুই কেন খাবি নি ! বোস্ এখানে।

বাবলু খেতে লাগল।

মা বললে ঃ অত রেজকী তুই কেমন করে জমিয়েছিলি, বাবলু !

বাবলু বললে ঃ না খেয়ে খেয়ে দেড় বছর ধরে পয়সা জমিয়েছি হারমনি কিনব বলে।...বলতে বলতে বাবলুর গলা আবার ধরে এল।

মা সান্ত্বনা দিয়ে বললে ঃ তুই ভাবিস্ নি বাবলু, হারমনি তোকে আমি কিনে দোবই।

ছোট বাবলুর এ-কথা জানতে বাকী ছিল না, হারমোনিয়াম জীবনে আর কেনা হয়ে উঠবে না। আজকের ব্যাপারের পর হারমোনিয়াম কিনবার সখও তার ছিল না।

একটু বাদেই রাস্তায় টবু-বুবুর কলকণ্ঠ শোনা গেল। ওরা ফিরে এসেছে। মা বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দার খুটিতে ঠেস দিয়ে বাবলু যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। কবিরাজের অপমানের জ্বালা বাবলু ভুলতে পারছে না।

ঃ মা !···টবু-বুবু রাখালের আগে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল।

মা বললে ঃ মাসী কেমন আছে রে ?

বুবু বললে ঃ মাসী খুব ভাল মা !

টবু বললে ঃ আবার মাসীবাড়ীতে যাব মা !

মা হেসে বললে ঃ একবার গিয়ে লোভ হয়েছে। কিন্তু মাসীকে আমাদের বাড়ীতে আসতে বললি নি ?

তাই ত, কথাটা টবু-বুবু কারো মনে পড়ে নি। মার প্রশ্নে তারা লজ্জিত হল।

সুতোর বাণ্ডিল ও খাবারের পুটলি হাতে নিয়ে রাখাল ততক্ষণে সেখানে এসে পড়েছে। বললে ঃ সুন্দী আসবে বলে কথা দিয়েছে। জান বাবলুর মা, তোমার ছেলে-মেয়ের কীর্ত্তি ? রাস্তায় হারিয়ে গিয়েছিল।

নতুন পাঠশালা

মা বিস্মিত স্বরে বললেঃ বল কি! আমাদের উপর বড় বিপদ গেছে দেখছি!

আমাদের! রাখাল কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকাল।

মা বললেঃ কাল সারারাত সেই ব্যথাটা। ভোরে ত প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা! তোমাদের আর দেখতে পাব ভরসা ছিল না।

রাখাল দাওয়ায় উঠে স্বতোর বাণ্ডিল ও খাবারের পুটলি তার হাতে দিয়ে বললেঃ বড় বিপদ গেছে ত! এখন কেমন আছ বাবলুর মা?

সহসা দাওয়ার কোণে বাবলুর দিকে দৃষ্টি পড়তেই রাখাল বললেঃ সেজন্যই বুঝি বাবলু এমন মনমরা!

বাবলু তেমনি খুটিতে হেলান দিয়ে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইল। মা তার দিকে বারেক তাকিয়ে চোখের জলে সকালবেলার সবকথা রাখালকে বললে। ক্রোধে রাখাল দাঁতে দাঁত চেপে বললেঃ আমি গরীব বলে আমার ছেলেকে চোর ধরলে! এক্ষুণি আমি গাঁয়ের পঞ্চায়েতের কাছে যাচ্ছি। এর বিচার চাই।

কিন্তু রাখাল সত্যিসত্যিই পঞ্চায়েতের কাছে গেল না। কবিরাজ প্রাচীনলোক, রাখালের ছেলেকে দু'ঘা যদি মেরেই থাকে—ভালর জন্যই মেরেছে। পঞ্চায়েত হেসেই উড়িয়ে দেবে রাখালের নালিশ। বার কয়েক উঠানে পায়চারি করে রাখাল দাওয়ায় বসে বললঃ কই গো বাবলুর মা, একছিলিম তামাকু সেজে আন।

রাখালের রাগ পড়ে এসেছে। বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেঃ

ভগবান কারো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। হারমনি তুই নিশ্চয়ই পাবি, বাবলু!

বাবলু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে: হারমনি কে চাইছে!

এদিকে টবু-বুবুর গলা শুনে মনা গোয়াল থেকে ডাকতে লাগল: হে-ম্-বা!

রান্নাঘর থেকে মা বললে: টবু-বুবু, তোমাদের বন্ধু ডাকছে। তাড়াতাড়ি যাও, তা না হলে দড়ি ছিঁড়ে ছুটে আসবে।

টবু-বুবু ছুটে এসে মনার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। টবু বললে: মনা আমার, লক্ষ্মী মনা!···আমাদের না পেয়ে কাল খুব কষ্ট হয়েছিল, না?

বুবু বললে: আমরা যে মাসীবাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম!

টবু বললে: নিয়ে যাই নি বলে রাগ হয়েছ? কেমন করে নিয়ে যাই বল! বাসে ত তুই ঢুকতেই পারবি নি।

মনা শুধু অস্ফুট শব্দ করলে: মো-উ-উ!

বুবু বললে: কেন বাসের ছাদের উপর?

টবু বললে: কিন্তু উপরে উঠবে কেমন করে?

বুবু বললে: পেছনে সিঁড়ি আছে না!

টবু বললে: সে কি করে হয়? বেচারা! কাল পেট ভরে খায় নি। তুই দাঁড়া। আমি ঘাস ছিঁড়ে আনছি ওপাশ থেকে।

কৃতজ্ঞতায় মনা গলা বাড়িয়ে দিল।

বুবু পেণ্টের পকেট থেকে এক-টুকরো চকোলেট্ বার করে

বললেঃ মনা, লক্ষ্মীসোনা! তোর জন্য সহর থেকে কি এনেছি ছ্যাখ্!

তারপর চকোলেটের টুকরোটা মনার মুখে দিয়ে বললেঃ চকোলেট্।

মনার কিন্তু চকোলেটে বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধুকে খুসী করবার জন্য সে চকোলেটের টুকরো মুখে রাখল। বুবু বললেঃ কেমন ভাল না?

ইতিমধ্যে টবু একমুঠো কচিঘাস নিয়ে ফিরতেই, মনা আনন্দে টবুর দিকে মুখ বাড়াল। মুখ থেকে তার চকোলেট্ পড়ে গেল। টবুর হাত থেকে মনা ঘাসগুলো প্রায় কেড়েই নিলে।

বুবু নিরাশ হয়ে বললেঃ ফেলে দিলে ত!...যেমন তোমার বুদ্ধি হতভাগা! চকোলেট্ মুখে দিয়ে কারো ঘাস খেতে ইচ্ছে করে?

টবু বললেঃ হাজার হোক গোরু ত!

বুবু রেগে বললেঃ মনাকে গাল দিও না বলছি!

টবু বললেঃ আমার মনাকে আমি গোরু বলব, তোর কি?

বুবু বললেঃ মনা আমার।

দু'হাতে মনার গলা জড়িয়ে ধরে দখলদারী নিয়ে বুবু বললেঃ আর কখনো তুমি ওর কাছে এস না।

টবু মনাকে ধরতে যাচ্ছিল। বুবু তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। টবু কেঁদে উঠল ঃ ওঁো-ওঁো-ওঁো— বুবু মারে!

রান্নাঘর থেকে মা চেঁচিয়ে উঠল ঃ এই—হচ্ছে কি, হচ্ছে কি শুনি!

বুবু মনাকে ছেড়ে দিয়ে তফাতে এসে দাঁড়াল। মা দরজায়

দাঁড়িয়ে বললেঃ বাড়ী আসতে না আসতেই ঝগড়া! টবু-বুবু, তেল মেখে চান করতে যাও।

বাবলু শ্লেট-পেনসিল বই-খাতা নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মা বললেঃ ভাত খেয়ে যাবি নি, বাবলু?

বাবলু উত্তরে মার মুখে তাকাল। ম্লান নিষ্প্রভ দৃষ্টি—যেন সত্যিই ও আজ চুরির দায়ে ধরা পড়েছে! গাঁয়ের লোকেরা ওর জীবনীশক্তি কেড়ে নিয়েছে। মার চোখে জল এল। মুখ ফিরিয়ে অশ্রুগোপন করে বললেঃ কেন মনমরা হয়ে আছিস্ বাবলু! সত্যিই ত তোর কোন দোষ নেই।

বাবলু উত্তর দিল না।

রাখাল বারান্দায় বসে তেল মাখছিল। ডাকলঃ বাবলু!

বাবলু ফিরে এল।

রাখাল বললেঃ আজ আর পাঠশালায় যেয়ে কাজ নেই।

বাবলু একমুহূর্ত্ত ইতস্তত করে ঘরে ঢুকল বই-খাতা তুলে রাখতে।

সুরথ, সুরুচি ও পরেশবাবু

অনেককাল পরে সুরথ গ্রামে ফিরে এসেছে। এখানকার এককালীন জমিদার রায়েদের একমাত্র বংশধর সুরথ। খুব ছোটবেলা সুরথ মাকে হারায়। তাই মামাবাড়ীতেই সে মানুষ হয়। মামারা দেশের পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় ব্যবসা সুরু করেছিলেন অনেককাল। আধুনিক শিক্ষার যে-সব সুযোগ-সুবিধে কলকাতার ছেলেমেয়েরা পায়, গাঁয়ের ছেলেরা পায় না। গাঁয়ে ত নয়ই, পাড়াগাঁয়ের সহরেও সে সব সুবিধে নেই। তাই মামারা যখন সুরথকে নিজেদের কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাতে চাইলেন, রায়মশাই ছেলেকে পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। কলকাতায় থাকলে ছেলের চোখ-মুখ ফুটবে—তুনিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে তার মন।

সেকেলে জমিদার রায়মশাই, সুরথকে একেলে শিক্ষা দিতেই চেয়েছিলেন। জমিদারীতে যে ভাঙ্গন ধরেছিল, তার শেষ যে কোথায় রায়মশাই তা জানতেন। ছেলেকে তিনি কিছুই দিয়ে যেতে পারবেন না—একথা তিনি ভাল করেই জানতেন। তাই তাঁর মনে-প্রাণে আকাঙ্ক্ষা ছিল, সুরথ স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। জমিদারের দিন গত হয়েছে—জমিদারীর উপর নির্ভর করলে, সুরথকে মনস্তাপ পেতে হবে।

নতুন পাঠশালা

তাই ছ'মাস গ্রামের পাঠশালায় পড়িয়ে রায়মশাই স্নুরথকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। তারপর থেকে পূজোর ছুটীতে একবার করে স্নুরথ প্রতিবছর বাড়ী আসত। শেষবার এসেছিল রায়মশাইর মৃত্যুশয্যায়। তখন স্নুরথ কলেজে পড়ে। রায়মশাইর আপশোষ মৃত্যুকালে স্নুরথকে স্বাবলম্বী দেখে যেতে পারেন নি। তবু তাঁর ভরসা ছিল, স্নুরথ একদিন মানুষ হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আজ দশবছর পরে স্নুরথ গ্রামে ফিরে এল। দশবছরে স্নুরথ শুধু পরীক্ষা পাশ-ই করে নি, স্বদেশী করে জেল খেটেছে—উড়নচণ্ডী হয়ে সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছে। শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে বনিয়াদী শিক্ষা ও গ্রাম সংস্কার নিয়ে ওয়ার্দ্ধায় কনফারেন্‌স করেছে।

নিজের গ্রাম! যার প্রতিটা গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়—যার প্রতিটা ঘর-বাড়ী,—সাদা স্নুতোর মত আঁকাবাঁকা বন-বীথিকার মাঝখান দিয়ে দূর-দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া পায়ে চলার পথ! টুকরো গানের মত, আধখানা হারিয়ে যাওয়া শৈশবের মধুর স্মৃতির সাথে সব কিছু জড়িয়ে আছে। নিজের গ্রামকে কেউ ভুলে না।

বাড়ী ফিরে স্নুরথ দেখল, ঘরগুলো সব পড়ে গেছে। দশবছরের ঝড়বৃষ্টি ঘরগুলোর কোন চিহ্নই আর রাখে নি। ছন-বাঁশ-কাঠ যা পড়েছিল, অনেককাল পাড়াপড়শীরা কুড়িয়ে নিয়ে উনুনে দিয়েছে। শূন্য ভিটেটা খাঁ-খাঁ করে। শুধু তিনপুরুষের ভাঙ্গা দালানটি আজো পাঁজর বার করে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়াল ও ছাদে চূণ-স্নুরকীর গাঁথুনিতে কয়েকটি বটগাছ গজিয়ে ক'বছরে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বারান্দায়

আর ঘরে শত শত চামচিকা ও বাদুরের বাসা । অন্ধকার ঘরের কোণে দু'একটা সাপও যে শুয়ে নেই, হলফ করে বলা যায় না। দিন-দুপুরেও ঘরের ভেতর ঢুকতে বুক কেঁপে উঠে ভয়ে।

সুরথকে দেখে গ্রামের চৌকিদার তারণ সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছিল। বললেঃ এ ভাঙ্গা দালানে আপনার থাকা চলবে না সুরথবাবু! আমি নিজের চোখে দালানের ভেতর সাপ ঢুকতে দেখেছি।

সুরথ হেসে বললেঃ জানিস্ ত, আমি অহিংসাবাদী। হিংসা না করলে, সাপও অনিষ্ট করে না শুনেছি। এবার পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

তারণ বললেঃ কি যে বলেন! হিংসা-অহিংসার কথা সাপ কি বোঝে? সাপের প্রকৃতিই হচ্ছে ছোবল মারা। আপনি অহিংস-কি-হিংস সে একবার খোঁজও নেবে না।

ঃ নেবে রে নেবে।···সুরথ গায়ের জামাটা খুলে, দেয়ালের জং-ধরা হুকে ঝুলিয়ে রেখে বললেঃ তুই যা ত, বলাইকাকার কাছ থেকে দরজার চাবিটা নিয়ে আয়।

তারণ চাবি নিয়ে এসে দরজার তালা ত খুললে, কিন্তু দরজা কিছুতেই খুলতে চায় না। বহুদিন বন্ধ থাকায় কপাটের লোহার কব্জীতে জং ধরে গেছে। দরজা খুলতে না খুলতেই চামচিকার দল ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগল। মেঝের এককোণে উই-ঢিবি থেকে একটা ছুটো করে উই উপরে উঠছিল। সহসা তারণ চেঁচিয়ে উঠল ঃ সাপ সাপ!

উই-ঢিবির পাশেই মেঝের উপর বেড়ি পাকিয়ে সাপটি শুয়েছিল। গোলমাল শুনে সে ফণা তুলে তাকাল।

তারণ চেঁচিয়ে উঠল ঃ বেরিয়ে আসুন সুরথবাবু, আমি লাঠি নিয়ে আসছি।

সুরথ তফাতে দাঁড়িয়ে তিনবার হাততালি দিতেই সাপটি উঠে দেয়াল ঘেসে উপরের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারণ বললে ঃ মেরে ফেলাই উচিত ছিল। রাত্তিরে আবার নির্ঘাত ফিরে আসবে।

সুরথ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে ঃ তাই ত!

তারণ বললে ঃ সুরথবাবু, কিছু মনে না করেন ত বলি। যে ক'দিন গাঁয়ে আছেন, আমার বাড়ীতেই থাকুন। আমার বাইরের ঘর পাকা করিয়েছি, আপনি বোধ হয় জানেন না। আপনার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না।

তারণ গ্রামের চৌকিদার। জমি-জমাও বেশ কিছু আছে। গাঁয়ের চাষীদের ভেতর একমাত্র তারণই বাড়ীতে পাকা-ঘর বানিয়েছে।

সুরথ তারণের কাঁধে হাত রেখে বললে ঃ তোর বাড়ী গিয়ে নিশ্চয়ই থাকব তারণ! কিন্তু পিতৃ-পুরুষের ভিটেয় দিনকয়েক আমাকে থাকতে দে।

তারণ বললে ঃ তা'হলে আপনি বারান্দায়ই শোন। ঘরের চেয়ে বারান্দায় বিপদ অনেক কম।

কথাটা সুরথেরও পছন্দ হল। বললে ঃ সেই ভাল তারণ! দু'জনে ধরাধরি করে তক্তপোষ বার করে বারান্দায় বিছানা পাতল।

নতুন পাঠশালা

একটু বাদেই লাঠি ভর দিয়ে বলাইকাকা এল। বললে ঃ অবশেষে আমাদের মনে পড়ল, সুরথ !···আমার ওখানে উঠলেই পারতে।

সুরথ ত বলাইকাকাকে চিনতেই পারে না। দশবছর আগে সুরথ বলাইকাকাকে দেখেছে, বলিষ্ঠ যোয়ান।

বলাইকাকা বললে ঃ অসুখ-বিসুখ দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ! একটা মানুষ কত আর লড়াই করতে পারে দুর্ভাগ্যের সাথে !···সে যাহোক, তুমি যে ক'দিন আছ, আমাদের ওখানেই খাবে। তোমাকে সাথে করে নিয়ে যেতে তোমার কাকীমা বলে দিয়েছে।

সুরথ বললে ঃ নিশ্চয়ই যাব। কাকীমা কেমন আছেন ?

বলাইকাকা বললে ঃ থাকাথাকি আর কি ! দিন গুণছি, আর মনে মনে ভগবানকে বলছি, হে ভগবান আর কেন। এবার কাছে ডেকে নাও।

বলাইকাকার বৈরাগ্যের কারণ যে আর্থিক কষ্ট, একথা বুঝতে সুরথের কষ্ট হয় না।

রায়বংশের একমাত্র ছেলে সুরথ দশবছর পরে বাড়ী এসেছে, সংবাদটা সারাগ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। গাঁয়ের চাষীরা, রায়মশাইর নাম যারা তখনো ভুলে নি, এল সুরথের সাথে দেখা করতে। ভালমন্দ সুখ-দুঃখের দুটো কথা হল। সবাই আশা করেছিল, সুরথ নিশ্চয়ই খুব বড় চাকরী করছে আজকাল। সুরথ কিছুই করে না জেনে চাষীরা নিরাশ হল। চেষ্টাচরিত্র করলে সুরথ যে 'জজ-ম্যাজিষ্টর' হতে পারত —নেহাৎ একটা সাবডিপুটীও,—সে-সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই।

খবরটা শুনে পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ছুটে এল। সেই কবে

নতুন পাঠশালা

কতযুগ আগে সুরথ ক'মাস গাঁয়ের পাঠশালায় পড়েছিল, পণ্ডিত এখনো ছোট সুরথের মুখখানি ভুলতে পারে নি। সুরথ এসেছে শুনে পাঠশালা যাবার পথেই পণ্ডিত ৰারেক ঢুঁ মারলে। সুরথ খাটের উপর চুপ করে শুয়েছিল। পণ্ডিতকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাত তুলে নমস্কার করে বললেঃ বসুন পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিত দড়ি-বাঁধা চশমাটা কপালে তুলে বললেঃ তুমি এসেছ খবরটা শুনে থাকতে পারলাম না সুরথ, ছুটে এলাম। তোমার গিয়ে কতদিন তোমাকে দেখি নি।

পণ্ডিত খাটের পাশে চেয়ারখানিতে বসে, হাতের হুঁকোয় গুটি কয়েক টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল।

সুরথ বললেঃ কেমন আছেন পণ্ডিত মশাই ?

পণ্ডিত বললেঃ সে আর জিজ্ঞেস করা কেন সুরথ! আমরা গাঁয়ের লোক আছি কি মরেছি, একবার ভুলেও ত খবর নাও না তোমরা। আগের দিনে বড়লোকেরা গ্রাম ছেড়ে যেতেন না, তাই গরীবদের আশ্রয় ছিল—ভরসা ছিল। কিন্তু আজকাল ? একটুখানি উপযুক্ত হলেই লোকে গ্রাম ছেড়ে পালায়।

সুরথ উত্তর দিল না।

পণ্ডিত বললেঃ এই ধর না তোমার কথা-ই। তোমার কাছ থেকে আমরা কত আশা করেছিলাম। আর রায়মশাইর ছেলের কাছ থেকে গাঁয়ের গরীব-দুঃখী চাষী-মজুরদের কিছু আশা করা কি অন্যায় ? তুমিই বল!

নতুন পাঠশালা

সুরথ পণ্ডিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পণ্ডিত বলতে লাগল ঃ তুমি গাঁয়ে থাকলে আমাদের কত ভরসা, বল। দশজনের কাছে বুক ফুলিয়ে আমরা তোমার কথা বলতে পারি।

সুরথ আস্তে আস্তে বললে ঃ আপনাদের মাঝখানে থাকবার জন্যই এবার আমি গ্রামে ফিরে এসেছি পণ্ডিতমশাই!

খুসীর স্বরে পণ্ডিত বললে ঃ সত্যি? পরক্ষণেই অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বললে ঃ সে কি আর আমি বিশ্বাস করি! বিয়ে থা' ঘরসংসার করলে না—বিষয়-সম্পত্তি সব পাঁচভূতে লুটে খেল। এমন পাগল ভোলানাথ ছেলে কি আর দুনিয়ায় আছে!

পণ্ডিতের আজো মনে পড়ে···শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন এক দুপুরে বুড়ো জমিদার জুড়ী গাড়ী করে সুরথকে সাথে নিয়ে এলেন পাঠশালায়। ছোট্ট সুরথ পাঠশালায় ভর্ত্তি হল। যাবার সময় জমিদার পণ্ডিতের হাতে একখানি নোট গুজে দিলেন ঃ পণ্ডিত, তুমি একখানি ভাল পশমী শাল কিনে পরো।···আহা, রায়মশাইর মত এমন সদাশয় ব্যক্তি আর হয় না। দেশে এমন কেউ ছিল না, যে তাঁর মুক্তহস্তের অপার করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারপর অবশ্যি ছ'মাস যেতে না যেতেই সুরথ পাঠশালা ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে, কলকাতায় মামাবাড়ী চলে গেল।

সুরথ স্মিতমুখে বললে ঃ গ্রাম ছেড়ে আর আমি যাচ্ছিনে পণ্ডিত-মশাই!

পণ্ডিত বললে : বেশ ত, থাক তুমি আমাদের মাঝখানে। তোমাকে আমরা জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান করব। তুমি যদি জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান হও, ছ'দিনেই আমাদের গ্রাম উন্নত হয়ে উঠবে। সরকারী পয়সায় গ্রামে হাসপাতাল, ইংরেজী স্কুল—এমন কি রাস্তাঘাট পর্য্যন্ত তৈরী হবে। কত নাম-যশ হবে তোমার!

সুরথ হেসে উঠল।

পণ্ডিত খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললে : তুমি বোধ হয় জান না, গ্রামের লোকের অবস্থা দিনকে দিন খারাপের দিকেই চলেছে। দেশে পয়সা নেই।

সুরথ বললে : পয়সা ত নেই-ই, তায় আবার গাঁয়ের লোক মেহনত করতে ভুলে গেছে। পথে আসতে আসতে দেখলাম, অযত্নে অবহেলায় রাস্তাঘাট সব ভেঙ্গে পড়েছে। রাস্তার ছ'পাশে যেখানে-সেখানে ময়লা। সারা গ্রামটাই জঙ্গলে ভর্ত্তি। সত্যিকার গ্রাম সংস্কার করতে হলে, গ্রামের ছেলেমেয়েদের আদর্শ গ্রামবাসী করে গড়ে তুলতে হবে।

পণ্ডিত সুরথের কথা বুঝতে না পেরে বললে : আদর্শ গ্রামবাসী! কিন্তু কেমন করে চাষাভূষোর ছেলেদের আদর্শবাদী তৈরী করবে?

সুরথ বললে : শিক্ষা। পাঠশালায় চিরাচরিত বর্ণ-পরিচয়ের শিক্ষার কথা আমি বলছিনে পণ্ডিতমশাই! শিক্ষার নতুন বনিয়াদ গ্রামে নব-জীবনের সাড়া আনবে। নতুন শিক্ষা-মন্দিরে বর্ণ-পরিচয়ের সাথে সাথে ছেলেরা শিখবে নানা হাতের কাজ—যাতে নিজেদের জীবিকার জন্য, নিত্যকার প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য তাদের পরমুখাপেক্ষী

হতে না হয়। তারা শিখবে কেমন করে সমষ্টিগত জীবন যাপন করতে হয়, শিখবে কেমন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। গান্ধীজির আদর্শে একটি বুনিয়াদী শিক্ষা-মন্দির চালু করবার জন্য আমি গ্রামে ফিরে এসেছি পণ্ডিতমশাই!

সুরথের কথায় পণ্ডিত মোটেও আশ্বস্ত হল না, বরং তার মনে একটা সন্দেহ জাগল। তবে কি সুরথ পণ্ডিতের পাঠশালা ভেঙ্গে দিতে গ্রামে ফিরে এল!

ঃ যাই, পাঠশালার বেলা হল।...পণ্ডিত নীচে নামতে নামতে বললে।

সুরথ বললে ঃ একদিন আসব আপনার পাঠশালায়, পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত বললে ঃ আসবে বৈ কি! তোমরা চেষ্টা-চরিত্র করলে, তবে ত পাঠশালাটি উন্নত হবে। বুড়ো হয়ে গেছি, ছেলে ঠেঙ্গাতে আর ভাল লাগে না। আর আজকালকার ছেলেরাও যেমন! তোমরাও আমাদের কাছে পড়েছ, আর এখনকার ছেলেরাও পড়ছে; কিন্তু দুষ্টুমিতে এরা তোমাদের কিনে বেচতে পারে। আচ্ছা সুরথ, আজ আসি।

পণ্ডিত পাঠশালার পথ ধরল।

পরেশবাবু সুরুচিকে নিয়ে ক'দিন আগে গ্রামে এসেছেন শুনে সুরথের উৎসাহের সীমা রইল না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অভিযানে সুরুচি ও পরেশবাবু যে তাকে সাহায্য করবে, সুরথ একথা ভাল করেই

জানে। শৈশবে—সে কতকাল আগে, সুরুচি ও সুরথ ছিল খেলার সাথী। তারপর সুরুচি পরেশবাবুর সাথে দূর-বিদেশে চলে গেল, আর সুরথ গেল মামাবাড়ীতে।

খবরটা বলাই কাকাই দিলেন, সুরুচি নাকি অনেকগুলো পাশ দিয়েছে। অথচ পরেশবাবুর তরফ থেকে ওর বিয়ে দেবার কোন আগ্রহই নেই। এমন ভাবে সুরুচিকে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করেন, যেন সুরুচি ওর মেয়ে নয়—ছেলে! এমন অসামাজিক কাণ্ড কোথাও নাকি দেখা যায় নি।

সুরথ জানে এ নিয়ে বলাই কাকার সাথে তর্ক করা বৃথা। তর্ক করে মানুষের মনের সংস্কার দূর করা যায় না। বলাই কাকা আজীবন মেয়েদের যে চোখে দেখে এসেছেন, সুরুচির বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন! তাই সুরথ চুপ করে রইল।

বিকালবেলা রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই সে গেল পরেশবাবুর বাড়ী। পরেশবাবুর সংসারে আপন বলতে ঐ একটিমাত্র মেয়ে। স্ত্রী অনেক আগেই মারা যান। বছরে একবার করে পরেশবাবু গ্রামে এসে মাস-দুয়েক কাটিয়ে যান। এবার সুরুচিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

চণ্ডীমণ্ডপের সামনে খোলা প্রাঙ্গণে আরামকেদারায় শুয়ে সুরুচি বই পড়ছিল। রাস্তা থেকে সুরুচিকে দেখতে পেয়ে সুরথ থমকে দাঁড়াল। দশবছর আগেকার ফ্রকপরা ছোট্ট সুরুচিকে তার মনে আছে। এই কি সেই সুরুচি? নাম ধরে ডাকতে সুরথের সঙ্কোচ বোধ হয়।

নতুন পাঠশালা

বই থেকে মাথা তুলে সামনে সুরথকে দেখতে পেয়ে সুরুচি উঠে দাঁড়াল উত্তেজনায়। বিস্মিতস্বরে বললে : সুরথদা!

সুরথ হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললে : সুরুচি! আমি ত তোমায় চিনতেই পারছিলাম না। কত বড় হয়ে গেছ তুমি!

সুরুচি হেসে বললে : দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

সুরথ সুরুচির পরিত্যক্ত চেয়ারে বসল।

সুরুচি মণ্ডপ থেকে একখানি চেয়ার নীচে নামিয়ে নিজে বসে বললে : কবে এলে?

সুরথ বললে : আজই এসেছি সুরুচি, তোমরা এসেছ শুনে ছুটে এলাম দেখা করতে।

সুরুচি হেসে বললে : অত মায়া! কই দশবছর একখানি চিঠি লিখেও ত আমাদের খবর নাও নি! বলতে পার অবশ্যি,—তোমরাও ত আমার খবর নাও নি। কিন্তু ঠিকানা কোথায় পাই? বস, চা আনছি তোমার জন্য।

পথের পাশে আমবাগানে সন্ধ্যা নামছে। সুরথ অনেক কথাই ভাবছিল। পরেশবাবু, সুরুচি···গ্রাম, বুনিয়াদী শিক্ষা-মন্দির। জীবন বিকাশের জন্যই শিক্ষা। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির মারাত্মক দোষ, জীবনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। পুঁথি-পড়া বিদ্যা ব্যবহারিক জীবনে প্রায়ই কাজে লাগে না, যদি না বর্ণ-পরিচয়ের সাথে সাথে শিশুদের চরিত্র গঠনের উপর যথেষ্ট মনোযোগ রাখা হয়। সুরথ এমন অনেক লোক দেখেছে নাম সই করতে তাদের কলম ভেঙ্গে যায়—কিন্তু আলাপে

আচরণে, কর্ম্ম-কুশলতায় যারা সত্যিই দক্ষ। প্রচলিত অর্থে 'অশিক্ষিত' বললে, তাদের উপর অন্যায় করা হয়।

সুরুচি চা নিয়ে এল। চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে সুরথ বললেঃ মনে পড়ে তোমার সুরুচি, কতবছর আগে তোমার হাতের তৈরী চা খেয়েছিলাম?

সুরুচি নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বললেঃ মনে ত অনেক কিছুই পড়ে সুরথদা!

সুরথ হেসে বললেঃ যথা…

সুরুচি একটু ভেবে বললেঃ যেমন তুমি বলেছিলে,—বড় হয়ে গাঁয়ে ইস্কুল করবে—গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলবে।

সুরথ কাপ নামিয়ে রেখে বললেঃ যদি বলি সে-সঙ্কল্পটা আজো রয়েছে, বিশ্বাস করবে?

সুরুচি হেসে বললেঃ সঙ্কল্প না—ইচ্ছা বল। থাকগে।

সুরুচি অন্য কথা পেড়ে বললেঃ তুমি আবার রাতারাতি পালাচ্ছ না ত?

সুরথ মাথা নেড়ে বললেঃ উঁহুঁ। গাঁ ছেড়ে আর একপাও নড়ছি নে এবার। সুরুচি, আমি গাঁয়ে এসেছি একটা বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Basic School) সুরু করবার জন্য। এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতি ভারতের গ্রামে গ্রামে নবজীবনের সাড়া আনবে, এই আমার বিশ্বাস।

উত্তেজনায়, খুসীতে সুরুচি উঠে দাঁড়াল। বললেঃ সত্যি বলছ সুরথদা, তুমি গ্রামে থাকবে?

সুরথ মাথা নাড়লে। সুরুচি বললে: কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয় করা কি সুখের কথা!

সুরথ উঠে দাঁড়িয়ে, বারেক পায়চারী করে বললে: আমি জানি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে বাধা অনেক। প্রথমত বিদেশী সরকার—যারা আমাদের যে-কোন প্রচেষ্টাকেই সন্দেহের চোখে দেখে, মনে করবে, এ-ও বুঝি রাজত্ব উড়িয়ে দেওয়ার এক ফন্দি। দ্বিতীয়ত অজ্ঞ গ্রামবাসী। নতুন কিছুই এরা বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে কাজে আমাদের নামতেই হবে।

বাইরে অন্ধকার ঘন হয়ে নামছে। সুরুচি কাপ দুটো তুলে নিয়ে বললে: অন্ধকার হল, ভেতরে এসে বস।

সুরথ ইতস্তত করে বললে: তুমি আমার সাথে থাকবে ত সুরুচি?

সুরুচি বললে: অন্তত কিছুদিন ত আমরা আছিই সুরথদা!

সুরথ একটু নিরাশ হল। কিন্তু মুখে বললে: তোমরা থাকতে থাকতেই ইস্কুল নিশ্চয়ই চালু হয়ে যাবে।

সুরুচি বারান্দায় উঠতে উঠতে বললে: ভেতরে এস।

সুরথ বললে: আজ আসি সুরুচি!

: বাবার সাথে দেখা করে যাবে না?…সুরুচি শুধাল।

সুরথ বললে: কিন্তু পরেশকাকা কখন আসবেন তার ত ঠিক নেই। কাল দেখা হবে।

সুরুচি রাস্তার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললে: এই যে বাবা এসে গেছেন।

নতুন পাঠশালা

সুরথকে পেয়ে পরেশবাবুর আনন্দের সীমা রইল না। সুরথের হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে এলেন ; বললেন ঃ তোমাকে যে আর কখনো দেখতে পাব সেই আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম সুরথ! দেখ ত, কি তোমার চেহারা হয়েছে!

সুরথ হেসে বললে ঃ কিন্তু দশবছর আগে আপনাকে যেমন দেখেছি আজো ঠিক তেমনি দেখছি। চেহারার একটুও পরিবর্ত্তন হয় নি আপনার পরেশকাকা।

পরেশবাবু গায়ের জামাটা খুলে বললেন ঃ দাঁড়িয়ে কেন, বস।

সুরথ মেঝের ঢালাই তাকিয়ায় বসল।

পরেশবাবু বললেন ঃ তারপর উঠেছ কোথায়?

সুরথ বললে ঃ কেন? বাড়ীতে।

পরেশবাবু বললেন ঃ সেই ভাঙ্গা দালানটায় ত! ওটা কি আর বাসযোগ্য আছে? না না সুরথ, ওখানে থাকা তোমার চলবে না ; যে ক'দিন আমরা আছি, তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকতেই হবে।

সুরুচি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। বললে ঃ খেয়ে যাবে সুরথদা!

পরেশবাবু বললেন ঃ খেয়ে যাবে মানে? সুরথ এখানে থাকবে।

সুরথ আস্তে আস্তে বললে ঃ পরেশকাকা, ভাঙ্গা দালানে থাকতে আমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। এ নিয়ে আপনি ভাববেন না।

পরেশবাবু হেসে বললেন ঃ কেউ কারো জন্য ভাবে না সুরথ! বেশ ত, তুমি ওখানে থাকতে চাও থেকো। কিন্তু এখানে তোমাকে খেতেই হবে দু'বেলা।

সুরথ হেসে বললেঃ তা'লে আমাকে রোজই খাওয়াতে হবে। আমি গ্রামে বেড়াতে আসি নি পরেশকাকা—থাকতে এসেছি।

পরেশবাবু বললেনঃ এর চেয়ে খুসীর কথা আর কি হতে পারে? তুমি যদি থাক আমিও চিরস্থায়ী ভাবে গ্রামে এসে বসবাস সুরু করব। কি বলছিলাম, হ্যাঁ, তোমার খবর সব কিছুই নেওয়া হয় নি। গেল দশবছর কেমন করে কাটালে, সব গল্প শুনব।

সুরুচি বললেঃ সুরথদা গাঁয়ে Basic school করছেন, বাবা!

পরেশবাবু খুসী হয়ে বললেনঃ সত্যি নাকি সুরথ?

সুরথ বললেঃ বুনিয়াদী শিক্ষা-মন্দির করা যদি আদৌ সম্ভব হয় এখানে, ত আপনার ও সুরুচির সাহায্যে পরেশকাকা।

পরেশবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে অন্যমনস্কভাবে তানপুরাটা হাতে নিয়ে বললেনঃ সেজন্য তুমি ভেবো না সুরথ!···হ্যাঁ, তুমি এসেছ, এবারকার গানের আসরটা জমবে ভাল।

পরেশবাবু তানপুরাতে সুর দিতে লাগলেন। সুরুচি গেল রান্নাঘরে। সুরথ চুপ করে বসে রইল।

পরেশবাবু বললেনঃ জীবনে কত গানই গাইলাম সুরথ, কিন্তু সুরগুলো সব হারিয়ে গেল।

সাব-ডেপুটির ঘোড়া

সাব-ডেপুটির ঘোড়া রোজ রাত্রে মাঠে নেমে ধান খেয়ে যায়। কোন্ চাষীর জমিতে কোন্ রাত্রে যে রাহাজানি হবে, কেউ বলতে পারে না। গাঁয়ে উত্তেজনার সীমা নেই—কিন্তু সাব-ডেপুটির বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস চাষীরা কোথায় পায়!

মাঠের কচি ধানগাছ—একবার ঘোড়া খেয়ে গেলে এ-ধানের আর তেমন বাড় হবে না। অত মেহনতের ফল শেষকালে বিফলে যাবে! তাই শেষ পর্য্যন্ত চাষীরাও আর ধৈর্য্য রাখতে পারল না। প্রকাশ্যভাবে সাব-ডেপুটির আচরণের তীব্র নিন্দা করতে লাগল।

ঃ অত্যাচার, রীতিমত অত্যাচার!…ভরত বললে।

রহিম বললেঃ আমরা মুখ বুজে এ অত্যাচার সহ্য করব না আর।

ধানক্ষেতের পাশে রাস্তায় বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে একদল চাষী হল্লা করছিল। চৌকিদার তারণ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। চাষীরা তারণের দিকে ভ্রূক্ষেপই করল না!

গোবিন বললেঃ ভাই সব, এর একটা বিহিত করতেই হবে। আমাদের সারা বছরের মেহনত এমন করে ঘোড়ার পেটে যাবে, আর আমরা চুপ করে বসে থাকব, সে হতে পারে না।

তারণ এগিয়ে এসে বললেঃ মঠের ধান ঘোড়া খেয়েছে কি শূয়র খেয়েছে ভাল করে জেনে নাও আগে।

রহিম বললে: ঘোড়ার খুরের দাগ আর আমরা জানিনে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাও?

গোবিন বললে: হলেনই বা ডেপুটি! তা বলে রাত্তিরবেলা আধপাকা ধানের ক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দেবেন?

শরাফত এতক্ষণ নিঃশব্দে বিড়ি টানছিল। দাঁড়ি নেড়ে বললে এবার: অমন ঢের ঢের ডেপুটি দেখেছি। কত ডেপুটি এল আর কত গেল,—হ্যাঁ!

তারণ চোখ মিট-মিট করে বললে: শরাফত মিঞা, এসব কথা ডেপুটি সাহেবের কানে গেলে মুস্কিল হয়ে যাবে!

সুরথ এগিয়ে এসে বললে: যাও যাও, মুস্কিলের ভয় আর দেখিও না! গোটা মাঠখানা সাবাড় করিয়েছ—এক হিসাবে, সর্ব্বনাশের বাকী আর কি আছে!

রহিম তারণের সামনে এসে চেঁচিয়ে বললে: বলে দিও তোমার সাহেবকে,—ঘোড়া আটকে রাখুন, তা না হলে ঘোড়ার আশা ছেড়ে দিন্।

তারণ বললে: ভয় দেখাচ্ছ! ডেপুটি মারবে?...আচ্ছা, আমি বলছি গিয়ে সব।

তারণ চলে গেলে চাষীরা এক মুহূর্ত্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উত্তেজনার মুখে কথাগুলো চৌকিদারকে না বললেই হত।

ভরত বললে: তিলকে তাল করে চৌকিদার ডেপুটি-সাহেবের কাছে সব লাগাবে।

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললেঃ ডেপুটি আমাদের ভিটে থেকে তুলে দেবেন! হ্যাঁ।

ভরত বললেঃ এস সবাই মিলে সাব-ডেপুটির হাতে-পায়ে ধরিগে। বুঝিয়ে বললে ঘোড়া নিশ্চয়ই উনি আটকাবেন।

রহিম বললেঃ হাতে-পায়ে ধরতে হয় তোমরা ধরগে, আমি পারব না।

ভরত বললেঃ তুমি বোঝ না রহিম, ওরা বড়লোক। ওদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করে টেক্কা দিয়ে আমরা পারব কেন?

গোবিন বললেঃ হতে-পায়ে ধরলেই কি ঘোড়া আটকাবে?

শরাফত বললেঃ না, অত আশা করো না।

ভরত বললেঃ মাঠ ত শুধু আমাদেরই নয়। এস, গাঁয়ের দশ-জনের সাথে পরামর্শ করিগে।

ঃ সেই ভাল।···বলে চাষীরা তখন গাঁয়ের দিকে চলল পঞ্চায়েত করতে। শুধু রহিম গাছের তলায় বসে নিস্ফল আক্রোশে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

রাস্তা দিয়ে বাবলু আপনমনে চলছিল। মুখখানি ম্লান, ছুটা-ছুটি, লাফালাফি দুষ্টুমীতে আর তার উৎসাহ নেই যেন। সেদিন ভোরের স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মত বাবলুর বুকে চেপে আছে। যখনই মনে পড়ে, চোখ থেকে হু-হু করে অশ্রু গড়ায়। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বাবলু জামার আস্তিনে চোখের জল মুছে। সেদিন ভোরের অপমানের

প্রতিশোধ নেবার জন্য বাবলু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। দিনের পর দিন গ্রামের পথে বাবলু একা একা বেড়ায়।

রাখাল বিরক্ত হয়ে ভাবে, ছেলেটার হল কি?

বাবলুর মা বলেঃ সেদিনকার ঘটনার পর থেকেই ও কেমন মনমরা হয়ে পড়েছে।

একদিন পরেশবাবু এলেন। রাখাল তাঁকে অভ্যর্থনা করে কাঠের উঁচু আসনখানি বসতে দিল। পরেশবাবু বসে বললেনঃ কেমন আছ রাখাল? তাঁতের কাপড়ের বেশ কাটতি আছে ত বাজারে?

রাখাল বললেঃ মিলের কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড়ের দাম বেশী পড়ে যায় বাবু! তাই আজকাল কাপড় বুনি না, শুধু গামছাই তৈরী করছি।

ঃ গামছা?···পরেশবাবু অন্যমনস্ক স্বরে বললেনঃ তা ভাল।

রাখাল বললেঃ কিন্তু গামছার চাহিদাও দিন দিন পড়ে আসছে বাবু! গাঁয়ে বোধ হয় আর থাকা চলবে না।

পরেশবাবু বললেনঃ সে কি কথা! না না, আমরা তোমাকে back করব। হ্যাঁ, বাবলু কোথায়—বাবলুকে দেখছি নে যে?

রাখাল বিরক্তস্বরে বললেঃ কোন চুলোয় গেছে কে জানে! সংসারের কাজে একটুও সাহায্য করে না। ছেলেটা আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে।

পরেশবাবু বললেনঃ না না, অমন করে ছোট ছেলের উপর অভিযোগ করতে নেই রাখাল!

এমনি সময় বাবলু উঠানে পা দিল। দেখতে পেয়ে পরেশবাবু ডাকলেন ঃ ও বাবলু শোন, তোমার জন্যই এতক্ষণ বসে আছি।

বাবলু পরেশবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

রাখাল খিঁচিয়ে উঠল ঃ হতভাগা প্রণাম কর।

পরেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ না না...

তারপর বাবলুর কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ গানের রিহার্সেল আজ থেকে স্নুরু হবে বাবলু! তুমি অ সছ ত ?

বাবলু মাথা নীচু করে বললে ঃ না।

রাখাল লাফিয়ে উঠল ঃ শুনলেন ত বোকা ছেলের কথা! আপনি নিজে ডাকতে এসেছেন আর কিনা 'না' বলে দিল!

পরেশবাবু একটু চুপ থেকে বললেন ঃ কি হয়েছে বল ত বাবলু ?

বাবলু উত্তর দিল না। রাখালই সেদিনকার সব কথা বলে, বললে ঃ সেই থেকে ছেলেটা কেমন বিগড়ে আছে। আরে বাপু, তুই ত আর সত্যিই চুরি করিস নি, তবে তোর লজ্জাটা কিসের ?

পরেশবাবু বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন ঃ ওসব কথা ভুলে যাও বাবলু। লক্ষ্মী ছেলে। বিকেল থেকে গানের রিহার্সেলে এস।

কিন্তু বাবলু সত্যিই রিহার্সেলে গেল না। যে গাঁয়ের লোক অযথা তাকে অপমান করেছে, তাদের জীবনে আর গান শোনাবে না বাবলু। তবু বাবলুর চোখে জল আসে। সারাবছর ধরে পরেশবাবুর গানের আসরের স্বপ্ন সে দেখেছে। মুগ্ধ দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে বাবলু গাইবে, গানের শেষে সবাই অনেকক্ষণ ধরে হাততালি দেবে।

নতুন পাঠশালা

ঘুরে ঘুরে বাবলু বটগাছের নীচে এসে দাঁড়াল।

রহিম তখনো বসেছিল। বাবলুকে দেখে বললেঃ এই, তুই এখানে কি করছিস্ ?

বাবলু উত্তর দিল না। রহিম বললেঃ সাব-ডেপুটির ঘোড়া তোদের জমির আদ্ধেক ধান সাবাড় করেছে, জানিস্ ?

বাবলু বললেঃ ঘোড়া আমি আটকাব।

রহিম উঠে দাঁড়ালঃ তুই আটকাবি? কথায় বলে, 'হাতী-ঘোড়া গেল তল, আর মশা বলে কত জল!' ডেপুটির ভয়ে গাঁয়ের সবাই পিছিয়ে গেল আর তুই আটকাবি ঘোড়া! যা যা, বাড়ী যা।···বলতে বলতে রহিম নিজেই বাড়ীর পথ ধরল।

ভোলা বাঁশী বাজাতে বাজাতে সেদিকে আসছিল। বাবলু দাঁড়িয়ে আছে দেখে, মুখ থেকে বাঁশী নামিয়ে বললেঃ ভারী দেমাক হয়েছে —না? খেলতে আসিস্ না কেন ?

বাবলু গাছের গোড়ায় উঁচু ঢিবিটার উপর বসে পড়ে বললেঃ একটা নতুন খেলা খেলব ?

ভোলা বললেঃ কি ?

বাবলু বললেঃ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থেকে পালিয়ে আসতে পারবি ?

ভোলা বললেঃ আলবাৎ! আজ বাড়ীতে কেউ নেই।

বাবলু ভোলার কানে কানে ফিস্-ফিস্ করে খেলার কথা বলতেই ভোলা বললেঃ ওরে বাপস্! শেষকালে জানাজানি হলে ডেপুটি আমাদের জেলে পূরবে।

বাবলু বললে ঃ আমি আর তুমি ছাড়া কেউ জানবে না।

ভোলা মাথা নাড়ল, সে রাজী নয়।

বাবলু বললে ঃ ঘোড়া কামড়ে দেবে বলে তোর এত ভয়!

ভোলা রেগে বললে ঃ সেবার বারুণীমেলায় ঘোড়দৌড়ে কে প্রথম হয়েছিল,—আমি না তুই ?

বাবলু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে ঃ সে ত গেল বছরের কথা।

ভোলা চুপ করে রইল। বাবলু নরমস্বরে বললে ঃ রোজ রাত্তিরে ঘোড়া মাঠে ধান খেয়ে যায়। তাই ত বলছি, গাঁয়ের লোকেরও উপকার হবে, আমাদেরও খেলা হবে।

ভোলা উত্তর দিল না। বাবলু তখন কানে কানে কি বলতেই ভোলার মুখখানি উত্তেজনায় ও খুসীতে জ্বলে উঠল। সে তক্ষুণি রাজী হয়ে গেল। ... ...

ঘণ্টা কয়েক বাদে। ছায়াঘন গ্রামের পথের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের রূপালি আলো ঝিলমিল করছে। সামনে ছায়া দেখে সহসা মনে হয়, কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে পথে। চোর ডাকাত প্রেতিনী কত কি আছে গ্রামের পথে! কিন্তু গ্রামের দুরন্ত ছেলেদের কাছে তারা কাবু।

চারদিক নিঝুম। হাওয়া বন্ধ। গাছের পাতাও নড়ছে না। পথে একটি জনপ্রাণীও নেই। ছায়াঘন অন্ধকার পথে কি একটা নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে একটা সাদা ঘোড়া গাছ-গাছড়ার ভেতর থেকে খোলা পথে বেরিয়ে এল। সাব-ডেপুটির ঘোড়া। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সে বটগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল।

এখান দিয়েই ঘোড়াটি রোজ রাত্রে মাঠে নামে। নামবার আগে গাছের ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে দেখে নেয়, আশে-পাশে কেউ আছে কিনা?

সহসা গাছের নীচু ডাল থেকে কি একটা ভারী পদার্থ পিঠের উপর লাফিয়ে পড়তেই ঘোড়াটা চিঁ হিঁ করে ডাক ছেড়ে উল্টোদিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। ঘোড়সওয়ার বাবলু। খোলা রাস্তা পার হয়ে অন্ধকারে ঢুকতে গিয়ে ঘোড়াটি সামনে বাঁশের ঝাপ দেখে থমকে দাঁড়াল। ভোলা-ই বাঁশের ঝাপ দিয়ে রাস্তার এদিকটা বন্ধ করে দিয়েছে। বাবলু লাগাম কষতেই ঘোড়াটি আবার বটগাছের দিকে ফিরে চলল।

ঘোড়াও তার সওয়ার জানে। কচি হাতের নরম স্পর্শে ঘোড়াটা পরমুহূর্তে শান্ত হয়ে বটগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। বাবলু ও ভোলা পালা করে অনেকক্ষণ ধরে চড়ে ঘোড়াটিকে হয়রান করবার আগে নিজেরাই হয়রান হয়ে পড়ল।

চাঁদ ডুবে গেছে, কিন্তু ভোর তখনো হয় নি। আবছা অন্ধকারে ভাল করে পথ দেখা যায় না। ঘটি হাতে ঘাটের পথে যেতে যেতে কবিরাজ সহসা থমকে দাঁড়াল। সামনে নারকেলগাছের নীচে কি একটা যেন নড়া-চড়া করছে। 'খট্ খট্' শব্দ উঠল। ভয়ে কবি-রাজের বুক দুরু-দুরু করে। উপর দিকটা মানুষের মত, নীচের দিক জানোয়ারের মত, কি ওটা? এগুবে কি পেছুবে, কবিরাজ বুঝতে

পারে না। তবে কি এই সেই নারকেলগাছের ব্রহ্মদত্যি, যার কথা কবিরাজ চিরকাল শুনে এসেছে?

সহসা অন্ধকার আকাশের বুক চিরে তীব্র চীৎকার উঠল: চিঁ-হিঁ-হিঁ—হিঁ হিঁ!

আর যায় কোথায়! হাতের ঘটি ও গামছা ফেলে কবিরাজ উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটল। এক নিঃশ্বাসে ছুটে এসে ঘরে ঢুকে কবিরাজ দরজা দিলে, তারপর মেঝেয় বসে কাঁপতে লাগল। অল্পের জন্য আজ সে ব্রহ্মদত্যির হাত থেকে খুব বেঁচে গেছে। উঃ, কি ভয়ানক! হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ!

আস্তে আস্তে ভোর হল। ভোরের রোদ বাঁশের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ঘরের মেঝেয় প'ড়ে ঝিলমিল করে উঠল। কবিরাজ বসে ঝিমুচ্ছিল। সহসা দরজার কড়া নড়ে উঠতেই ধড়মড় করে উঠে বসল।

বাইরে থেকে চৌকিদার হাঁকছিল: কবিরাজ মশাই, জেগে ঘুমুচ্ছ নাকি গো!

কবিরাজ দরজা খুলে বললে: তারণ চৌকিদার যে!

তারণ বললে: কাল রাত্তিরে ঘুমাও নি বুঝি? তা অবেলায় ঘুম ভাঙ্গালাম বলে অপরাধ নিও না।

কবিরাজ আপ্যায়িত স্বরে বললে: না না, সে কি!

একটুখানি কেশে গলা সাফ করে ভোরে দেখা ব্রহ্মদত্যির কথাটা সে বলতে যাচ্ছিল। তারণ রসভঙ্গ করে বললে: ডেপুটিসাহেব তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে।

নতুন পাঠশালা

কথা নেই বার্ত্তা নেই, সকালবেলা সহসা ডেপুটিসাহেব তাকে ডেকে বসল! অসুখ-বিসুখের জন্য নিশ্চয়ই নয়। কবিরাজ জানে ডিপুটির বাংলোয় অসুখ-বিসুখ হলে, তিন মাইল দূরের সরকারী ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আসে।

কবিরাজের মুখ শুকিয়ে গেল। ঢোঁক গিলে বললেঃ আমি,—অর্থাৎ আমাকে?

তারণ বললেঃ তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হুকুম করলে।

কবিরাজ কিছু বুঝতে না পেরে বললেঃ হঠাৎ ডেপুটিসাহেবের আমাকে দরকার পড়ল কেন?

তারণ বললেঃ ওখানে গেলেই জানতে পারবে।

কবিরাজ ময়লা চাদরখানি গায়ে জড়িয়ে দুর্গানাম জপ করতে করতে তারণের পিছু পিছু পথে নামল। আজ কবিরাজের দিন অতিশয় মন্দ। প্রথমেই ব্রহ্মদত্যি, তারপর ডেপুটি। কপালে কি আছে কে জানে!

পথে যেতে যেতে কবিরাজ বললেঃ ব্যাপার কি বল্ ত তারণ!

তারণ বললেঃ কেন আর ভাঁওতা দিচ্ছ কবিরাজ মশাই!

কবিরাজ অনুনয়ের স্বরে বললেঃ সত্যি বলছি তারণ, আমি কিছু জানিনে।

তারণ বললেঃ ডেপুটিসাহেবের ঘোড়া নিজের পুকুরঘাটে সারারাত বেঁধে রাখ নি?

ঃ মিথ্যে কথা!…কবিরাজ লাফিয়ে উঠল।

তারণ বললেঃ আমি নিজের হাতে তোমার পুকুরঘাট থেকে ঘোড়াকে খুলে নিয়ে গেছি, আর তুমি বলছ মিছে কথা !

ব্রহ্মদত্যি যে সাব-ডেপুটির ঘোড়া ছাড়া আর কিছু নয়, কবিরাজের আর বুঝতে বাকী রইল না।

সাব-ডেপুটির বাংলো কাছেই। কথা বলতে বলতে তারা বাংলোর কম্পাউণ্ডে এসে ঢুকল। কবিরাজ বারান্দায় উঠতে উঠতে বিড়-বিড় করে বললেঃ নষ্টচন্দ্র দেখেছিলাম। তা না হলে এমন মিথ্যে অপবাদটা আমার ঘাড়ে পড়ে! দুর্গা দুর্গা !

ঘরের ভেতর সাব-ডেপুটি তমিজুদ্দীন সুরথের সঙ্গে গল্প করছিল।

তমিজুদ্দীন কলেজে সুরথের সমপাঠী ছিল।

তমিজ সিগ্রেট ধরিয়ে বললেঃ বিলেতে লোকে গ্রামে গিয়ে থাকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, আর আমাদের দেশে লোকে গ্রামে আসে স্বাস্থ্য হারাবার জন্য,—যাকে বলে মরণ হাতে নিয়ে। সাব-ডেপুটিগিরি করে কত জায়গায়ই ঘুরলাম, কিন্তু রাঙামাটির মত এমন অজ পাড়াগাঁ দেখি নি।

সুরথ বললেঃ এ গাঁয়ের চেয়েও অজ পাড়াগাঁ থাকা সম্ভব সে-কথা তুমি ভাবতেই পার না।

তমিজ একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেঃ না, সত্যি পারিনে। এখানে কি মানুষ থাকতে পারে! রাস্তাঘাট নেই, শুধু জলা আর জঙ্গল। এমন একজন লোক নেই যার সাথে আধঘণ্টা আড্ডা দেওয়া যায়। কি ভাগ্যি যে তুমি বাড়ী এসেছ !

সুরথ বললেঃ ভারতে ক'টা সহর আছে? সবই ত এমনি পাড়াগাঁ। এই গ্রামগুলোর উন্নতির উপর ভারতের সত্যিকার উন্নতি নির্ভর করে, একথা তুমি স্বীকার করবে আশা করি।

তমিজ বললেঃ সে না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু সরকারী পয়সায় রাস্তাঘাট বাঁধাই করলে আর জঙ্গল সাফাই করলেই কিছু গ্রামের উন্নতি হবে না। দু'দিন বাদে আবার জঙ্গল গজাবে, রাস্তা ভেঙ্গে পড়বে।

সুরথ টেবিল চাপড়ে বললেঃ ঠিকই বলেছ। সেইজন্য গ্রাম-সংস্কারের একনম্বর কথা হচ্ছে, গ্রামের ছেলেমেয়েদের ভাবী বাসিন্দাদের আদর্শ গ্রামবাসী করে গড়ে তোলা। তার জন্যই আমরা গুরুমশাইর পাঠশালা তুলে দিয়ে গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাই। যে বিদ্যালয়ে হাতের কাজের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হবে। Learning through some craft.

তমিজ বললেঃ আইডিয়াটা মন্দ নয়।

তারণ ঘরে ঢুকে সেলাম করে বললেঃ কবরেজ মশাই, হুজুর!

ঃ অন্দর বোলাও!...সাব-ডেপুটি সোজা হয়ে বসল। দেখতে দেখতে তার কপাল কুঁচকে গেল।

কবিরাজ বারান্দায় বেঞ্চে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। চৌকিদার ভেতরে যেতে ইসারা করলে।

পরক্ষণে হাতজোড় করে কবিরাজ ভেতরে ঢুকল। বললেঃ ধর্ম্মাবতার! আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে। বুড়ো মানুষ আমি, আপনার তেজী ঘোড়ার কাছে যাবারও সাহস নেই।

তমিজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কবিরাজের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে: আপনি বলতে চান, ঘোড়া আপনি বেঁধে রাখেন নি?

কবিরাজ ঢোঁক গিলে বললে: এতখানি সাহস আমার যৌবন কালেও ছিল না হুজুর!

তমিজ টেবিল চাপড়ে বললে: আপনার যৌবন কালের গল্প আমি শুনতে চাই না। বলি, ঘোড়া কেমন করে আপনার পুকুরঘাটে এল?

কবিরাজ বললে: হুজুর, আমি কেন আপনার ঘোড়া আটকাব? আমার ত আর ক্ষেতিবাড়ী নেই যে, আপনার ঘোড়া আমার ধান,... কবিরাজ কথা শেষ না করেই জিভ কেটে থেমে গেল।

তমিজ বিস্মিত হওয়ার ভাণ করে বললে: আমার ঘোড়া লোকের ধান খেয়ে বেড়াচ্ছে নাকি! কই, আমাকে ত কেউ বলে নি!

সুরথ এতক্ষণে কথা বললে: রাত্তিরে ঘোড়া ছেড়ে দিলেই ধান-ক্ষেতে যাবে, এ ত জানা কথাই।

কবিরাজ সাব-ডেপুটির অনুগ্রহ লাভের জন্য কথা ঘুরিয়ে বললে: ঘোড়া ছেড়ে দিলেই যে ধানক্ষেতে যাবে, তা বলা যায় না। এ তো আর নতুন নয়! সাব-ডেপুটিদের ঘোড়া বরাবরই ছাড়া থাকে।

তমিজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কবিরাজের দিকে তাকিয়ে বললে: বাজে কথা রাখুন। আপনার নিজের evidence, আপনার ধানক্ষেত নেই। ঘোড়া কেন বেঁধে রেখেছিলেন, সন্তোষজনক কৈফিয়ত চাই।

কবিরাজ বললে: হুজুর, এ আমার কোন দুষমনের কাজ। আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যই এ কাজ করেছে।

তারপর সুরথের দিকে তাকিয়ে বললেঃ তুমিই বল সুরথবাবু, আমি কেন ঘোড়া আটকাতে যাব ?

সেদিন ভোরের কথা সুরথ তখনো ভুলে নি। বললেঃ সে ত বুঝতে পারছি—খুব সম্ভব আপনি এ-কাজ করেন নি। আপনি নির্দ্দোষ। এবার ভেবে দেখুন পরের নিরপরাধ ছেলেকে মিছামিছি চোর বলে মারধর করলে, কত বড় অন্যায় করা হয় !

কবিরাজ লজ্জায় মাথা নীচু করল।

তমিজ সুরথকে বললেঃ উনি তাই করেছিলেন নাকি ? কে সেই ছেলে ?

সুরথ বললেঃ সে-সব কথা তোমাকে পরে এক সময় বলব'খন। এবার এঁকে ছেড়ে দাও।

তমিজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেঃ আপনি বলছেন আপনার কোন শত্রু আপনাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য এ কাজ করেছে। তাই না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু দোষী কে, আপনাকেই খুঁজে বার করতে হবে। আচ্ছা এখন যেতে পারেন।

কবিরাজ দু'হাত তুলে বললেঃ হুজুর ধর্ম্মাধিকার।···তারপর বাইরে বেরিয়ে বেঞ্চ থেকে ছাতা ও-লাঠি তুলে ছুটতে ছুটতে পথে বেরিয়ে গেল। চৌকিদার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছিল। ঘন্টি বেজে উঠতেই ছুটে ভেতরে গেল।

তমিজ বললেঃ ঘোড়া কে বেঁধে রেখেছিল খুঁজে বার করা চাই। আমি জানতে চাই, কার এমন বুকের পাটা !

চৌকিদার মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল।

সুরথ বললেঃ ধর, ঘোড়া আমিই বেঁধে রেখেছি। আমার কি শাস্তি পাওয়া উচিত!

তমিজ বললেঃ ঘোড়া যদি ধান খেয়ে থাকে—ধরে খোঁয়াড়ে পাঠাতে পার, কিন্তু আটকাবার আইন নেই।

সুরথ বললেঃ আইনের কথা জানিনে, কিন্তু আমি ত এতে অন্যায় কিছু দেখছি নে। বরং ঘোড়া যে আটকেছে, সৎসাহসের জন্য তাকে পুরস্কার দিতে হয়।

তমিজ এবার হেসে ফেললে। বললেঃ তাই দিতে আমি প্রস্তুত; যদি লোকটা অম্লানমুখে এ-কথা স্বীকার করে।

সুরথ উঠে দাঁড়িয়ে বললেঃ আমার মনে হয় গাঁয়ের ছেলেছোকরা কেউ এ কাজ করেছে।

তমিজ বললেঃ এ গাঁয়েও তেমন ছেলে আছে নাকি?

সুরথ একথার উত্তর না দিয়ে বললেঃ বেলা হল, এবার উঠি। আমার নতুন পাঠশালায় তোমাকে চাই-ই।

তমিজ হেসে বললেঃ চাকরী বাঁচিয়ে আমি সব কিছুই করতে রাজী আছি সুরথ!

প্রস্তাবনা

দুপুর গড়াল। দেশলাই-কাঠের টেবিলে দুই পা তুলে দিয়ে, চেয়ারে মাথা এলিয়ে পণ্ডিত দুপুরের নিদ্রাসুখ ভোগ করছে। ডানপাশে মেঝের চাটাই-এ বসে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ছেলেরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছে। বাঁ-পাশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মানের ছেলেরা বেঞ্চে বসে শ্লেটে "মঙ্গল কাটাকাটি" খেলছে। কেউ বা জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। এক কোণে একটি ছেলে আর একটি ছেলেকে চিমটি কাটল। ছেলেটি লাফিয়ে উঠে, প্রথম ছেলের মাথায় চাটি মারলে। সহসা বাবলু পকেট থেকে হুইসিল বার করে সিটি দিলে।

এদিকে যারা এতক্ষণ খেলছিল, তাদের ভেতর ঝগড়া সুরু হল। ভোলা শ্লেটের দাগ তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে মুছে দিতেই, ন্যাপলা ও ভ্যাঁপু চেঁচিয়ে উঠল : ভাল হবে না বলছি!

গোলমাল শুনে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ছেলেরা পড়া বন্ধ করে এপাশে তাকাল। পণ্ডিতের দুপুরের ঘুমে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ছেলেদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর অনেকটা ঘুম-পাড়ানি গানের কাজ করে—বিশেষত ছোটরা যখন সুর করে পড়ে। এরা চুপ করতেই পণ্ডিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পণ্ডিতের ঘুম ভাঙ্গবার অন্তত আধমিনিট আগে

নাক ডাকা বন্ধ হয়ে আসে। সিগন্যাল পেয়ে ছেলেরা নিজেদের জায়গায় উঠে এসে বসে ; মনোযোগ দিয়ে পড়া সুরু করে।

পণ্ডিত চোখ মেলে তাকাল। মুহূর্তে পাঠশালা-ঘর নীরব। টেবিল থেকে পা নামিয়ে পণ্ডিত বিরক্ত স্বরে বললে : দুপুরে একটু চোখ বুজে আরাম করব, তোদের জ্বালায় তারও উপায় নেই। কে হুইসিল দিয়েছে ?

কেউ উত্তর দিল না। পণ্ডিত টেবিলে বেতের ঘা মেরে বললে :

'বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
লঙ্কায় যাইতে তারা মাথা করে হেঁট !'

কে বাঁশী বাজিয়েছে গোপাল ?

গোপাল ডান হাত চোখের কোণে রেখে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে : আমি শুনতে পাই নি পণ্ডিতমশাই !

পণ্ডিত রেগে বললে : আমি চোখ বুজে শুনতে পেলাম, আর তোরা কেউ শুনলি নি ! আমি জানি কে হুইসিল বাজিয়েছে। নাম না বললে সব ক'টাকে মেরে ভূত-ভাগাব।

ভোলা উঠে দাঁড়িয়ে বললে : বাবলু বাজিয়েছে মামাবাবু !

: বাবলু !···পণ্ডিত গর্জ্জে উঠল। টেবিলে বেত মেরে বললে : এদিকে আয় !···বাবলু দাঁড়িয়ে রইল।

পণ্ডিত বললে : আয় এদিকে !

বাবলু টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

পণ্ডিত বললে : হুইসিল দিয়েছিলি কেন ?

বাবলু ঢোঁক গিলে বললেঃ ভোলা মিছে কথা বলছে, পণ্ডিতমশাই !

পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে বাবলুর পকেট থেকে হুইসিল বার করে বললেঃ এবার ?

বাবলু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেঃ ভোলার পকেটেও হুইসিল রয়েছে, পণ্ডিতমশাই !

ঃ বটে !···পণ্ডিত বললেঃ ভোলা, এখানে এস !

ভোলা বাবলুর পাশে এসে দাঁড়াল। বললেঃ বাবলু হুইসিল বাজিয়েছে, সবাই দেখেছে মামাবাবু !

পণ্ডিত একহাতে বাবলুর কান ও অন্যহাতে ভোলার কান ধরে বললেঃ ভোলা আর বাবলু—বাবলু আর ভোলা ! তোমাদের জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

পণ্ডিত দু'জনের মাথা ঠুকে দিয়ে বললেঃ লেখাপড়ার নাম নেই, সারাদিন বদমায়েসি !

বলতে বলতে পণ্ডিত ঠাস্ করে আর একবার দু'জনের মাথা ঠুকে দিল।

ওপাশে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ছেলেরা চুপ করে আছে দেখে পণ্ডিত চেঁচিয়ে উঠলঃ এই, তোদের সাড়া-শব্দ পাচ্ছিনে কেন ?

ছেলেরা আবার সুর করে পড়তে লাগল। পণ্ডিত বাবলু ও ভোলাকে ছেড়ে দিয়ে বললেঃ বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকগে।

বাবলুর অপরাধের জন্য ভোলাকেও শাস্তি পেতে হচ্ছে, সেজন্য

বাবলুর উপর ভোলার রাগের সীমা ছিল না। বেঞ্চে দাঁড়িয়ে সে কটমট করে বাবলুকে যেন গিলে খেতে লাগল।

পণ্ডিতমশাই এবার গোপালের দিকে ফিরে তাকাল। বললেঃ গোপাল, পড়া শিখে এসেছ?

গোপাল উত্তর দিল না। পণ্ডিত সুর করে বলতে লাগলঃ

"যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে ঐ তরুগণ,
অহঙ্কারে উচ্চশির না করে কখন।"

ব্যাখ্যা কর ত গোপাল!

গোপাল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

পণ্ডিত বেত হাতে উঠে দাঁড়াল। গোপালের কাছে এসে বললেঃ পাঁজি ছুঁচো! একটা দিনও ত পড়া শিখে আসিস্ না। তবে পাঠশালায় আসা কেন, এ্যাঁ?

পণ্ডিত গোপালের পিঠে ঘা কয়েক লাগিয়ে দিতেই গোপাল গায়ের জোরে চেঁচাতে লাগলঃ মেরে ফেল্‌লে গো, মেরে ফেল্‌লে গো!

দরজায় জুতোর শব্দ উঠতেই পণ্ডিত ফিরে তাকাল। ডেপুটি ও সুরথ দরজায় দাঁড়িয়ে। হাতের বেত টেবিলে রেখে দিয়ে পণ্ডিত দরজার দিকে দুই পা এগিয়ে এসে বললেঃ আসুন স্যার, এস বাবা সুরথ!

সুরথ ও ডেপুটি ঘরে ঢুকল।

সুরথ বললে : এদিকে যাচ্ছিলাম, তাই আপনার এখানে একবার ঢু মারা গেল। আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধ হয়—

পণ্ডিত ব্যস্ত হয়ে সাব-ডেপুটির দিকে তাকিয়ে বললে : না না, সে কি কথা! আপনারা এসেছেন···

ডেপুটি টেবিল থেকে বেতগাছি তুলে নিয়ে বললে : Spare the rod, spoil the child কথাটার ভক্ত দেখছি আপনি।

পণ্ডিত মাথা চুলকে বললে : আজ্ঞে না, ঠিক তা নয়। মানে—ইয়ে, গোরু তাড়ানো ত! বেতের ভয় না থাকলে, লেখাপড়া কি আর কেউ করবে?

সুরথ তমিজের হাত থেকে বেতগাছি নিয়ে হেসে বললে : জান তমিজ, এই পাঠশালায় আমিও পড়েছি।

ডেপুটি বললে : তা'লে বলতে হয়, এ-বেতের মাহাত্ম্য অনেক।

সুরথ এগিয়ে এসে গোপালের কাঁধে হাত রেখে বললে : ওঃ, যা চীৎকার করছিলে! আমার ত ভয় হয়েছিল সত্যিই বুঝি পণ্ডিত-মশাই তোমাকে মেরে ফেললেন।

গোপাল মাথা নীচু করল। সুরথ পণ্ডিতকে বললে : আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, বেত ছাড়া কি সত্যিই পাঠশালা চলে না?

পণ্ডিত বললে : অসম্ভব! পাঠশালায় যারা মাষ্টারী করে তারা সবাই এ-কথা স্বীকার করবে।

ডেপুটি ভোলা আর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললে : এরা দুটি উঁচুতে উঠে দাঁড়িয়েছে কেন?

পণ্ডিত বাবলু ও ভোলার দিকে তাকিয়ে বললেঃ নেমে বস।… তারপর ডেপুটির দিকে তাকিয়ে বললেঃ এই দুটো হচ্ছে বদমায়েসদের দলপতি। একটি আবার আমার ভাগ্নে।

ডেপুটি বললেঃ I see.

সুরথ ভোলার দিকে তাকিয়ে বললেঃ কি নাম ওর?

ঃ ভোলা।…উত্তর দিলে ভোলা নিজেই।

পণ্ডিত বললেঃ কিন্তু শয়তানি বুদ্ধিতে বাবলু ভোলাকে হার মানায়। এমন ছেলে আমি জীবনে দেখি নি সুরথ! অনেক গুণের ভেতর পাঠশালা পালানোও ওর একটা গুণ।

সুরথ বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেঃ সত্যি বাবলু?

বাবলু মাথা নীচু করল। তমিজ বললেঃ কিন্তু কেন পাঠশালা পালাও বল ত? পণ্ডিতমশাইর বেতের ভয়ে?

ডেপুটির কথা শুনে পণ্ডিতের মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু বাবলু হ্যাঁ না কিছু বললে না। সুরথ বললেঃ পড়া না শিখলেই ত মার খেতে হয়।

ডেপুটি বাবলুর কাঁধে হাত রেখে বললেঃ ভয় কি! মনের কথা খুলে বল।

বাবলু আস্তে আস্তে মাথা তুলে ডেপুটির দিকে তাকিয়ে বললেঃ পাঠশালায় আসতে ভাল লাগে না।

পণ্ডিত বললেঃ শুনলে ত সুরথ, এবার শুনলে ত আজকালকার ছেলেদের কথা। এতটুকু ছেলে মুখের উপর বলতে ভয় করে না, লেখাপড়া করতে ভাল লাগে না।

সুরথ বললেঃ আপনি মিছামিছি ওকে দোষারোপ করছেন পণ্ডিতমশাই! সত্যি কথা বলবার জন্য ওকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। মনের কথা যে ছেলে বলতে পারে, তার সৎসাহসের প্রশংসা করতেই হয়।

পণ্ডিত চুপ করে রইল।

তমিজ বললেঃ সেদিন রাতে একদল খারাপ লোক আমার ঘোড়া আটকে রেখেছিল। তোমরা যদি তাদের খবর দিতে পার, দু'টাকা পুরস্কার দোব।

পলকে বাবলু ও ভোলার চোখাচোখি হল। কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। বাবলুর উপর ভোলার রাগ তখনো পড়ে নি। কিন্তু সে নিজেও এ-ব্যাপারে যুক্ত, তাই মাথা নীচু করেই রইল ভোলা।

ডেপুটি চেয়ারে বসে বললেঃ পণ্ডিতমশাই, আপনার পাঠশালার ছেলেদের ভেতর ঘোড়ায় চড়তে কারা ওস্তাদ?

পণ্ডিত ইতস্তত করে বললেঃ তা ত জানিনে।

দু'তিনটা ছেলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলঃ ভোলা।

ভোলার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। তবে কি শেষকালে সাব-ডেপুটি তাকেই ধরে নিয়ে যাবে, আর বাবলু মাঝখান থেকে বেঁচে যাবে? ভোলা উঠে দাঁড়াল।

সাব-ডেপুটি বললেঃ তা'লে তুমিই হচ্ছ সেরা ঘোড়সওয়ার, এ্যাঁ?

ভোলা ঢোক গিলে বললেঃ বাবলু স্যার—বাবলু আপনার ঘোড়া আটকে রেখেছিল।

ঃ বাবলু !···সুরথ বিস্মিত স্বরে বললে।

সাব-ডেপুটি বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেঃ ঘোড়া তুমি আটকেছিলে ?

বাবলু উত্তর দিল না। পণ্ডিত চেঁচিয়ে উঠল ঃ কেন ?

বাবলু এবার উত্তর দিল ঃ মাঠের ধান খেয়ে যায় বলে।

ঃ মাঠের ধান তোর বাপের ?···বলতে বলতে ক্ষুধিত নেকড়ের মত পণ্ডিত বেতগাছি শূন্যে তুলতেই, ডিপুটী বললেঃ থামুন।

পণ্ডিতের হাত থেকে বেত পড়ে গেল। ডেপুটি বললে ঃ আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পাঠশালায় ছেলেদের বেতমারা বে-আইনি।

সাব-ডেপুটির কণ্ঠস্বরে পণ্ডিত স্তব্ধ হয়ে গেল !

সুরথ বললে ঃ পণ্ডিতমশাই, ছেলেদের ভাল করতে গিয়েই বেতের ব্যবহার করছেন নিশ্চয়। কিন্তু গলদ গোড়ায়। এ-ধরনের পাঠশালা আজকের দিনে অচল। কণ্ঠগত বিদ্যায় ছেলেদের মানসিক ও শারীরিক কোন কিছুরই বিকাশ হয়ে উঠে না। আসুন পণ্ডিতমশাই, সবাই মিলে বুনিয়াদী শিক্ষার পত্তন করি গ্রামে।

ঃ তা ত বটেই, তা ত বটেই !···অনুরোধে ঢেঁকিগেলার মত মুখখানি করে পণ্ডিত উত্তর দিল।

ডেপুটি পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে বাবলুর হাতে দিয়ে বললে ঃ তোমার সৎসাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি বাবলু ! আশীর্ব্বাদ করি মানুষ হয়ে উঠ।

নতুন পাঠশালা

টাকা দুটো হাতে নিয়ে বাবলু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সুরথ তার পিঠ চাপড়ে বললে : ছি, পাঠশালা পালাতে নেই। রোজ পাঠশালায় আসবে।

সুরথ ও সাব-ডেপুটি চলে গেলে পণ্ডিত এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পাঠশালা চড়াও হয়ে সাব-ডেপুটি ও সুরথ আজ তার অপমান করে গেল। কিন্তু উপায় কি!

একটু বাদেই পণ্ডিত ছাতা বগলে ও হুঁকো কল্কে হাতে নিয়ে বললে : ছুটী।

এ অপমান সত্যি পণ্ডিতের গায়ে বিঁধছিল। তারই পাঠশালায়, অনাহুত এসে তাকেই শাসিয়ে গেল—খবরদার বেত মারতে পারবে না! কিন্তু সুরথের কথায় পণ্ডিত তার চেয়েও বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল। সুরথের আসল উদ্দেশ্য কি? বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নিকুচি! আসল কথা, সুরথ তার পাঠশালাটি ভেঙ্গে দিতে চায়। কথায় বলে, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ?' অত পাশ দিয়ে সুরথ শেষকালে পাঠশালার মাষ্টারী করবে! সুরথের পক্ষে সবই সম্ভব। খামখেয়ালী লোক, দুনিয়ায় যা খুসী তা করতে পারে।

পণ্ডিত সুরথের ইস্কুলের কথা যতই ভাবতে লাগল, ততই দুশ্চিন্তায় তার মাথা গরম হয়ে উঠল। হয়ত সুরথ সত্যিই তার অনিষ্ট করতে চায় না। কিন্তু গ্রামে সুরথ পাঠশালা খুললে পণ্ডিতের পাঠশালায় কেউ ছেলে পাঠাবে না—এ ত জানা কথাই। তবে

কি জেনেশুনেই সুরথ তাকে পথে বসাতে চায়? সুরথের ধারণা, পণ্ডিত আজকাল পড়াতে পারে না। কিন্তু সে যদি পড়াতেই অক্ষম, সুরথ তাকে নতুন পাঠশালায় ডাকছেই বা কেন?

পণ্ডিতের মন বললে, ও নেহাৎ ভদ্রতার কথা। সুরথ সত্যিই তোমাকে চায় না। ও চায় পাঠশালা ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি চির-বিদায় নাও।

সেদিন রাত্রে পণ্ডিত স্বপ্ন দেখলে, সুরথ পাঠশালার মাষ্টার, আর সে ছাত্র। পণ্ডিত পড়া তৈরী করে আসে নি, তাই সুরথ বেত হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সুরথ বেত শূন্যে তুলতেই পণ্ডিত ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।...

ঘুম ভাঙ্গতেই পণ্ডিত দেখলে, সে বিছানায় শুয়ে আছে। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সে উঠে ঢক্-ঢক্ করে এক গ্লাস জল খেলে।

তারপর পণ্ডিত এক ছিলিম তামাকু সাজলে। সে মনে মনে ভাবলে—না, সুরথকেও বিশ্বাস করা যায় না। দুনিয়ায় কাউকেই বুঝি বিশ্বাস করা চলে না।

সকালবেলা পণ্ডিত দ্বারিকের দাওয়ায় এসে দেখে, কবিরাজ বসে বসে ঝিমুচ্ছে। পণ্ডিতকে দেখে বললে: এস হে পণ্ডিত, এস।

পণ্ডিত দাওয়ায় উঠে নিঃশব্দে বসল। কবিরাজ বললে: কথাটা কি তবে সত্যি পণ্ডিত? রাখালের ঐ ডেঁপো ছোকরাই নাকি ডেপুটি সাহেবের ঘোড়া আটকে আমার পুকুরঘাটে বেঁধে রেখেছিল?

পণ্ডিত উত্তর দিল না।

নতুন পাঠশালা

কবিরাজ বললে : ছোকরা আমাকে কি নাস্তানাবুদই না করলে !

দ্বারিক ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে : শুনলাম ডেপুটি সাহেব নাকি তোমার পাঠশালায় গিয়েছিল ওকে পাকড়াও করবার জন্য !

: হুঁ !…পণ্ডিত অন্যমনস্ক স্বরে বললে। ওর মাথায় তখন সুরথের পাঠশালার কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'আসন্ন বিপদে'র কথা ভেবে পণ্ডিতের আজ খোস-গল্পে মন নেই।

দ্বারিক বললে : বলি অমন মনমরা কেন ? ব্যাপারটা কি খুলেই বল না।

কবিরাজ বললে : ডেপুটি সাহেব ছোকরাকে পাকড়াও করলে ?

পণ্ডিত বললে : ছোকরার সৎসাহসের প্রশংসা করে ডেপুটি ওকে নগদ দুটো টাকা পুরস্কার দিয়েছে।

কবিরাজ নিরুৎসাহ-স্বরে বললে : তা'লে যা শুনেছি তাই সত্যি ! কিন্তু এতে সৎসাহসটা কোন্‌খানটায় শুনি ? কিছুই যে বুঝে উঠতে পারছি না।

পণ্ডিত চুপ করে রইল। দ্বারিকই উত্তর দিলে। বললে : ঘোড়া রোজ রাত্তিরে মাঠে এসে ধান খেয়ে যায়, কারো সাহস নেই যে আটকায়। বাবলু হিম্মত করে আটকেছে—পুরস্কার তার প্রাপ্য বই কি।

কবিরাজ বললে : ঘোর কলি, তা না হলে এমন কাণ্ড কখনো হয় !…হ্যাঁ হে পণ্ডিত, শুনলাম তোমাকেও নাকি শাসিয়ে গেছে ডেপুটি—ছেলেদের বেত মারতে পারবে না ভবিষ্যতে ?

পণ্ডিত রেগে বললে : তাতে তোমার মাথাব্যথা কেন ?

কবিরাজ হেসে বললে : সেজন্যই অমন মনমরা হয়ে বসে আছ !

পণ্ডিত বললে : পাঠশালার শিক্ষক আমি—সাব-ডেপুটি নই। আমার যা খুসী করব। সাব-ডেপুটি আর একদিন পাঠশালায় এলে, যদি আমি তাকে অপমান না করি ত আমার নাম রামতারক পণ্ডিত নয়।

কবিরাজ উঠে দাঁড়াল। বললে : ছোট মুখে বড় কথা শুনে হাসি পায় পণ্ডিত! কথা ত লম্বা লম্বা বলছ, কিন্তু সাব-ডেপুটি সামনে এলে, কাঁপতে সুরু করবে। হ্যাঁ, সবই আমার জানা আছে।

দ্বারিক বললে : চললে নাকি কবরেজ ?

: হ্যাঁ ভাই !···কবিরাজ বললে : বিকালে আসব'খন।

কবিরাজ চলে গেলে পণ্ডিত দ্বারিকের সামনে এগিয়ে এসে গলার স্বর নামিয়ে বললে : তোমার গিয়ে, সর্ব্বনাশ হয়েছে মহাজন !

দ্বারিক কিছু বুঝতে না পেরে পণ্ডিতের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল।

পণ্ডিত বললে : সুরথ গ্রামে নতুন পাঠশালা খুলছে।

দ্বারিক বললে : স্বদেশী ইস্কুল নিশ্চয়ই !

পণ্ডিত বললে : স্বদেশী কি বিদেশী জানিনে মহাজন, তবে আমার রুটী মারা গেল !

দ্বারিক পণ্ডিতকে আশ্বস্ত করে বললে : গাঁয়ে নতুন পাঠশালা

করা মুখের কথা আর কি! জায়গা চাই, ঘরবাড়ী চাই—চাই টাকা-কড়ি। ওদিকে বাবুর ট্যাঁক ত ভূষণ্ডীর মাঠ শুনতে পাই। 'অচ্ছ ভক্ষ্য ধনুর্গুণ' যাকে বলে।

পণ্ডিত বললেঃ সাব-ডেপুটি ওর পেছনে আছে।

ঃ স্বদেশী ইস্কুলের পেছনে সাব-ডিপুটি?…দ্বারিক অবিশ্বাসের স্বরে বললেঃ অসম্ভব! ওকথা তুমি বিশ্বাস করো না।

পণ্ডিত একটু ভেবে বললেঃ তা ছাড়া আমার মনে হয় পরেশবাবু আর তার মেয়ে সুরথকে সাহায্য করবে।

দ্বারিক বললেঃ ওরা ত দু'দিন বাদে চলে যাবে। তখন?

পণ্ডিত বললেঃ তোমার গিয়ে সুরথ আমাকে বলছে, পাঠশালা তুলে দিয়ে নতুন পাঠশালায় ওর সাথে যোগ দিতে।

দ্বারিক লাফিয়ে উঠে বললেঃ তুমি ক্ষেপেছ! স্বদেশী ইস্কুল হলেই গ্রামে গুপ্ত-পুলিশ আসবে। বুড়ো বয়সে শেষকালে গুপ্ত-পুলিশের হাতে নাস্তানাবুদ হবে।…পায়চারি করতে করতে বললেঃ ভেবে দেখ, দু'দিন বাদে সুরথ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে; সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুলও উঠে যাবে। তখন তোমার উপায়টা কি হবে? না একূল, না ওকূল।

পণ্ডিত বললেঃ না মহাজন, সুরথের কথায় বিশ্বাস করে আমার এতদিনের পাঠশালা ভেঙ্গে দোব—অত বোকা আমি নই। করুক না ও নতুন পাঠশালা, আমিও আমার পাঠশালা নিয়ে বসে রইলাম।

দ্বারিক বললেঃ তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নতুন পাঠশালা-টালা

গাঁয়ে হতে দিচ্ছিনে আমি। হ্যাঁ, তোমার কি মনে হয় ও এখন থেকে গ্রামেই থাকবে?

ঃ কি জানি!···পণ্ডিত উদাসস্বরে বললে।

দ্বারিক উত্তেজিত-স্বরে বললেঃ তুমি জেনে নিয়ো, গ্রামের কেউ ওকে চায় না, কেউ না। ওকে ফিরে যেতেই হবে।

পণ্ডিত উঠে দাঁড়াল। দ্বারিক বললেঃ চললে কোথায়?

পণ্ডিত বললেঃ পাঠশালায়।

দ্বারিক বিস্মিত হয়ে বললেঃ অত সকাল সকাল!

পণ্ডিত ম্লান হেসে বললেঃ এবার থেকে সকাল সকাল পাঠশালায় যেতে হবে মহাজন!

পথের ধারে আমবাগানে টবু, বুবু, ক্ষেন্তি আর পেঁচি খেলছে। পুতুলের বিয়ে। রান্নাবান্না কাজকর্ম্মে সবাই ব্যস্ত। দুপুর গড়িয়ে পড়েছে, তবু এদের বিয়ে-বাড়ীর উৎসব আর শেষ হয় না! সুরুচি কখন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ লক্ষ্য করে নি। সহসা সুরুচিকে সামনে দেখে যেন ভূত দেখেছে, এমনি ভাবে সবাই চারদিকে ছুটে পালাল। শুধু বুবু পালাতে পারল না, সুরুচি খপ্ করে তার হাতখানি ধরে ফেলল।

সুরুচি বুবুর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেঃ তোমাদের সাথে খেলব বলে এলাম, আর আমাকে দেখেই তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ!

বুবু হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বললেঃ ছেড়ে দাও।

সুরুচি বললেঃ ছাড়ব, যদি আমার সাথে খেলতে রাজী হও।

বুবু রেগে বললেঃ তোমার সাথে খেলব না—তুমি ভাল না। তোমার ইস্কুলে পড়ব না।

সুরুচি হাসি গোপন করে বুবুর হাত ছেড়ে দিলে। বুবু এক দৌড়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

সুরুচি একমুহূর্ত্ত আমবাগানে বসে রইল। দু'হপ্তা চেষ্টা করেও সে একটা ছাত্রীও জুটাতে পারল না। ছোটদের সাথে ভাব করতে গেলে তারা ছুটে পালিয়ে যায়। সুরুচিকে তারা শ্রদ্ধা করে, কিন্তু কাছে যেতে ভয় পায়। সুরুচি যে এ-গাঁয়েরই একজন,—তাদেরই একজন, কিছুতেই তারা বিশ্বাস করে না। কথাটা সুরুচির কানে গেছে, গ্রামের মেয়েরা তাকে 'মাষ্টারনী' বলে। লেখাপড়া-জানা সব মেয়েই ওদের কাছে মাষ্টারনী। মাষ্টারনী কিম্ভূতকিমাকার জীব। 'বুট' পায়ে দিয়ে পুরুষদের সাথে সমানতালে চলে—রান্নাবান্না ঘরকন্নার ধার ধারে না। সেইজন্যই বোধ হয়, মাষ্টারনীর কাছে মেয়েদের পাঠাতে গ্রামের কারো উৎসাহ দেখা যায় না।

গোপা ও গোপার মা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সুরুচি আমবাগানে একা বসে আছে দেখে তারা থমকে দাঁড়াল।

সুরুচি উঠে এগিয়ে আসতেই গোপার মা বললেঃ একা একা এখানে কি করছ মাষ্টারনী দিদি ?

সুরুচি হেসে বললেঃ মেয়েরা খেলছে দেখে, আমি বসেছিলাম। কিন্তু আমায় দেখে সবাই পালিয়ে গেল।

গোপার মা বিস্মিতস্বরে বললে : ওমা ! মেয়েগুলোর কি আক্কেল দেখ ত ! তুমি তাদের অত মায়া কর, আর তোমাকে দেখে সব পালিয়ে যায় !

সুরুচি গোপার দিকে তাকিয়ে বললে : কিন্তু গোপা ! তুমিও ত এলে না আমার ইস্কুলে !

গোপা অপরাধীর মত মাথা নীচু করল।

গোপার মা বললে : যাস্ না কেন রে গোপা ! রোজ একবারটি করে মাষ্টারনী দিদির বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এলে ত পারিস্।...তারপর সুরুচির দিকে ফিরে বললে : আর ওরই বা দোষ দি কেমন করে ? সারাদিন একটা না-একটা ঘরের কাজ ওর জন্যে আছেই। ফুরসৎ কোথায় ওর ?

সুরুচি হাসিমুখে গোপার দিকে তাকিয়ে বললে : তু'দিন না হয় একটু ফুরসৎ করে তোমরা সব এলে আমার কাছে। চিঠি লেখাটাও শিখতে পারলে মন্দ কি ! তু'মাস বাদে আমি চলে গেলে, কে আর তোমাদের ডাকতে আসবে বলো !

গোপা লজ্জিতস্বরে বললে : কাল ঠিক যাব মাষ্টারনী দিদি !

গোপার মা বললে : কাল আমি ওকে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দোব।

সুরুচি হেসে বললে : দেখব'খন।

গোপা ও গোপার মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুরুচি বাড়ীর পথ ধরল। সুরুচির একথা বুঝতে বাকী রইল না যে, মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে গোপার মার কোন উৎসাহ নেই।

খানিকদূর যেতেই সুরথের সাথে দেখা। সুরথ বললে: তোমাকেই খুঁজছিলাম সুরুচি!

সুরুচি বললে: আমাকে?

সুরথ বললে: এ-বেলা আমার জন্য রান্না করো না, বলাইকাকার বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে।

সুরুচি স্মিতমুখে বললে: এই খবরের জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে আমাকে খুঁজছিলে নাকি!

সুরথ বললে: ব্যস্ত সত্যিই একটু হয়েছি সুরুচি! তোমরা গ্রামে থাকতে থাকতেই নতুন পাঠশালাটি চালু করবার ইচ্ছা। এদিকে দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু কাজ কিছুই এগুচ্ছে না।

সুরুচি নিঃশব্দে সুরথের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। চৌমাথায় এসে সুরথ থমকে দাঁড়াল। বললে: আমি চললাম এখন।

সুরুচি বললে: বাড়ী আসবে না?

: না।···সুরথ বললে: একবার পণ্ডিতমশাইর কাছে যাচ্ছি। দেখি ওঁকে আমাদের দলে টানতে পারি কিনা। শক্ত কাজ। তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

এইমাত্র পাঠশালা ছুটী হয়েছে। ছাতা বগলে, হুঁকো হাতে পণ্ডিত পথে নামতেই দেখলে, সুরথ সেদিকে আসছে। একটা বিজাতীয় ঘৃণায় পণ্ডিতের ভুরু কুঁচকে গেল। সুরথের মুখ দর্শন এখন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। যেন সুরথকে দেখতে পায় নি এমনি

ভাবে ছাতা আড়াল করে পণ্ডিত পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলে; কিন্তু সুরথ ততক্ষণে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

হাসিমুখে সুরথ বললেঃ আমাকে দেখতে পান নি পণ্ডিত-মশাই?

পণ্ডিত উদাসস্বরে বললেঃ দেখতে ঠিক পেয়েছিলাম। তবে একটু ব্যস্ত ছিলাম বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম।

সুরথ পণ্ডিতের পাশাপাশি যেতে যেতে বললেঃ বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ?...

পণ্ডিত গম্ভীরস্বরে বললেঃ সে-সব কিচ্ছু না। হ্যাঁ, তারপর তোমার প্রস্তাবিত ইস্কুলের কতদূর কি হল?

সুরথ বললেঃ সেজন্যই ত আপনার কাছে ছুটে এলাম পণ্ডিত-মশাই! আপনাকে ছাড়া ত আর গ্রামে নতুন পাঠশালা হতে পারে না।

পণ্ডিত বললেঃ তোমার গিয়ে আমাকে আর এর ভেতর টেনো না, সুরথ!

সুরথ বললেঃ পণ্ডিতমশাইকে বাদ দিয়ে কখনো পাঠশালা চলে?

এক মুহূর্ত্ত পণ্ডিত উত্তর দিল না। যে প্রসন্নতা নিয়ে সেদিন পণ্ডিত সুরথকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল, আজ তা তিক্ততায় রূপ নিয়েছে, সুরথের তা বুঝতে বাকী ছিল না। পণ্ডিতের ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে। ওঁকে দলে আনা চাই।

সুরথ বললেঃ পণ্ডিতমশাই, আজ সন্ধ্যায় একবার পরেশবাবুর

বাড়ী আসুন না। নতুন পাঠশালা নিয়ে সবাই মিলে আলোচনা করব।

পণ্ডিত এবার তিক্তস্বরে বললেঃ তুমি কি বলতে চাও, তোমার সাময়িক খেয়ালের জন্য, আমার এতদিনকার পাঠশালা উঠিয়ে দোব—এই কি তোমার ধারণা? যে পাঠশালায় জীবনের পঁচিশবছর কাটিয়েছি, তোমার অনুরোধে নিজের হাতে সেটি ভেঙ্গে দোব?

সুরথ বললেঃ আপনার পাঠশালা যাতে না ভাঙ্গে, সেজন্যই ত আপনার কাছে এসেছি। আপনার পাঠশালায়ই আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করব।

ঃ বুনিয়াদী শিক্ষা মাথায় থাক।···পণ্ডিত বললেঃ আমার পাঠশালায় পুরানো শিক্ষা-পদ্ধতিই চলবে।

ঃ আমার কথা আগে ভাল করে শুনুন, পণ্ডিতমশাই!···সুরথ অনুনয় করে বললে।

পণ্ডিত বললেঃ আমাকে শুনিয়ে মিছামিছি সময় নষ্ট করা। বরং যারা তোমার নতুন ব্যবস্থায় আগ্রহশীল, তাদের শোনাও গে। আমি তোমার দলে যোগ দিতে অক্ষম।

পণ্ডিতকে নমস্কার করে সুরথ বাড়ীর পথ ধরল। পথে ফুল-বিহার। সুরথ থমকে দাঁড়াল। এই বাড়ীটির সাথে তার শৈশবের অনেক মধুর স্মৃতি জড়ানো। গাঁয়ের ছেলেদের সাথে এখানে সে খেলতে আসত। আজো ফুলে-ফুলে সুশোভিত বাগানটির আবছা স্মৃতি মনের চোখে ভেসে উঠে। শৈশবে বেশীকাল সে গ্রামে ছিল না,

তবু ফুলবিহারের কথা কখনো সে ভুলতে পারে নি। এমন দিন নেই যখন ফুলবিহারে ফুল ফুটত না—এমন ঋতু নেই যখন এখানকার গাছে ফল থাকত না। সেই ফুলবিহার আজো ফুলের হাসিতে অম্লান আছে; কিন্তু এর ভেতরে ঢুকবার দরজায় আজ তালা ঝুলছে! সুরথের দৃষ্টি পড়ল, কালো রং-এর টিনের উপর চূণ দিয়ে লেখা সাইনবোর্ড—মালিক শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র। সদর-দরজা দিয়ে ফুলবিহারে ঢুকবার অধিকার আজ আর গাঁয়ের ছেলেদের নেই।

খানিকদূরে বাবলুর চীৎকার শুনে সুরথ ফিরে তাকাল। দ্বারিক তার কান ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সুরথ এগিয়ে এসে বললেঃ ব্যাপার কি! এর কানটা যে চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে।

দ্বারিক বাবলুর মাথায় এক চাঁটি লাগিয়ে বললেঃ হয়ে গেলে ত বাঁচি। শুধু কান কেন, কান-চোখ, হাত-পা, সব কিচ্ছু! ছোকরা চোর! আমার বাগানের ফল-মূল কিচ্ছু রাখলে না, সুরথবাবু! আজ ভাগ্যিস্ ধরতে পেরেছি।

কথা বলতে বলতে দ্বারিকের হাত আলগা হয়ে এসেছিল। বাবলু এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, ছুট্ দিলে। দ্বারিক তার পিছু পিছু ছুটতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললেঃ দেখলে ত, এবার নিজের চোখে দেখলে ত! ছোকরা মিটমিটে শয়তান।

সুরথ বললেঃ আপনার বোধ হয় মনে পড়ে, বাবা বেঁচে থাকতে এ-বাড়ীতে গাঁয়ের ছেলেদের অবাধ অধিকার ছিল!

শুকনো হেসে দ্বারিক কপালে হাত তুলে বললেঃ তিনি ছিলেন পুণ্যাত্মা, মহাপুরুষ। রায়মশাইর মত এমন সদাশয় ব্যক্তি আর হয় না।

সুরথ বললেঃ বাগানের ফলমূল গাঁয়ের ছেলেরা অমন একটু-আধটু চুরি করেই থাকে।

দ্বারিক বললেঃ একটু-আধটু হলে কি আর আমি সহ্য করি না? তুমি জান না, সুরথবাবু, বাগানটিতে আজকাল রাতদিন চুরি হচ্ছে। মন আমার বড় নরম, তাই প্রায়ই চুপ করে থাকি; ভাবি—গাঁয়ের ছেলেরা ফলমূল চুরি করছে, করুক। কিন্তু সহ্যেরও ত একটা সীমা আছে বাবাজী!

সুরথ অন্য কথা পাড়লে; হেসে বললেঃ আর যাই হোক আপনার হাতে পড়ে বাগান-বাড়ীখানির চেহারা ফিরে গেছে।

দ্বারিক মুচকি হেসে বললেঃ সবাই ঐ কথা বলে। তা ঐ বাড়ীখানির জন্য কি কম টাকা আমি খরচ করেছি!

সুরথ তালাবন্ধ সদর-দরজার দিকে তাকিয়ে বললেঃ অত বড় তালা দেখে তা বুঝতে আর বাকী থাকে না। তা ও-বাড়ীতে ত আর আপনি নিজে উঠে যাচ্ছেন না?

দ্বারিক বললেঃ না, সে-সব কোন মতলব নেই।

সুরথ দ্বারিকের সামনে একপা এগিয়ে এসে বললেঃ মহাজন, বাড়ীখানি আমি আপনার কাছে একদিন চাইতে আসব।

দ্বারিকের মুখ শুকিয়ে গেল। সুরথের মতলব কি? ঢোক গিলে

বললেঃ বাড়ী ত তোমাদেরই বাবা! তোমরা গাঁয়ের দশজন ছাড়া, তুনিয়ায় আর কে আছে আমার? তুমি বাড়ীখানি নিতে চাও তাতে আর কথা কি!

সুরথ খুসী হয়ে বললেঃ আমি জানতাম, চাইলেই বাড়ীখানি আপনি দেবেন। গাঁয়ের ছেলেদের জন্য ফুলবিহারে বুনিয়াদী শিক্ষালয় খুলব আমরা।

দ্বারিক কিছু বুঝতে না পেরে বললেঃ বুনিয়াদী বংশ তোমাদের সে কি আর আমি জানিনে? বুনিয়াদী বিদ্যালয় তুমি সুরু করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু কথাটা কি জান,—পণ্ডিতের পাঠশালা যখন চালু রয়েছে, গ্রামে নতুন পাঠশালা খোলা কি উচিত হবে?

সুরথ বললেঃ আমি আশা করছি, পণ্ডিতমশাইও একদিন আমাদের সাথে যোগ দেবেন।

দ্বারিক গদগদস্বরে বললেঃ তুমি বোঝ না সুরথবাবু, সে কি কেউ পারে!...অবশ্যি তুমি পাঠশালা খুললে, পণ্ডিতের পাঠশালা উঠে যাবে। পণ্ডিত সারাজীবন যে গাঁয়ের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাল, আজ বুড়ো বয়সে তার তুর্গতির শেষ থাকবে না। না না, সুরথবাবু, সে আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। নতুন পাঠশালার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী।

সুরথ বললেঃ তা'লে নতুন পাঠশালার জন্য বাড়ীখানি দিতে আপনি রাজী নন?

ঃ না।...দ্বারিক বললেঃ তুমি নিজে এসে ও-বাড়ীতে বসতি করতে

চাও, সে আলাদা কথা। কিন্তু পণ্ডিত যাতে বিপন্ন হয় এমন কাজে আমি সাহায্য করব না।

দ্বারিক-কবিরাজ-পণ্ডিত—গ্রামের এই ত্রি-মূর্ত্তিকে সুরথের জানতে বাকী নেই আর! তবু সুরথের আশা ছিল, পণ্ডিতকে বুঝি দলে টানা যাবে। কিন্তু পণ্ডিতও যখন সুরথের পাশে দাঁড়াতে অস্বীকার করল, দ্বারিক তাকে সাহায্য করবে না সে ত জানা কথাই। দ্বারিকের উপদেশেই পণ্ডিত সুরথকে সাহায্য করতে নারাজ হয়েছে, এমনও হওয়া সম্ভব।

সুরথ হাত তুলে বললেঃ আচ্ছা তা'লে আসি মহাজন!

ঃ এস বাবা এস।···দ্বারিক বললে।

সন্ধ্যাবেলা পরেশবাবু ঢালা ফরাসে বসে আপনমনে তানপুরা বাজাচ্ছেন। সুরথ এল। পরেশবাবু বললেনঃ কদ্দূর কি হল সুরথ?

সুরথ ফরাসের এককোণে বসে পড়ে বললেঃ কিছুই হল না। পণ্ডিতমশাই আমাদের সাথে আসবেন না, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। এদিকে দ্বারিক বাড়ী দেবে না। মুখের উপর বললে—নতুন পাঠশালার বিরোধী সে।

পরেশবাবু তানপুরা বাজাতে বাজাতে বললেনঃ সেই গানটা জানত? তারপর সুর করে গাইতে লাগলেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, ও তুই একলা চল্, একলা চল্ রে, একলা চল্!'

সুরথ চুপ করে বসে রইল এক মুহূর্ত্ত। একলা চল্! এমন সুর, বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

গান থামলে পরেশবাবু বললেন: সৎকাজে ভগবান সহায়, সুরথ!

সুরথ বললে: বুনিয়াদী ইস্কুল আমি করবই পরেশকাকা, কোন বাধা মানব না।

: এই ত চাই!…পরেশবাবু খুসী হয়ে বললেন: তোমার ইস্কুল দাঁড় করাবার জন্য যদি আমাকে দু'চার মাস গ্রামে থাকতে হয়, তাতেও আমি রাজী।

সুরুচি কখন রান্নাঘর থেকে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বললে: যতদিন ইস্কুল-বাড়ী তৈরী না হয়, আমাদের চণ্ডীমণ্ডপেই Basic school সুরু কর না, সুরথদা!

পরেশবাবু খুসী হয়ে বললেন: That's a good idea. কথাটা আমি আগে ভেবে দেখি নি। হ্যাঁ, সুরথ, তোমার পাঠশালা চণ্ডীমণ্ডপেই সুরু কর। ইতিমধ্যে আমি দ্বারিকের কাছ থেকে ফুলবিহার কিনতে পারি কিনা দেখি।

সুরথ বললে: আমিও চণ্ডীমণ্ডপের কথা ভাবছিলাম। আপাতত আমি, আপনি আর সুরুচি—আমাদেরই পাঠশালা চালাতে হবে। সহরে শিক্ষাব্রতী আমার ক'জন বন্ধু এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য তারা কিছুকাল এ গাঁয়ে এসে থাকতে রাজী। কিন্তু বিদ্যালয় চালু না করে ত তাদের আনা যায় না!

পরেশবাবু বললেন : চালু করে দিলেই হল। এ আর এমন শক্ত কথা কি!

খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে বিদায় নেওয়ার সময় পরেশবাবু সুরথের পিছু পিছু রাস্তায় এসে বললেন : শোন সুরথ, স্বর্গতা স্ত্রীর নামে কিছু টাকা শিক্ষাকার্য্যে দান করবার ইচ্ছা আমার বহুকালের। তোমার বিদ্যালয়ের জন্য যদি টাকাটা নাও, খুসী হব।

সুরথ পরেশবাবুর দিকে এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে বললে : পরেশকাকা, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানো, অকৃতজ্ঞতারই সামিল হবে। কিন্তু টাকার আমাদের সত্যি দরকার নেই।

সুরথ চলে গেলে, পরেশবাবু কি ভেবে জামা পরতে লাগলেন। সুরুচি বললে : কোথাও বেরোচ্ছ নাকি বাবা?

: হ্যাঁ রে।···পরেশবাবু বললেন : দ্বারিক মহাজনের ওখানে একটু যাচ্ছি।

: এই রাত্তির বেলা!···সুরুচি বললে : কাল গেলেই ত হয়।

পরেশবাবু বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন : এক্ষুণি ঘুরে আসছি মা!

দ্বারিক তখন উঠানে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বসে সুদের টাকা নিয়ে ভরতের সঙ্গে বচসা করছিল। ভরত বলছিল : সুদ যা দেবার তা ত দিয়ে দিয়েছি মহাজন।

দ্বারিক খাতা বার করে বললে : মুখে বললেই ত হয় না, এ খাতা-পত্রের কাজ। এই ত্যাখো খাতায় লেখা নেই।

ভরত বললে ঃ খাতাই যদি পড়তে পারতাম মহাজন, তবে কি আর দশজনে আমাকে ঠকিয়ে নিতে পারত ?

দ্বারিক রেগে বললে ঃ কী ! আমাকে ঠক, মিথ্যেবাদী বলছিস্ ?

ভরত বললে ঃ মিথ্যেবাদী তুমি কেন হবে গো, মিথ্যেবাদী আমি। আমার পয়সা নেই, দু'দশ টাকা ধারের জন্য তোমার দ্বারে ধর্না দিতে হয়। লোকে আমাকেই মিথ্যেবাদী বলবে।

দ্বারিক স্বর বদলে করুণস্বরে বললে ঃ নিজে না খেয়ে না দেয়ে, তোদের বিপদের সময় টাকা দিয়েছিলাম এর জন্য ? মন আমার বড় নরম বলেই ত লোকের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারি না। তাই আমার টাকা খেয়ে আমারই মুখের উপর বসে লোকে মস্করা করে।

ভরত লজ্জিত হয়ে জিভ কেটে বললে ঃ ভুল বুঝো না মহাজন, আমি তোমায় ঠাট্টা করি নি, নিজের পোড়াকপালের কথাই বলছিলাম।

দ্বারিক বললে ঃ পোড়াকপাল তোদের নয়—পোড়াকপাল আমার। তা না হলে ঘরের খেয়ে কে অমন বনের মোষ তাড়ায় !

ভরত বললে ঃ সে কি আর আমি জানিনে ? আপদে বিপদে এ গাঁয়ে তুমি ছাড়া আর কে আছে আমাদের ?

দ্বারিক বললে ঃ আপদে বিপদে সাহায্য করেছিলাম বলেই ত আজ সবাই আমার হকের টাকা মেরে দিচ্ছে। টাকা আদায়ের জন্য যার কাছে যাই সেই বলে, এক পয়সা সুদ দোব না। কোর্টে যাও।

দ্বারিকের বাড়ীর পেছনে বাঁশঝাড়ের পাশে মস্ত বড় একটা জাম-গাছ। গাছটাতে ভূতের বাসা বলে গাঁয়ের সবার ধারণা। অবশ্য

নতুন পাঠশালা

জামগাছের ভূত আজ অবধি কেউ দেখে নি। কিন্তু মাঝে মাঝে—বিশেষত যখন জাম পেকে আসে, রাত্তির বেলা গাছের ডালে ভয়ানক দাপাদাপি সুরু হয়। দিনের বেলা জামগাছের আশেপাশে কাউকে দেখলে দ্বারিক হা-হা করে উঠে; কিন্তু মাঝরাতে যখন গাছে দাপাদাপি সুরু হয়, দ্বারিক দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অশরীরীদের উদ্দেশ্যে কাতরকণ্ঠে বলে ঃ তা জাম খাবি খা—গাছের ডালপালা যেন ভাঙ্গিস্ নি বাছারা!

সহসা জামগাছের ডালপালা ভীষণ জোরে নড়ে উঠতেই দ্বারিক চমকে উঠে ফিরে তাকাল। ভরত ভীতস্বরে বললে ঃ আমি চললাম কত্তা। কাল দিনের বেলা এসে কথা কইব।

দ্বারিক বাধা দিয়ে বললে ঃ বোস্ বোস্। ভয় পাচ্ছিস্ কেন? ওরা কারো অনিষ্ট করে না। বাড়ীর রাখাল।

ভরত কিন্তু আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করল না। লাঠিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দ্রুত পথে নামল।

দ্বারিক দলিলের ঝাঁপিটা ঘরের ভেতর সিন্ধুকে রেখে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললে ঃ তা বাছারা! এখন ত আর গাছে জাম নেই। তবে কি জন্য এসেছ?

সহসা উঠানে ছায়া দেখে চেঁচিয়ে উঠল দ্বারিক ঃ কে—কে ওখানে?

টর্চ্চের আলো উঠানে ফেলে পরেশবাবু ভেতরে ঢুকে বললেন ঃ আমি, মহাজন—আমি পরেশ।

ধড়ে প্রাণ ফিরে এল দ্বারিকের। বেতের মোড়াটা এগিয়ে দিয়ে বললেঃ বসুন পরেশবাবু, বসুন।

পরেশবাবু বললেনঃ মহাজন, একটু বিশেষ প্রয়োজনে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

দ্বারিক বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললেঃ আপনারা দশজনের জন্যই ত আমি গাঁয়ে আছি। তামাকু সাজব?

ঃ কিচ্ছু না।...পরেশবাবু বললেন।

দ্বারিক বললেঃ আমি ভুলে গিয়েছিলাম আপনি পান-তামাকু কিছুই খান না। গানের আসর-টাসরের কোন কাজে আমার সাহায্যের দরকার কি?

জামগাছটা আবার ভীষণ জোরে নড়ে উঠল। বিস্মিত পরেশ-বাবু অন্ধকারে সেদিকে তাকিয়ে বললেনঃ ওখানে কারা নড়াচড়া করছে যেন!

ঃ নিশাচর কোন জীব-টীব হবে হয়ত।...দ্বারিক উদাস স্বরে বললেঃ তারপর?

একটু কেশে গলা সাফ করে পরেশবাবু বললেনঃ ফুলবিহার বাগান-বাড়ীখানি আপনার কাছে চাইতে এসেছি মহাজন!

দ্বারিক এক মুহূর্ত্ত উত্তর দিল না। পরেশবাবু যে সুরথের পাঠ-শালার জন্য বাড়ীখানি কিনতে চান, দ্বারিকের বুঝতে দেরী হল না।

পরেশবাবু বললেনঃ আপনি যত টাকা দাম চান বাড়ীখানির জন্য, আমি দিতে প্রস্তুত।

দ্বারিক বললে : এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনি রাত্তির বেলা আমার কাছে এসেছেন !

পরেশবাবু খুসী হয়ে বললেন : তা'লে বাড়ীখানি আপনি দিলেন আমাকে ?

দ্বারিক একটু ভেবে বললে : পরেশবাবু, আপনাদের আশীর্ব্বাদে খাওয়া-পরার আমার অভাব নেই। টাকার লোভে আমি ফুলবিহার বিক্রী করব না। সত্যি বলতে কি পরেশবাবু, ফুলবিহারের উপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। তা না হলে এই আক্রার বাজারে অত টাকা খরচ করে বাড়ীখানির সংস্কার করলাম কেন ? না পরেশবাবু, আপনাকে মিছামিছি ঘুরিয়ে লাভ নেই—ফুলবিহার আমি বিক্রী করব না।

গাইয়ে লোক পরেশবাবু। ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখনো কোন গবেষণা করবার ফুরসৎ পান নি। এ-গাঁয়ের অনেকেই হলফ করে বলতে পারে ভূত তারা নিজের চোখে দেখেছে। পরেশবাবু তাদের অবিশ্বাস করেন নি। আবার কেউ যখন ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জানিয়েছে, পরেশবাবু এ-নিয়েও তর্ক জুড়ে দেন নি। ভূত-প্রেত সত্যি-সত্যি থাকুক বা না থাকুক পরেশবাবুর কিছু এসে যায় না। বাড়ী ফেরার পথে পরেশবাবু দ্বারিকের কথাই ভাবছিলেন। দ্বারিকের নির্ম্মম শোষণ, পাঁচ টাকা ধার দিয়ে পঁচিশ টাকা উসুল করা, গরীব চাষীর সর্ব্বস্ব কেড়ে নেওয়া, এসব কথা গাঁয়ের কে না জানে !

এসব ঘটনা গ্রামের লোকের কাছে নিত্য-নৈমিত্তিক। তাই এ নিয়ে কেউ আলোচনা করে না। দ্বারিকের বাড়ীর জামগাছের ঘটনার কথাটা সহসা পরেশবাবুর মনে পড়ল। তাঁর মনে হল, এমনও ত হওয়া সম্ভব, দ্বারিকের কোন শত্রু জামগাছে চড়ে তাকে ভয় দেখাচ্ছে! গ্রামদেশে যখন ভূত আছে, তখন ভৌতিক উপদ্রবও থাকবে। কিন্তু ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, উপদ্রবটা আর কারো উপর না হয়ে দ্বারিকের উপরই হচ্ছে।

পরেশবাবু ভাবলেন—লোকটা পাষণ্ড। ফুলবিহার বাড়ীখানি ওর কোন কাজে লাগছে না অথচ বাড়ীখানি সে বিক্রী করতে রাজী নয়। খড়ের গাদায় কুকুরের গল্পের কথা মনে পড়ল তাঁর।

পরদিন সুরথ এলে পরেশবাবু বললেন: দ্বারিক ফুলবিহার বিক্রী করতেও রাজী নয়, সুরথ!

সুরথ বললে: সে আমি আগেই জানতাম।

পরেশবাবু বললেন: ফুলবিহারের আশা মন থেকে মুছে ফেল। আমি ভাবছিলাম কি সুরথ, আমার বাঁশবাগানটা সাফাই করে সেখানে আমরা ইস্কুল-বাড়ী তৈরী করব।

সুরথ বললে: বাঁশবাগানটা নষ্ট করে ফেলবেন?

পরেশবাবু বললেন: আমরা থাকি বিদেশে। বাঁশবাগানের উপস্বত্ব পাঁচ ভূতে লুটে খায়। আমাদের কোন কাজেই লাগে না বাঁশবাগান।

সুরথ হেসে বললে: অন্যত্র আমরা বাড়ী খুঁজে নোব পরেশ-

কাকা, বাঁশবাগানটা নষ্ট করব না। আপনার কাজে না লাগলেও, গাঁয়ের গরীবদের কাজে লাগছে আপনার বাঁশবাগান।

: তা ঠিক, তা ঠিক।...পরেশবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন: তা, ইস্কুল-বাড়ীর কথা পরে ভাবা যাবে'খন। এখন আমাদের কাজ সুরু করতে কি কি জিনিসপত্রের দরকার, তার একটা লিস্ট করা যাক। ...তারপর গলা ছেড়ে বললেন: দু'কাপ চা নিয়ে আয় মা!

সুরুচি চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সুরথ হেসে বললে: এ কি! চাইতে না চাইতেই চা নিয়ে হাজির!

পরেশবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন: Basic crafts-এর ভেতর weaving, spinning, carpentry, village architecture ও agriculture—এই ত?

সুরুচি বললে: ড্রইং ও গানের ক্লাস ত তুমিই চালাতে পার বাবা!

: সে হবে'খন।...পরেশবাবু বললেন।

সুরথ বললে: আর সমবায় দোকান।

সুরুচি তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বসে বললে: সবই ত ঠিক হল। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী কোথায়?

পরেশবাবু বললেন: কেন গাঁয়ে ছেলেমেয়ের কি অভাব আছে কিছু?

সুরুচি হেসে বললে: তা ত নেই। কিন্তু তারা আমাদের পাঠশালায় আসবে কেন? পনের দিন চেষ্টা করেও পাঁচটা মেয়ে জুটাতে পারলাম না আমি।

সুরথ মাথায় হাত দিয়ে বললে : সেটা একটা সমস্যা বটে।

পরেশবাবু বললেন : সমস্যা যখন, সমস্যার সমাধানও আছে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে ছেলেমেয়ে যোগাড় করব। তোমরা এ নিয়ে নিরাশ হয়ো না সুরথ! আগে সব জিনিসপত্র আসুক—বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালু হতে দেরী লাগবে না।

সুরুচি বললে : পণ্ডিতমশাইকে দলে আনতে পারলে ছাত্র-সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এক্ষুণি।

পরেশবাবু বললেন : পণ্ডিতমশাইর জন্য আমাদের পাঠশালা আটকাবে না, এ তোমরা ঠিক জেনো।

প্রত্যাখ্যান

পণ্ডিত পাঠশালা সম্বন্ধে সহসা অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠল। আজকাল একদিনও পাঠশালা কামাই করে না। ছাত্রেরা পাঠশালায় আসার আগেই নিজে পাঠশালায় এসে বসে থাকে। দ্বারিকের দলিল-পত্র লেখার কাজটা পণ্ডিত আজকাল রাত্রেই করে। যতদূর সম্ভব ছেলেদের মার-ধরও করে না।

পরেশবাবুর সাহায্যে স্থরথ গাঁয়ে নতুন পাঠশালা করবেই—এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতের আর কোন সন্দেহ ছিল না। স্থরথকে কাবু করবার একমাত্র উপায় ছেলেদের আটকে রাখা। দু'মাস, চার মাস, ছ'মাস—ছেলে না জুটলে নতুন পাঠশালা উঠে যেতে বাধ্য। সেজন্যই পণ্ডিত পাঠশালা সম্বন্ধে সহসা মনোযোগী হয়ে উঠেছে।

সেদিন পাঠশালায় গোপাল বললেঃ পণ্ডিতমশাই, নতুন পাঠশালার জন্য অনেক জিনিসপত্র এসেছে।

ঃ জিনিসপত্র মানে?···পণ্ডিত দড়িবাঁধা চশমার ফাঁকে গোপালের দিকে তাকিয়ে বললে।

গোপাল বললেঃ হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই! চরকা, তাঁত, আর কি সব পরেশবাবুর বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম।

পণ্ডিত রেগে বললেঃ কেন তুই ওখানে গেছলি?

গোপাল উত্তর দিল না, অপরাধীর মত মাথা নীচু করল।

পণ্ডিত টেবিল চাপড়ে বললেঃ তোমাদের ভেতর যারা নতুন ইস্কুলে যাবে ঠিক করেছ, হাত তোল।

কেউ হাত তুললে না। পণ্ডিত বাবলুর দিকে তাকালঃ তুমি?

বাবলু নিজের জায়গায় উঠে দাঁড়াল।

পণ্ডিত বললেঃ শুনেছি সুরথের সাথে বাবলুর ভাব। বিশ্বাস-ঘাতকতা সবার আগে বাবলুই করবে আমি জানি।

বাবলু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

পণ্ডিত ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেঃ তোমাদের শাসন করি বলে হয়ত তোমরা আমার উপর চটে আছ। শাসন করি ত তোমাদের ভালর জন্যই, কেমন গোপাল?

গোপাল মাথা নেড়ে সায় দিলে।

পণ্ডিত বলতে লাগলঃ বাড়ীতে মা-বাবা শাসন করে বলে কি কেউ নিজের বাড়ী ছেড়ে পরের বাড়ী চলে যায়?

বাবলু এতক্ষণ বাদে উত্তর দিলেঃ নতুন ইস্কুলে আমি যাব বলি নি ত পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলঃ এ-পাঠশালা তোমাদের নিজের। নিজের পাঠশালা ছেড়ে কেন তোমরা পরের পাঠশালায় যাবে?

একদল ছেলে সমস্বরে বললেঃ আমরা কক্ষণো যাব না, পণ্ডিত-মশাই!

পণ্ডিত খুসী হয়ে বললেঃ এই ত ছেলের মত কথা হল।...

ভোলা, দেড়কুড়ি শেয়ালের ত্রিশখানি ল্যাজ। একটা শেয়ালের ক'টা ল্যাজ ?…শীগ্‌গির।

ভোলা বললে : দেড়খানি।

: গর্দ্দভ !…পণ্ডিত বললে : শেয়ালের ল্যাজ একটা হয়, তা-ও জান না ! মাথায় গোবর ভর্ত্তি—শুধু গোবর।…আচ্ছা, এবার সাহিত্যের বই নাও ত গোপাল !

গোপাল নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বে সাহিত্যের বই খুললে। পণ্ডিত বললে : ঐ ত মুস্কিল ! পড়ার কথা বললেই তোমাদের মুখ আমসি হয়ে যায়। তোমরা পড়া শিখে আস না বলেই ত আমার পাঠশালায় আসতে ভাল লাগে না।

বাবলু উঠে দাঁড়িয়ে বললে : আমি পড়া শিখে এসেছি পণ্ডিতমশাই !

: শিখেছিস্ ?…পণ্ডিত খুসী হয়ে বললে : বেশ বাবা বেশ। বাবলু আমার লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেছে আজকাল। পদ্যটি মুখস্থ বল ত বাবলু !…

বিকালবেলা পণ্ডিত দ্বারিকের বাড়ী আসতেই দ্বারিক বললে : এই যে পণ্ডিত তুমি এসেছ। রহিমের দলিলখানির ম্যাদ বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে, একটু ভাল করে দেখ ত।

জনকয়েক চাষী উঠানে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। দ্বারিক একখানি পুরানো দলিল দেখছে। মুখ তুলে বললে : কেন তোমরা বসে আছ ? টাকা আমি ত আর বানাতে পারি নে।

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললে : মহাজন ! কথা শোন।

দ্বারিক বিরক্তস্বরে বললে ঃ আবেদন-নিবেদনে কিছু কাজ হবে না। বলেছি ত, টাকা আমার হাতে নেই।

মূরত বললে ঃ মহাজন, বীজের অভাবে চাষের জমিটা পড়ে থাকবে। তুমি না দিলে কার কাছে যাই বল!

দ্বারিক ভেংচি কেটে বললে ঃ পড়ে থাকল ত আমার বাপের কি! সামান্য যা পুঁজি ছিল, তোরা নিয়ে আটকে রেখেছিস্। আবার টাকা চাইতে এসেছিস্! লজ্জা করে না? তোরা ফিরিয়ে না দিলে, টাকা আমি কোথায় পাই বল্।

শরাফত বললে ঃ এবারকার ফসলটা ঘরে তুলে, না খেয়েও আপনার ঋণ শোধ করব মহাজন!

দ্বারিক উঠে দাঁড়িয়ে বললে ঃ টাকা নেবার বেলা সবাই অমন লম্বা-চৌড়া কথা বলে। কিন্তু টাকা নিয়ে গেলে তখন আর টিকিটিও ধরবার জো নেই! খাতকদের বাড়ী বাড়ী ধর্না দিয়ে আমার পায়ের তলা ক্ষয়ে গেল।

বার দুই পায়চারি করে দ্বারিক বললে ঃ মোটকথা টাকা আমার হাতে নেই। যারা ধার নিয়েছিল কেউ ফিরিয়ে দিচ্ছে না। লেন-দেন না হলে মহাজনী কারবার চলে?

পণ্ডিত দাওয়ায় মাদুরে বসেছিল। বললে ঃ টাকা সত্যি-সত্যিই মহাজনের হাতে নেই, শরাফত ভাই!

দ্বারিক পণ্ডিতকে বললে ঃ তারপর—ওদিককার খবর কি? আজ যেন পাঠশালা একটু তাড়াতাড়ি ছুটী দিলে!

: তা দিলাম।...পণ্ডিত বললে: ছেলেরা চাইলে তাই দিলাম।

দ্বারিক বললে: নতুন পাঠশালা নাকি এ-হপ্তায় সুরু হবে শুনলাম।

পণ্ডিত বললে: পাঠশালা ত চালু করবে, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী কোথায়?

দ্বারিক বললে: ছেলেরা যদি নতুন পাঠশালায় যায় তুমি আটকাবে কেমন করে?

পণ্ডিত শরাফতের দিকে তাকিয়ে করুণস্বরে বললে: শরাফত ভাই, তুমিই বল—গাঁয়ে একটা পাঠশালা থাকতে আর একটা পাঠশালা কেন?

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললে: ভাববার কথা বটে।

পণ্ডিত বলতে লাগল: যে পাঠশালায় তুমি আখর শিখেছ, তোমার ছেলে শিখেছে—তোমার নাতি শিখছে, সুরথের মুখের কথায় আজ তিন পুরুষের পাঠশালা ভেঙ্গে দেবে? আমি নাকি পড়াতে পারি না!

নূরত বললে: ছেলে আমরা ওখানে পাঠাচ্ছি না।...আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, শুনলাম ওখানে ছেলেমেয়েদের নানা রকম হাতের কাজ শেখানো হবে, সত্যি নাকি?

পণ্ডিত বললে: আমরাও সে-সব কথা শুনেছি। তাঁতির ছেলে তাঁত চালানো পাঠশালায় শিখবে, এর চেয়ে আর হাসির কথা কি হতে পারে!

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললে: সাচ্। তাঁতির ছেলে তাঁতি।

ছুতোরের ছেলে ছুতোর। এর জন্য আবার পাঠশালায় পড়ার দরকার হয় না।

দ্বারিক এতক্ষণ দলিল ঘাঁটতে ঘাঁটতে এদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। বললে: আর তাঁতের কাজ শিখেই বা কি লাভ বল। এ গাঁয়ে কত তাঁতিই ত ছিল। মিলের কাপড় একে একে সবাইকে নির্ব্বংশ করল। বাকী আছে একজন—আমাদের রাখালচন্দ্র।

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললে: বে-ফায়দা—বিলকুল বে-ফায়দা।

দ্বারিক গলার স্বর নামিয়ে বললে: ও-সব হুজুগে' পাঠশালা ঢের দেখেছি। দু'দিন বাদে পাঠশালা-ঘরে তালাবন্ধ করে সবাই যে যার পথে সরে পড়বে। মাঝখান থেকে পণ্ডিতের পাঠশালাটিও উঠে যাবে। তখন এই বুড়ো বয়সে পণ্ডিত যাবেই বা কোথায় আর করবেই বা কি?

মূরত সায় দিয়ে বললে: এক হিসেবে আপনি ঠিকই বলেছেন মহাজন! ঐসব বাইরের লোকের উপর আদৌ বিশ্বাস রাখা যায় না।

শরাফত বললে: ছেলে-মেয়ে আমরা পাঠাচ্ছি না, এ-কথা ঠিক।

পণ্ডিত খুসী হয়ে দ্বারিকের কানের কাছে মুখ এনে বললে: আমি বলি কি মহাজন, টাকা কিছু এদের দিয়ে দাও। লোক এরা ভাল।

দ্বারিক এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে, পিতলের ঝাঁপি খুলতে খুলতে বললে: শরাফত, মূরত—এবারও আমি তোমাদের ধার দিচ্ছি।

সুদ ও-ই, বেশী নোব না। কিন্তু ফসল ঘরে তুলে শোধ করা চাই, মনে থাকে যেন। যদি ফিরিয়ে না দাও, আমিও শেষ, তোমরাও শেষ।

শরাফত খুসীতে দাঁড়ি নেড়ে বললেঃ হ্যাঁ মহাজন, শেষ যখন হব, সবাই একসাথে শেষ হব।

দ্বারিক টাকা গুণতে গুণতে চমকে উঠলঃ কি—কি বললে শরাফত মিঞা ?

পণ্ডিত মাদুরে উপুড় হয়ে বসে, দলিল লিখতে লাগল।

সকালবেলা দাওয়ায় বসে পণ্ডিত তামাকু সাজছিল। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে সুরথকে দেখে ঘৃণায় তার ভুরু কুঁচকে এল। সামনে সুরথ দাঁড়িয়ে। সুরথ হাসিমুখে বললেঃ বসতে পারি ?

পণ্ডিত তীব্রস্বরে বললেঃ নাই বা বসলে এখানে সুরথ ! আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করবার বন্দোবস্ত ত পাকাপাকি করে এনেছ। আবার এখানে কেন ?

সুরথ দাওয়ায় বসে বললেঃ আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, সেদিন আপনি আমাকে আপন-ভোলা বলেছিলেন। দু'দিনেই আপনার মত পরিবর্ত্তন কেন হল বলুন ত !

পণ্ডিত উত্তর দিল না।

সুরথ আবার বললেঃ আপনি সত্যি-সত্যিই আমাকে মন্দলোক ভাবেন—একথা আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।

পণ্ডিত বিদ্রূপ করে বললেঃ পণ্ডিত সরল মানুষ বটে, কিন্তু বোকা না—একথা জেনে রেখো স্থরথ!

স্থরথ বললেঃ আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করবার জন্য পাঠশালা করছি—একথা কেন আপনি ভাবছেন বুঝি না। প্রতিযোগিতাই যদি করব ত—

স্থরথ কথা শেষ না করতেই পণ্ডিত বললেঃ আমিও ত তাই বলি। পাঠশালা করতে চাও—যে গাঁয়ে পাঠশালা নেই, সেখানে গিয়ে কর। এখানে কেন?

স্থরথ এক মুহূর্ত্ত ভেবে বললেঃ নতুন পাঠশালা আমি করব না পণ্ডিতমশাই! আপনার পাঠশালায় বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করব।

পণ্ডিত তীব্রস্বরে বললেঃ এও তোমার এক চাল। আসলে তুমি আমার পাঠশালার ছেলেদের হাতের মুঠায় আনতে চাও।

স্থরথ হাতজোড় করে বললেঃ দোহাই আপনার পণ্ডিতমশাই! ব্যাপারটা একবার ভাল করে তলিয়ে দেখুন। আমার প্রতি অবিচার করুন দুঃখ নেই, কিন্তু গ্রামের ছেলেদের উপর অবিচার করবেন না।

পণ্ডিত কিছুক্ষণ নীরবে হুঁকা টানতে লাগল। নিজের পাঠশালায় একদিন না এলেও কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। নিজের স্থবিধামত পাঠশালায় আসা-যাওয়া, টেবিলে পা তুলে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া,—ভাবতে ভাবতে পণ্ডিতের ভুরু কুঁচকে গেল। স্থরথদের ডেকে আনা…সাধ করে ঘরে সাপ ঢুকতে দেওয়া আর কি!

নতুন পাঠশালা

পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে বললেঃ তোমাদের বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি মাথায় থাক। এতকাল এ পাঠশালা যেমন চলেছে, আজও তেমনি চলবে। এখানে নতুনত্বের কোন স্থান নেই। আমি সেদিনও বলেছি সুরথ, আমি তোমার দলে যেতে পারব না।

ঃ পণ্ডিত মশাই !···শেষবারের মত সুরথ আবেদন করল।

ঃ আমি অপারগ !···পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে বললেঃ আমায় মাপ কর সুরথ। যাই, পাঠশালার বেলা হল।

সুরথ আস্তে আস্তে পথে নেমে এল। পণ্ডিতকে দলে টানা অসম্ভব ! দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরথ ভাবল।

বাবলু ও ভোলা বই-পত্র নিয়ে পাঠশালায় চলেছে। সুরথ দূর থেকে ডাকলেঃ এই বাবলু !

বাবলু ও ভোলা ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল। সুরথ এগিয়ে এসে বললেঃ পাঠশালায় যাচ্ছ বুঝি ।···বেশ ! পাঠশালা ছুটী হলে ছেলেদের নিয়ে একবার পরেশবাবুর বাড়ী এস। কেমন ?

ভোলা মাথা নেড়ে বললেঃ না।

সুরথ বিস্মিতস্বরে বললেঃ না মানে ?

ভোলা বললেঃ আপনার ইস্কুলে আমরা কেউ যাব না।

সুরথ হাসি গোপন করে বললেঃ তোমরা না গেলে আমার ইস্কুল চলবে না, তখন আমাদের কি হবে ?

ভোলা বললেঃ চলবে না ত আমরা কি জানি।

সুরথ বাবলুর দিকে ফিরে বললেঃ তুমি কি বল বাবলু ?

নতুন পাঠশালা

বাবলু মাথা নীচু করে বললেঃ পণ্ডিতমশাইর কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, নতুন পাঠশালায় যাব না।

ঃ ও!···সুরথ বললে।

ভোলা বললেঃ নিজের পাঠশালা ছেড়ে কেউ কখনো পরের পাঠশালায় যায়?

সুরথ কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

নতুন পাঠশালার জিনিসপত্র এসে গেছে। সুরথ ও সুরুচি ইস্কুল-ঘর সাজাতে ব্যস্ত। পরেশবাবু চাষীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে নতুন পাঠশালার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। চাষীরা সুরথ ও পরেশবাবুর প্রশংসা করে নতুন পাঠশালায় ছেলে-মেয়ে পাঠানোর কথাটা ধামা চাপা দিলে। ইস্কুল-পাঠশালা নিয়ে চাষীদের মাথা ঘামানোর সময় নেই। দু'পাতা বই পড়ে চাষীর ছেলের এমনকিছু সাতপুরুষ উদ্ধার হয় না।

ভরত, রহিম, গোবিন ও মুরত মাঠে কাজ করছিল। পরেশবাবু তাদের কাছে আলের উপর এসে দাঁড়ালেন।

ঃ আমাদের নতুন পাঠশালার কথা তোমরা শুনেছ বোধ হয়।··· ভূমিকা না করেই পরেশবাবু বললেন।

ভরত বললঃ তা আর কে না শুনেছে! সুরথবাবু ছাড়া কে আর গাঁয়ে স্বদেশী ইস্কুল করবে?

নতুন পাঠশালা

রহিম বললেঃ যারা কখনো শুনত না, মহাজন, কবিরাজ আর পণ্ডিত বাড়ী বাড়ী ঘুরে তাদেরও শুনিয়েছে।

ঃ ওরা নতুন পাঠশালায় ছেলে পাঠাতে মানা করেছে ত?… পরেশবাবু বললেন।

গোবিন বললেঃ ওরা মানা করলেই আমরা ছেলে পাঠাব না, এমন কোন কথা না।

পরেশবাবু খুসী হয়ে বললেনঃ সত্যিই ত। কেন তোমরা ওদের কথায় উঠ-বস করবে? নিজে যা ভাল মনে কর, তাই কর।

তারপর কেশে গলা সাফ করে নতুন পাঠশালার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা মনে মনে তৈরী করে বললেনঃ নতুন পাঠশালা সম্বন্ধে ওরা তোমাদের কি বলেছে জানিনে, কিন্তু—

মুরত বললেঃ এক হিসাবে আপনারা আমাদের ভালর জন্য পাঠশালা করছেন, সে কি আর আমরা জানি না? তবে কিনা চাষা-মজুরের ছেলের লেখাপড়ায় অত কাজ কি?

পরেশবাবু বললেনঃ নতুন পাঠশালায় লেখাপড়ার চেয়ে ছেলেরা কাজকর্ম্মই শিখবে বেশী।

রহিম বললেঃ কথাটা হচ্ছে এই,—

বাধা দিয়ে ভরত বললেঃ বুঝলেন পরেশবাবু আমাদের পণ্ডিত-মশাইর পাঠশালাই ভাল। এতদিন ধরে পণ্ডিতমশাই পাঠশালা চালাচ্ছেন, এখন হঠাৎ ত আর তাঁর পাঠশালায় ছেলে পাঠানো আমরা বন্ধ করতে পারি না।

রহিম বাধা দিয়ে বললেঃ পণ্ডিতমশাইর পাঠশালা উঠে যাক, আমরা কেউ-ই তা চাইনে।

পরেশবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেনঃ তা আমরাই কি চাইছি? নতুন পাঠশালা চালু হলে, পণ্ডিতমশাইও আমাদের সাথে যোগ দেবেন, এ তোমরা জেনে নিয়ো।

মূরত বললেঃ এক হিসাবে কথাটা ঠিক। কিন্তু পণ্ডিতমশাইকে আপনারা জানেন না। ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। তা ছাড়া দ্বারিক মহাজন ও কবিরাজ ওর পেছনে রয়েছে।

রহিম বললেঃ চাষীর ছেলে যাকে লাঙ্গল ঠেলতে হবে—অত নতুন পাঠশালা—পুরানো পাঠশালা করে কাজ কি তার? তবে হ্যাঁ, ছেলেরা যদি আপনার পাঠশালায় যায়, আমরা কি আর তাদের মানা করব?

ভরত বললেঃ কিন্তু আমরা তাদের পুরানো পাঠশালা ছেড়ে যেতে বলতে পারব না।

বাড়ী ফিরে পরেশবাবু মাথায় হাত দিয়ে গুম হয়ে বসলেন। সুরথ ঘরে ঢুকে পরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেঃ ব্যাপার কি পরেশকাকা!

পরেশবাবু নিশ্বাস ছেড়ে বললেনঃ না, হল না। সবই পণ্ডশ্রম হল দেখছি। নতুন পাঠশালায় গাঁয়ের কেউ ছেলে পাঠাবে না।

সুরথ বললেঃ কেউ রাজী হল না?

পরেশবাবু বললেনঃ কেউ না। কেউ আমাদের স্ব-পক্ষে নেই।

নতুন পাঠশালা

বাড়ী বাড়ী ঘুরে ক্যান্‌ভাস্‌ করলাম—চাষীদের মিনতি জানালাম। কিন্তু বৃথাই, সুরথ! পণ্ডিতের দল চাষীদের মাথা খেয়েছে।

সুরথ বসে পড়ে বললেঃ কি বলে তারা?

পরেশবাবু বললেনঃ বললে—অবশ্য একটু ঘুরিয়ে,—যেখানে ছেলে যাচ্ছে, সেখানেই যাবে। পাঠশালা নতুন হোক পুরাতন হোক ওদের কিছু আসে যায় না, কিন্তু ওরা পণ্ডিতমশাইকে অসন্তুষ্ট করতে চায় না।

সুরুচি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুরথ বললেঃ এক কাপ চা, রুচি!

সুরুচি হেসে বললেঃ খবরটা শুনে গলা শুকিয়ে গেল নাকি? কিন্তু এর চেয়েও সুসংবাদ আছে। দ্বারিক মহাজন নাকি আমাদের বিরুদ্ধে সদরে রিপোর্ট করতে গেছে, আমরা গাঁয়ে স্বদেশী ইস্কুল সুরু করেছি।

পরেশবাবু বিস্মিতস্বরে বললেনঃ বলিস্‌ কি!···আমার জন্যও এক কাপ চা দিবি, রুচি!

সুরুচি হেসে বললেঃ আর আমার জন্য এক কাপ—এই তিন কাপ। কিন্তু, গলা আমার শুকায় নি মোটেই।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে পরেশবাবু বললেনঃ আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? ছেলেদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে—

বাধা দিয়ে সুরথ বললেঃ উঃ-হুঁ। ছেলেরা নতুন পাঠশালায় আসতে কিছুতেই রাজী নয়। আমি দু'-একটা ছেলেকে বলেছিলাম। মুখের উপর জবাব দিলে।

পরেশবাবু হতাশস্বরে বললেন : তবে ?

সুরথ বললে : ভাবতে দিন, পরেশকাকা !

সুরুচি বললে : পাঠশালার opening date কবে ?

: ছেলে-মেয়ে না জুটলে কাকে নিয়ে পাঠশালা open করবে রুচি ?…পরেশবাবু হতাশস্বরে বললেন ।

সুরুচি বললে : Opening date-এ ছেলে-মেয়ে ডেকে আনার ভার আমি নিলাম । অবশ্য পরবর্ত্তী দায়িত্ব তোমাদের ।.

সুরথ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে সুরুচির দিকে তাকাল । বললে : কেমন করে ?

সুরুচি বললে : সময়মত জানতে পাবে । আগে তারিখ ঠিক কর ।

পথের ধারে ছোট্ট ফাঁকা জমিটুকুতে ছেলেরা কপাটি খেলছিল । কিন্তু যেমন সচরাচর হয়ে থাকে, খেলা শেষ হবার আগে আজও দু'দলে তেমনি ঝগড়া বাধল, আর পরক্ষণেই সুরু হল মারামারি, কুস্তি, হল্লা ও চীৎকার ।

এক পাশে ছোট্ট একটি ইটের স্তূপ । ইটগুলো কবে কে এখানে রেখেছিল, আজ কেউ বলতে পারে না । স্তূপের উপর মাটি জমে ইটের ফাঁকে ফাঁকে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়েছে । অতর্কিতে ধাক্কা খেয়ে বাবলু ইটের উপর এসে পড়ল । স্তূপের উপরকার একখানি ইটে মাথা ঠুকে গেল বাবলুর ।

গোপাল চেঁচিয়ে উঠল ঃ রক্ত ! বাবলুর মাথা ফেটে গেছে।

ভোলা ভীড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে রক্ত দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাবলুর সামনে। মুহূর্ত্তে ছেলেদের হল্লা থেমে গেল। কারো মুখে কথা নেই।

বাবলু কপালে হাত দিতেই, হাতের আঙ্গুল রক্তে ভিজে গেল। রক্ত দেখে কেমন যেন বাবলুর মাথা ঘুরে গেল।

গোপাল ভোলার দিকে সরে এসে বললে ঃ তুই-ই ত ওকে ধাক্কা মেরেছিস্।

ভোলা খিঁচিয়ে উঠল ঃ বেশ করেছি।

সত্যি, আজ বাবলুই প্রথমে মারামারি সুরু করেছিল। খেলায় হেরে গিয়ে ভোলাকে সে কষে এক চড় লাগালে। আর যায় কোথায়, ভোলা বাবলুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই ভোলা ও বাবলুর দলের ভেতর গৃহযুদ্ধ সুরু হল।

গোপাল ঝুঁকে পড়ে বাবলুর কপালের ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললে ঃ না, বেশী কাটে নি।

বাবলু উত্তর দিল না।

সহসা ভোলার দৃষ্টি পড়ল—মহাজন ও পণ্ডিত আসছে। এই অবস্থায় পণ্ডিতের সামনে পড়লে, কাল পাঠশালায় সবাইকে শাস্তি পেতে হবে, তাই ভোলা ফিস্-ফিস্ করে গোপালকে বললে ঃ দেখ।—

ঃ পণ্ডিতমশাই !···গোপাল চাপাস্বরে বললে ঃ পালা, পালা সব।

পরক্ষণেই সব ছেলেরা উল্টো পথে পালাতে লাগল। এমন কি

শাড়ীর আঁচল ভিজিয়ে পুকুর থেকে জল এনে· পৃঃ ১৫১

গোপালও আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না। শুধু রইল বাবলু ইটের স্তূপে স্তব্ধ হয়ে বসে।

একটু বাদেই পণ্ডিত ও মহাজন বাবলুর সমুখ দিয়ে চলে গেল। গোধূলির ধূসর ছায়ায় ইটের স্তূপের আড়ালে আধখানা ঢাকা বাবলুকে তারা দেখতে পায় নি।

বাবলু হয়ত আরো কিছুক্ষণ বসে থাকত এমনিভাবে। সহসা পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে গোপা।

ঃ এখানে চুপ করে বসে আছিস্ কেন বাবলু ?···গোপা বাবলুর দিকে এগোতে এগোতে বললেঃ জানিস্ এই ইটের স্তূপের নীচে গোখরো সাপ আছে !

বাবলু উত্তর দিল না। গোপা বাবলুর সামনে এসে কপালে রক্ত দেখতে পেয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলঃ রক্ত! কে মেরেছে ?

বাবলু নীরব। গোপার চোখে জল এসে পড়ল। ছুটে গিয়ে ছোট্ট শাড়ীর আঁচল ভিজিয়ে পুকুর থেকে জল এনে বাবলুর কপাল মুছে দিয়ে বললেঃ কে মেরেছে ?

বাবলু উঠে দাঁড়াল ; বললেঃ অনেকখানি কেটে গেছে, না ?

গোপা বললেঃ না, বেশী কাটে নি।

ঃ রক্ত পড়ছে এখনো ?···বাবলু আবার শুধাল।

গোপা বললেঃ না। রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কাটল কি করে ?

ঢপে

বাবলু গম্ভীরভাবে বললে ঃ পড়ে গেছলাম।

গোপা রেগে বললে ঃ কে ফেললে তোকে ইটের উপর ?

বাবলু বললে ঃ কেউ ফেলে নি, পা ফস্‌কে পড়ে গেলাম।

গোপা বাবলুর কথা অবিশ্বাস করে বললে ঃ ইটের উপর উঠতে গেলি কেন, শুনি ?

ঃ এমনি।···বাবলু বললে ঃ ফুলবিহারে যাবি ?

ঃ না বাব্‌বা।···গোপা মাথা নেড়ে বললে ঃ আর কখনো দ্বারিকের বাগানে যাব না। সেদিন যা মার খেয়েছি।

বাবলু রেগে বললে ঃ তবে তুই যাস্‌নে—আমি যাব।

ঃ একা ?···গোপা বললে ঃ এই সন্ধ্যাবেলা একা ওখানে কি করবি ?

বাবলু বললে ঃ যা খুসী করব, তোর কি ?

গোপা বললে ঃ বাড়ী আয়। কপালে একটুখানি গ্যাঁদাপাতার রস লাগিয়ে দি' আগে, তা না হলে আবার রক্ত পড়বে।

বাবলু বললে ঃ চাই না তোমার গ্যাঁদাপাতার রস, পড়ুকগে' আমার রক্ত।

কথা বলতে বলতে তারা গোপাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছিল।

ঃ কার সঙ্গে কথা কইছিস্ গোপা ?···বলতে বলতে গোপার মা বাইরে বেরিয়ে এল।···বাবলুকে দেখে বললে ঃ এ কি! তোর কপালে যাচ্ছে ?

শাড়ীর আঁচল ভিজিয়ে

গোপা বললে: পথের ধারে ইটের উপর পড়ে গেছল মা! গ্যাঁদাপাতার রস লাগিয়ে দোব বলে ডেকে আনলাম।

গোপার মা বাবলুর ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললে: গোপা ফেলে দেয় নি ত, হ্যাঁ বাবা!

বাবলু হেসে বললে: না মাসীমা!

কথাটা গোপার মার তবু বিশ্বাস হয় না। গোপার দিকে ফিরে বললে: দস্যিমেয়ে, তুই-ই ওকে ফেলেছিস্। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে দিচ্ছি। শুয়ে থাক বাবা! রক্তটা ভাল করে বন্ধ হয়ে যাক, তখন বাড়ী যাবে।

গোপা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে: তোমার ত সব কিছুতেই আমার দোষ দেওয়া। আমি কেন ফেলতে যাব ওকে?

গোপার মা বললে: নে, আর তর্ক করিস্‌নে। উঠান থেকে গ্যাঁদাপাতা তুলে আন।...তুমি বস বাবা, আমি এক্ষুণি পুকুরঘাট থেকে আসছি।

সন্ধ্যা নামল। গোপার মা জল আনতে পুকুরঘাটে গেল। গোপা উঠানে গ্যাঁদা ফুল তুলছে। বাবলু দাওয়ায় মাদুরে বসে উস্-খুস্ করতে লাগল। ন্যাপী ও হারু হয়ত এতক্ষণে নারকেলগাছের নীচে এসে তার জন্য অপেক্ষা করছে। আজ সন্ধ্যায় দ্বারিকের নারকেলগাছ খালি করবে তারা।

আস্তে আস্তে বাবলু উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর শিল-নোড়ায় গ্যাঁদাপাতার রস তৈরী করছে গোপা। পা টিপে টিপে

নতুন পাঠশালা

বাবলু বাড়ীর বাইরে এসে, এক দৌড়ে অন্ধকার পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গোপা ঘর থেকে বললেঃ বাড়ী গিয়ে মাসীমাকে কি বলবি, বাবলু?...সাড়া না পেয়ে বললেঃ ঘুমিয়ে পড়েছিস্ নাকি!

তবু বাবলুর সাড়া নেই। অবশেষে গোপা গ্যাঁদাপাতার রস নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। কোথায় বাবলু! গোপা বারান্দা, উঠান ও ঘরের ভেতর তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগল।

ঘাট থেকে মা জল নিয়ে ফিরে এল। গোপা বললেঃ মা, বাবলু পালিয়েছে।

মা বললেঃ পালিয়েছে ত আমি কি করব?

জলের কলসী নীচে নামিয়ে রেখে বললেঃ আর ছেলেটাও কেমন, ওষুধ না লাগিয়েই চলে গেল! মরুকগে।

উঠানের উপর গ্যাঁদাপাতার রস ও থ্যাতলানো পাতাগুলো ছুড়ে মারলে গোপা। রাগে অভিমানে তার চোখে জল এল।

হাটে মোটে বিক্রী নেই। গামছার গাঁট ফিরিয়ে নিয়ে বাড়ী চলেছে রাখাল। ক্লান্তিতে তার পা-দুখানি ভেঙ্গে আসছে। এক পয়সা আয় নেই, তবু সংসার চালাতেই হয়।

ঘরে ধান-চাল বাড়ন্ত। গামছা বিক্রীর আয়ের উপর ছিল ভরসা। গামছাও যদি বিক্রী না হয়, সংসার চলে কেমন করে? বাবলুর মার শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ওষুধ-পত্রের একটা কিছু ব্যবস্থা

করা চাই। এদিকে দ্বারিক মহাজনের টাকা এ মাসেই শোধ দিতে হবে। দুশ্চিন্তার উপর দুশ্চিন্তা।

ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলেছে রাখাল। গাঁয়ের চাষীরা একে একে রাখালকে পিছু ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে কেউ বা দু'একটা কথাও কইলে রাখালের সাথে।

ঃ এমন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলেছ কেন রাখাল ভাই? বিক্রী তেমন হয় নি বুঝি?···একজন শুধাল।

রাখালকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে সে-ই বললে: ব্যবসা মন্দা হলে, মনে ফূর্ত্তি থাকে না। তাই শরীরও খারাপ হয়। আচ্ছা রাখাল ভাই, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

রাখালকে পিছু ফেলে এগিয়ে যায় সে।

সবার পিছু পিছু রাখাল যখন বাড়ী ফিরে, বেশ খানিকটে রাত হয়েছে। গামছার গাঁটটি নীচে নামিয়ে রেখে রাখাল এক মুহূর্ত্ত দাওয়ায় চুপ-চাপ বসে থাকে। রাখালের ভাব-ভঙ্গী দেখে টবু-বুবুও আজ চুপ করে থাকে। তাদের মা নীরবে তামাকু সেজে নিয়ে আসে। রাখাল হুঁকো টানে—গুড়ুর-গুড়ুর-গুড়ুৎ।

তামাকের ধোঁয়ার সাথে ওর মনের উত্তাপ ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যায়। বলে: না, তাঁত চালিয়ে আর খেতে হবে না। হাটে এক পয়সা বিক্রী নেই।

বাবলুর মা ভরসা দিয়ে বলে: কাল মঙ্গলচণ্ডীর হাটে গেলে নিশ্চয়ই বিক্রী হবে, তুমি ভেবো না।

নতুন পাঠশালা

রাখাল বললেঃ দু'কোশ হেঁটে মঙ্গলচণ্ডীর হাটে গিয়েও কোন ফায়দা হবে না বাবলুর মা! টিঁকসই সস্তাদরের জাপানী মারকিনে বাজার ছেয়ে গেছে। আমার গামছা আর কে কিনবে বল!

বাবলুর মা বললেঃ কেন ভাবছ? গামছা বিক্রী হবেই। আমি বাবলুকে হাটে পাঠাব কাল।

ঃ ভাবছি ত বাবলুর মা!...রাখাল বললেঃ কিন্তু ভেবে আর কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না। গাঁয়ের বাস উঠিয়ে এবার সহরে কাজের খোঁজে বেরোতে হবে।

ঃ কপালে যা আছে তাই হবে। ভেবে আর কি লাভ?

ঃ হুঁ। বাবলু কোথায়?

এবার বাবলুর মা প্রমাদ গণলে। সেই যে বিকালবেলা বাবলু বেরিয়েছে এতখানি রাত হল ফিরবার নামটি নেই। আজ বাবলুর কপালে দুঃখ রয়েছে।

রাখাল চেঁচিয়ে ডাকলেঃ বাবলু!

কোন সাড়া না পেয়ে বললেঃ এখনো বাড়ী ফেরে নি, না?

বাবলুর মা চুপ করে আছে দেখে বললেঃ রাত এতখানি হল, বাবুর বাড়ী ফেরার নাম নেই। এমন আড্ডাবাজ ছেলেকে নিয়ে আমি কি যে করব!

সহসা গলার স্বর চড়িয়ে রাখাল বললেঃ বাড়ী আসুক না একবার সে, রাত্তিরে ঘুরে বেড়ানো বার করছি!

রাখাল খড়ম ও গামছা নিয়ে ঘাটের দিকে চলল, হাত-পা ধুতে। টবু-বুবু রান্নাঘরে এটা-ওটা এগিয়ে দিয়ে মাকে সাহায্য করছিল। মা বললে : দাদা কোথায় গেছে জানিস্ তোরা ?

টবু উত্তর দিল : আমি জানি না।

বুবু বললে : দাদা বেড়াতে গেছে।

রান্নাঘরের পেছনদিকে পথের মোড়ে এসে মা চেঁচিয়ে ডাকল : বাবলু !

সাড়া না পেয়ে মা ফিরে এল রান্নাঘরে। না, এমন দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে আর পারা যায় না। সেবার সাব-ডেপুটির ঘোড়ার ব্যাপারে মার যা ভয় হয়েছিল ! যখন ধাইমা এসে খবর দিলে সাব-ডেপুটি ভয়ানক রেগে গেছে, মা ত মুষড়ে পড়ল। সাব-ডেপুটি যদি বাবলুকে ধরে জেলে পূরে দেয় ? ওরা বড়লোক, যা-খুসী তা করতে পারে। যা-হোক, শেষ পর্য্যন্ত ভগবান মার প্রার্থনা বুঝি শুনলেন। বাবলু শাস্তি না পেয়ে পেলে পুরস্কার ! আর সত্যি বলতে কি, সে ত সুরথ-বাবুর জন্যই।

না জানি আজ আবার কি অনর্থই না করছে, ছেলেটা। রান্নাঘরে তরকারি কুটতে কুটতে ভয়ে মার মুখ শুকিয়ে গেল।

হাত-পা ধুয়ে রাখাল ফিরে এল। ঘরে ঢুকে বললে : বাবলু এসেছে ?

বুবু উত্তর দিল ; বললে : বাবলু হাওয়া খেতে গেছে।

রাখাল বললে : হাওয়া খেয়েই আজ তাকে থাকতে হবে। আজ ওর ভাত খাওয়া বন্ধ।

তারপর বাবলুর মাকে শুনিয়ে আপনমনে বলতে লাগল ঃ সংসারের এই ত অবস্থা। ছেলেটা অত বড় হয়েছে, একটু খেয়াল নেই। তার উপর গাঁয়ে বেরোলেই নালিশ শুনতে হয়। বাবলু এর ছেলেকে মেরেছে, বাবলু ওর গাছের ফল চুরি করেছে! বাবলু এটা করেছে, বাবলু ওটা করেছে।...

একটু থেমে বললে ঃ এই ত সেবার ডেপুটি সাহেবের ঘোড়া আটকে কি কাণ্ডটাই না করলে! ধান যাদের খেয়েছে, তারা আটকাক না ঘোড়া, যদি বুকের পাটা থাকে। বলি, তুই কেন যাবি এর ভেতর?...ছেলে সামলাই না পরিবারের জন্য দু'মুঠো যোগাড় করি! পোড়া কপাল আর কাকে বলে!

মা যেন কিছুই শুনতে পায় নি, এমনিভাবে রান্না করতে লাগল।

রাখাল আর কিছু বললে না। মাদুরে বসে ঝিমাতে লাগল।

বাড়ীর বাইরে এসে বাবলু থমকে দাঁড়াল।—'পেটে খেলে পিঠে সয়।' ডাব ত খুব খাওয়া গেল, এবার পিঠে সইতে হবে। হাটবারে রাখাল রোজই বাউল-কীর্ত্তনে যায়। এমনও ত হতে পারে রাখাল এতক্ষণে কীর্ত্তনের আসরে বেরিয়ে পড়েছে!

এক মুহূর্ত্ত বাবলু দরজায় কান পেতে বাবার গলার স্বর শুনতে চেষ্টা করল; কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না।

রান্নাঘর থেকে টবু-বুবুর টুকরো টুকরো কথা মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। বুবু বলছিল ঃ টবু ঘুমিয়ে পড়েছে মা!

টবু প্রতিবাদ করে বললেঃ না মা, আমি ঘুমাই নি।···বুবু শুয়ে পড়েছে।

মা বললেঃ তোরা উঠে বস না ডালটা নামিয়ে এক্ষুণি খেতে দিচ্ছি।

বাবলু দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার উঠানে। রান্নাঘর থেকে খুন্তি ও কড়ার শব্দ আসছে—টুং টাং। বাবলু এবার দরজায় উঁকি দিল। দরজার দিকে পেছন ফিরে মাদুরে বসে রাখাল তখনো ঝিমাচ্ছে।

আগচালা থেকে মনা বাবলুকে দেখতে পেয়ে ডেকে উঠলঃ মোঁ-উ-উ!

মা মনার ডাক শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাবলুর পিঠে হাত রাখল। বাবলু চমকে উঠে ফিরে তাকাল। মা আস্তে আস্তে বললেঃ খাবি ত আয়।

মা টবু, বুবু ও বাবলুকে খেতে দিল। বারেক আড়চোখে মার দিকে তাকিয়ে বাবলু নীরবে খেতে লাগল।

পাশের ঘরে এসে মা রাখালকে ডাকলেঃ এই শুনছ? খেতে দিয়েছি।

ঃ দিয়েছ?···রাখাল উঠে দাঁড়াল।

রান্নাঘরে এসে বাবলুকে দেখে রাখাল কিন্তু একটি কথাও বললে না। মা বললেঃ আর একটু তরকারী দোব?

ঃ না না, আর দিতে হবে না।···রাখাল বললেঃ বলছিলাম কি,

কাল ভোরবেলা আমি সোনারপুর যাব। দেখি কিছু 'অডার' পাই কিনা।

মা বললে ঃ খেয়ে যাবে ত ?

রাখাল বললে ঃ হ্যাঁ, খেয়েই যাব।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাখাল বাবলুকে ডেকে বললে ঃ তোমার জ্বালায় আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল বাবলু! রাত এক প্রহর অবধি লোকের বাগানের ফলমূল চুরি করে ঘুরে বেড়াবে—আর এদিকে লোকের নালিশ শুনে শুনে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম, তোমাকে নিয়ে কি করব বল !

বাবলুর গাল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু নীচে গড়িয়ে পড়ল। রাখাল তখন কিছু বললে না।

মানে না মানা

নতুন পাঠশালার দ্বার-উদ্‌ঘাটন উৎসব আজ। অনেক সাধাসাধির পর সাব-ডেপুটি তমিজুদ্দী সভাপতিত্ব করতে রাজী হয়েছে। পাশের গ্রামের প্রৌঢ় জমিদার বৈকুণ্ঠবাবু প্রধান অতিথি। আশে-পাশের গ্রাম থেকে আরো দু'একজন সম্মানিত অতিথি আসবেন। আর নেমন্তন্ন করা হয়েছে গ্রামের চাষীদের। সুরথ ও সুরুচি ঘরে ঘরে গিয়ে সবাইকে বলে এসেছেঃ পাঠশালায় ছেলে-মেয়ে পাঠাতে না চাও, না-ই বা পাঠালে। বক্তৃতা, গান-বাজনা প্রভৃতি হবে, একবার আসতে আপত্তি কি!

চাষীরা অনেকেই অক্ষমতা জানিয়েছে, তারা আসতে পারবে না। এখন ধান কাটার সময়। মাঠে পাকা ধান ফেলে কি কেউ গান-বাজনা শুনতে যায়? হ্যাঁ, তবে যদি রাত্রিতে গান-বাজনা হয়···

আসল কথা, ওরা আসতে চায় না। পরেশবাবু ম্লানস্বরে বলেছিলেনঃ থাক না মাঠে পাকা ধান। ইচ্ছা থাকলে কি আর একবার মাঠের পথে ঢু মেরে যাওয়া যায় না?

সারা সকাল সুরথ ও সুরুচি পাতাবাহারের ডাল ও আমপাতা প্রভৃতি দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপখানি সাজিয়েছে। রঙীন কাগজ দিয়ে নিজের হাতে সুরুচি মণ্ডপের খুঁটীগুলো মুড়লে। তারপর বাইরের দরজায়

লাল কাপড়ের উপর তুলো দিয়ে 'স্বাগতম্' লিখে ঝুলিয়ে দিলে। কলাগাছ আর আমপাতার ঝালর দিয়ে সাজানো কালো পর্দায় ঢাকা ছোট্ট মঞ্চটি রাস্তা থেকে চোখে পড়ে।

আজ রবিবার। গাঁয়ের পাঠশালা বন্ধ। তবু রাস্তায় গাঁয়ের একটি ছেলে-মেয়েও চোখে পড়ে না।

আজ কেউ এ পথই মাড়াবে না। পরেশবাবু বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। সত্যি বলতে কি, পরেশবাবু যেন একটু মুষড়েই পড়েছেন। সুরথ ও সুরুচি অত কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু পরেশবাবুর কোন আগ্রহ নেই; সেই সকাল থেকে একখানি বই নিয়ে বারান্দায় চুপচাপ বসে আছেন।

যাদের জন্য ইস্কুল,—গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাই যদি না আসে ত কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকবে না। সাব-ডেপুটির কথা ছেড়ে দিলেও বৈকুণ্ঠবাবু কি ভাববেন ?

সুরুচি পরেশবাবুর পাশে এসে দাঁড়াল।

পরেশবাবু মুখ তুলে বললেন: পণ্ডশ্রম—সবই পণ্ডশ্রম রুচি! ছেলেমেয়েরা আসবে না।

সুরুচি বললে: আজকের দিনে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা না এসে থাকতে পারে না বাবা! এর পর আর আসবে কিনা জানি না, কিন্তু আজ ওরা আসবেই।

পরেশবাবু উদাসস্বরে বললেন: দেখা যাক।

রাস্তা দিয়ে ভোলা ও গোপাল যাচ্ছিল। সুসজ্জিত মণ্ডপঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তারা থমকে দাঁড়াল।

গোপাল বললে ঃ থিয়েটার হবে বোধ হয়।

ভোলা বললে ঃ থিয়েটার না হাতী! নতুন পাঠশালায় আজ সভা হবে, তাই অমন সাজিয়েছে।

গোপাল বললে ঃ আমি বলছি গান হবে।

ভোলা বললে ঃ আমি বলছি সভা হবে।

গোপাল বললে ঃ বেশ ত আয় না। জিজ্ঞেস করে দেখি।

ভোলা গোপালের সাথে সাথে খানিকদূর এগিয়ে বললে ঃ আমি যাব না ওদের বাড়ী।

গোপাল বললে ঃ আমরা ত আর ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছি না— গান হবে কিনা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি।

ভোলা বললে ঃ যা না, আমি মামাবাবুকে সব বলে দোব।

গোপাল রেগে বললে ঃ কি বলবি ? অত ভয় দেখাস্ নি।

খুঁটীর আড়ালে বসে স্নুরুচি পাতাবাহারের ডাল বাঁধছিল। গোপাল ও ভোলার কথা শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে বললে ঃ ছি ছি, তোমরা ঝগড়া স্নুরু করেছ ?

গোপাল বললে ঃ দেখুন না, ভোলা মিছিমিছি আমায় ভয় দেখাচ্ছে। আমি এখানে এসেছি বলে, পণ্ডিতমশাইকে বলে আমায় মার খাওয়াবে।

ভোলার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে একটা কথা কইতে পারল না। মাষ্টারনীর কাছে গোপাল তাকে এমনভাবে ধরিয়ে দেবে, সে মোটেও ভাবে নি। কিন্তু স্নুরুচি রাগ না করে উল্টো হাসিমুখে

ভোলার কাঁধে হাত রেখে বললে: কি নিয়ে তোমাদের তর্ক হচ্ছিল ভোলা ?

ভোলা বললে: আমি—আমি বলছিলাম সভা হবে। গোপাল বললে, গান হবে।

স্নুরুচি বললে: গান ও সভা দুটোই হবে আজ বিকালে। পাশের গাঁ থেকে বৈকুণ্ঠবাবু আসবেন, আরো অনেকে আসবেন। তোমরাও এস। আসবে ত ?

গোপাল মাথা নাড়ল। স্নুরুচি বললে: গাঁয়ের আর সব ছেলেমেয়েদেরও আসতে বলো।

: বলব।···গোপাল মাথা নেড়ে বললে।

স্নুরুচি নিজে তাদের আসতে বলেছে, গোপালের উত্তেজনার সীমা রইল না। ভোলা কিন্তু মুখ গুমরো করে রইল। পথে যেতে যেতে গোপাল বললে: বড়দের বলিস্ নি যেন ভোলা, তা'লে মোটেই আসতে দেবে না আমাদের।

ভোলা বললে: তুমি সত্যি-সত্যিই নতুন পাঠশালায় যাবে ?

: কেন, তুই যাবি নি ?···গোপাল শুধাল।

: না।···ভোলা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

গোপাল বললে: না গেলে ত বয়েই গেল। আমরা যাব।

ভোলা গোপালের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুত বাড়ীর পথ ধরল। রাস্তা দিয়ে ন্যাপা হারু নরু যাচ্ছিল। গোপাল তাদের কানে কানে কি বলতেই সবাই খুসীতে লাফিয়ে উঠল। নতুন পাঠশালায়

গানের কথাটা মুহূর্তে সারা-গ্রামে ছেলেমেয়েদের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। যে যাকে পায় কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি খবরটা দেয়। বলে ঃ বড়দের কাউকে বলিস্ নি যেন !

বাবলু সকালবেলা মনাকে নিয়ে মাঠে বেরিয়েছিল। গোপাল খবরটা বাবলুকে দেবার জন্য দু'বার এসে ফিরে গেল। বাবলু তখনো বাড়ী ফিরে নি।

বটগাছতলায় ছেলেরা জড় হয়ে নতুন পাঠশালার মঞ্চটা ও সুরুচির কথা নিয়ে আলোচনা করছিল। কেউ বললে ঃ মাষ্টারনী নিজেই গান গাইবেন।…কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে বললে ঃ অত বড় মেয়ে আবার সভায় গান গায় নাকি !

মোট কথা বিকালের গানের আসরটা যে জমবে, সে-সম্বন্ধে কারো সন্দেহ ছিল না। ন্যাপা বললে ঃ কি চমৎকার সাজিয়েছে স্টেজ !

সহসা পেছনে পণ্ডিতকে দেখে ছেলেরা কাঠের পুতুলের মত বোবা হয়ে গেল। নতুন পাঠশালার আলোচনা করে যেন ভয়ানক একটা অপরাধ করে ফেলেছে তারা।

দড়ি-বাঁধা চশমার ফাঁকে তাকিয়ে পণ্ডিত বললে ঃ আমি সব শুনেছি। গান ত না, ছেলে ধরার ফাঁদ। শোন গোপাল, ওখানে কিছুতেই তোমাদের যাওয়া হবে না।

কেউ উত্তর দিল না। পণ্ডিত চারদিকে তাকিয়ে বললে ঃ বাবলু— বাবলু কই ?

গোপাল বললে : মাঠে গেছে পণ্ডিতমশাই !

: বেশ হয়েছে।…পণ্ডিত বললে : গান শুনতে তোমরা কেউ ও-বাড়ীতে যাবে না। শুনতে পাচ্ছ সব ?

গোপাল মাথা নাড়ল।

পণ্ডিত বললে : দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সব পাঠশালায় আসবে।

গোপাল বিদ্রোহ করল : আজ রবিবার পণ্ডিতমশাই !

পণ্ডিত খিঁচিয়ে উঠল : ডেঁপোমো রাখ। রবিবার মঙ্গলবার সে আমি বুঝব।

ন্যাপা ক্ষীণকণ্ঠে বললে : বাড়ীতে কাজ আছে পণ্ডিতমশাই !

হারু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে : পাঠশালায় গেলে বাবা বকবে পণ্ডিতমশাই ! দুপুরবেলা বাড়ী থাকতে বলেছে।

পণ্ডিত বললে : তা'লে পাঠশালায় গিয়ে কাজ নেই। খাওয়া-দাওয়ার পর সব এখানে এসে জড় হবে। আমিও আসব। তখন তোমাদের মজার মজার গল্প বলব।

পণ্ডিতের মজার গল্পের কথা শুনে কেউ উৎসাহ দেখাল না।

যেতে যেতে পণ্ডিত বল্লে : খেয়েই সব চলে এস। দেরী করো না যেন।

পণ্ডিত চলে গেলে গোপাল দাঁতে দাঁত চেপে বললে : ভোলা—এসব ভোলারই কাণ্ড। বিশ্বাসঘাতক !

ন্যাপা হাতের মুঠো পাকিয়ে বললে : আসুক না সে একবার।

ছেলেদের রঙীন জল্পনা-কল্পনা মুহূর্তে উভে গেল যেন। ম্লান-মুখে যে যার বাড়ীর পথ ধরল।

ছুটীর দিন দুপুরবেলা একটু গড়িয়ে নেওয়ার চেয়ে আরাম আর কিসে আছে! কিন্তু পণ্ডিতের হয়েছে যত জ্বালা। তা না হলে কি আর রবিবারেও ছেলে তাড়াতে হত!

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রাজ্যের ঘুম চোখে হুঁকো হাতে নিয়ে পণ্ডিত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বটগাছের দিকে চলল। ছেলেরা হয়ত এখনো আসে নি। না আসুক, পণ্ডিত আগে থেকেই ওখানে বসে থাকবে গিয়ে।

কিন্তু ছেলেরা তখন বটগাছের ডালে ঝুলে ডাং ডিং খেলছিল। পণ্ডিতকে দেখে সব টপ্-টপ্ করে গাছ থেকে নেমে এল।

খুসী হয়ে পণ্ডিত বললে: তোরা সব এসে গেছিস্? তা বেশ—তা বেশ। বাবলুটা আসে নি বুঝি, তা না আসুক।

গাছের গোড়ায় এক জায়গায় আরাম করে বসে পণ্ডিত হুঁকো টানতে লাগল। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে: তা খেলছিস্, খেল না। নেমে এলি কেন সব? তবে দেখিস্, হাত-পাগুলো যেন ভাঙ্গিস্ নে। তখন আমাকেই আবার তিন মাইল দূরে 'ডিসট্রাক্ট' বোর্ডের হাসপাতালে ছুটতে হবে।

ছেলেরা আবার খেলতে লাগল।

বটগাছের শীতল হাওয়ায় দেখতে দেখতে পণ্ডিতের চোখ বুজে

এল। হুঁকো-কল্কে হাতে ধরেই গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে পণ্ডিত ঘুমিয়ে পড়ল।

গ্রামের পথে বিকালের ছায়া নামল। বাবলু সমবয়সীদের খোঁজে চলেছিল। পথে গোপার সাথে দেখা। গোপা বললেঃ জানিস্‌নে বাবলু, পরেশবাবুর বাড়ী এক্ষুণি গান হবে।

বাবলু বললেঃ কে বললে?

গোপা বললেঃ গাঁয়ের সবাই জানে। দেখ না গিয়ে কেমন সুন্দর সাজিয়েছে সব।

ঃ হুঁ। বাবলু একটু ভেবে বললেঃ হাদু-গদু-ভোলা-হ্যাপলা সব কোথায়?

গোপা হেসে বললেঃ পাছে কেউ গান শুনতে যায়, তাই পণ্ডিতমশাই সবাইকে বটগাছের নীচে আটকে রেখেছে।...তারপর হাততালি দিয়ে বললেঃ কেমন জব্দ, না? তুই যাস্‌ নি ওদিকে, তোকেও ধরে রাখবে।

বাবলু বললেঃ দূর থেকে আমি একবার দেখে আসি ওদের।

গোপা বললেঃ আমিও আসছি।

বাবলু বললেঃ না, তুই এখানে দাঁড়া, আমি এক্ষুণি ঘুরে আসছি।

বাবলু বটগাছের দিকে ছুটল।

নতুন পাঠশালায় তখন উদ্বোধন-সঙ্গীত সুরু হয়েছে। হারমোনি-য়ামের সাথে পরেশবাবু, সুরথ ও সুরুচির গলা ভেসে আসতেই বাবলু রাস্তায় থমকে দাঁড়াল। বটগাছের দিকে না গিয়ে সোজা পরেশবাবুর

গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে পণ্ডিত ঘুমিয়ে পড়ল পৃঃ ১৬৮

বাড়ীতে যাবে কিনা সে বারেক ইতস্তত করলে। পরক্ষণেই ছুটে চলল বটগাছের দিকে।

এদিকে গান শুনে ছেলেরা খেলা বন্ধ করে নীচে এক জায়গায় জড় হয়েছিল। বাবলুকে ছুটে আসতে দেখে গোপাল ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে ইসারা করল।

গানের স্বর ভেসে আসছে। ছেলেরা বুঝি আর দাঁড়াতে পারে না। তবু তাদের পালিয়ে যাবার সাহস নেই। পণ্ডিত যদি এক্ষুণি চোখ মেলে তাকায়! উত্তেজনায় তাদের পা কাঁপছে।

বাবলু কাছে এসে ফিস্‌-ফিস্‌ করে বললেঃ আচ্ছা আমি ওঁর চোখের সামনে তোদের আড়াল করে বসছি। চোখ মেলে তাকিয়েও কিছুক্ষণ তোদের দেখতে পাবেন না পণ্ডিতমশাই। ততক্ষণে তোরা পালিয়ে যা।

ভোলা সবার পেছনে ছিল। এগিয়ে এসে বললেঃ আর তুই?

বাবলু বললেঃ আমি ঠিক আসব'খন।

বাবলু পণ্ডিতের মুখের সামনে রাস্তা আড়াল করে ঘাসের উপর নিঃশব্দে বসে পড়তেই, ছেলের দল ছুট দিল।

পথের বাঁকে সবাই অদৃশ্য হয়েছে। বাবলু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বটগাছের নীচে এখন মাত্র দু'জন—পণ্ডিত আর বাবলু। একপা একপা করে বাবলু পিছিয়ে খানিকদূর যেয়ে এক দৌড় দিল।

হুঁকোটা হাত থেকে গড়িয়ে পড়তেই হুঁকোর জলে পণ্ডিতের ধুতি ভিজে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসল পণ্ডিত। বটগাছের আশে-পাশে একটি ছেলেও নেই।

নতুন পাঠশালা

পরেশবাবুর বাড়ী থেকে গানের স্বর ভেসে আসছে। পণ্ডিত হুঁকোটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আপনমনে বললেঃ পাখী উড়েছে! না হল ঘুম, না আটকাতে পারলাম ছেলেদের। দিনটাই মাটি হল।

পণ্ডিত বাড়ীর পথ ধরল। পরেশবাবুর বাড়ীর সামনে এসে অজান্তে তার পায়ের গতি শিথিল হয়ে এল। গান শুনতে কে না ভালবাসে! কিন্তু পণ্ডিত বেশীক্ষণ দাঁড়ালে না।

নতুন পাঠশালায় তখন বেশ জমকালো সভা বসেছে। বৈকুণ্ঠবাবু, সাব-ডেপুটি, আর দু'চারজন গণ্যমান্য লোক; শরাফত, মূরত ও আরো কয়েকজন চাষীও এসেছে। গোপা ও গ্রামের কয়েকটি মেয়েও এসেছে। ছেলেরা আসতেই সভা যেন পূরোপূরি জমে উঠল। দেখতে দেখতে বাবলু ও ছেলের দল সবার সাথে কোরাস্-গানে যোগ দিল।

গান শেষ হলে বৈকুণ্ঠবাবু ছেলেদের বললেনঃ তোমরা এসেছ দেখে, আমরা কত খুসী হয়েছি! তোমাদের জন্যই এই নতুন পাঠশালা। তোমরা লেখাপড়া ও নানা কাজকর্ম্ম শিখবে, তাই না সুরথবাবু গাঁয়ে এসে বুনিয়াদী বিদ্যালয় খুলেছেন।

সাব-ডেপুটি বললেঃ এখানে শুধু বই পড়া না, গান-বাজনা, দৌড়-ঝাপ, কাজকর্ম্ম সব কিছু করবে তোমরা।

সভা শেষ হলে পরেশবাবু সবাইকে জলযোগ করতে ডাকলেন—মুড়ি-মুড়কী, গুড় আর মর্ত্তমান কলা। ন্যাপা বাবলুকে কানে কানে বললেঃ ডেপুটি সাবও মুড়ি-মুড়কী খায়!

নতুন পাঠশালা

জলযোগের পর সুরথ ছেলেদের সাথে করে প্রত্যেকটি ক্লাস ঘুরতে লাগল। বললেঃ জান নতুন পাঠশালায় সপ্তায় একদিন গানের ক্লাস, তোমরা যারা গাইতে পার তাদের জন্যই নেওয়া হবে। তানপুরা, হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা—এই সব যন্ত্রপাতি তোমরা গান-বাজনা শিখবে বলেই আনা হয়েছে।

বাবলু অবিশ্বাসের স্বরে বললেঃ আমরা গান শিখব ?

ঃ হ্যাঁ বাবলু !···সুরথ বললেঃ তুমি হারমোনিয়াম কিনতে চেয়েছিলে। এ হারমোনিয়ামটা তোমার।

বাবলু আনন্দ ও উত্তেজনায় হারমোনিয়ামটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেঃ নতুন হারমনি !

কার্পেন্ট্রি ক্লাসে এসে সুরথ বললেঃ নতুন পাঠশালায় তোমরা কাঠের কাজ শিখবে, তাই এসব হাতিয়ার কিনে আনা হয়েছে।

তাঁতের ঘরে ঢুকে বাবলু বললেঃ তাঁত চালাতে আমি জানি।

ঃ তাই নাকি ?···সুরথ বললে।

ঃ বাবা বাড়ী না থাকলে, আমিই ত তাঁত চালাই।

সুরথ বললেঃ খুব ভাল। তুমিই এ ক্লাসের কাপ্তেন হবে।

সুরথ ছেলেদের সব ক'টা ক্লাস দেখিয়ে বললেঃ এখানে তোমরা যাতে সব রকম হাতের কাজ শিখতে পার আমরা তার বন্দোবস্ত করব।

গোপাল বাবলুর কানে কানে বললেঃ কি মজা ! বই পড়তে হবে না।

ওদের কথা শুনতে পেয়ে সুরথ হেসে বললেঃ বইও তোমরা পড়বে, তবে সারাদিন বই পড়ো না। এস তোমাদের পণ্ডিতমশাইর গ্যালারি দেখিয়ে দিচ্ছি।

সাধারণ ক্লাসে এসে সুরথ বললেঃ এ ঘরে তোমাদের সাথে পণ্ডিতমশাইও একদিন এসে বসবেন, আমাদের আশা আছে।

চেয়ার, টেবিল, গ্যালারি—আসবাবপত্র সব নতুন। একটা ছেলে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেঃ সবই ত দেখছি, কিন্তু পণ্ডিতমশাইর বেত দেখছি নে যে!

সুরথ হেসে বললেঃ নতুন পাঠশালায় বেতের ভয় নেই।

ছেলেটি বললেঃ বেতের ভয় থোড়াই করি আমি।

সুরথ হেসে উঠল, ছেলেটির কথা বলার ভঙ্গীতে।

বৈকুণ্ঠবাবু ও সাব-ডেপুটিকে বিদায় দিয়ে পরেশবাবু ঘরে ঢুকে বললেনঃ সবগুলো ক্লাস তোমরা দেখেছ ত?

বাবলু বললেঃ হ্যাঁ, দেখেছি।

পরেশবাবু বললেনঃ কিন্তু সমবায় দোকান নিশ্চয়ই দেখ নি। এস আমার সাথে, দোকানঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

কোণের দিকে সমবায় দোকানে এসে পরেশবাবু বললেনঃ এ দোকান তোমরা নিজেরা চালাবে। নিজেদের দরকারী সব জিনিস এই দোকানে পাওয়া যাবে। তোমরাই কিনবে, তোমরাই বেচবে।

গোপাল বললেঃ গাঁয়ের কেউ যদি কিছু কিনতে আসে?

পরেশবাবু বললেনঃ ঠিক দাম নিয়ে বেচবে।

এদিকে বাইরে স্নুরুচি তখন গোপাকে বলছিল ঃ শুধু কি বই পড়া! সেলাই, হাতের কাজ, লেস্ ও এমব্রয়ডারি—রান্নাবান্না সব শেখাব তোমাদের।

গোপা খুসীতে হাত নেড়ে বললে ঃ কাল থেকেই আসব ?

স্নুরুচি হেসে বললে ঃ আজকের উৎসাহটা কাল পর্য্যন্ত থাকবে ত গোপা ?

গোপা বললে ঃ এবার ঠিক আসব মাসীমা! এসব কাজ শেখাবেন আগে ত কখনো বলেন নি!

সেদিন বাড়ী ফেরার পথে, ছেলেরা প্রায় একবাক্যেই সায় দিল, নতুন পাঠশালায় অনেক মজা। নতুন পাঠশালায় ভর্ত্তি হতে প্রায় সবাই উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু মুস্কিল হল অভিভাবকদের নিয়ে। নতুন পাঠশালা সম্বন্ধে গাঁয়ের কেউই কোন উৎসাহ দেখায় নি। এমন কি রাখালও বাবলুকে কিছু বলে নি।

বটগাছের নীচে ছেলেরা এসে জড় হয়ে নতুন পাঠশালা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। স্নুরুচী দেবী, স্নুরথবাবু আর পরেশবাবু সবাই যে পণ্ডিতমশাইর চেয়ে অনেক ভাল সে সম্বন্ধে আর কারো কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া গানের ক্লাস—কি মজা!

শুধু একজন ছেলেদের আলোচনায় যোগ দেয় নি। একটুখানি তফাতে চুপ করে সে দাঁড়িয়েছিল। সে ভোলা, কিন্তু ভোলার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

বাবলু বললে ঃ যারা নতুন পাঠশালায় যেতে চায় হাত তোল।

ভোলা ছাড়া সবাই হাত তুলে চীৎকার করে উঠল: আমরা সবাই যাব।

গোপাল নতুন পাঠশালায় যাবার জন্য একটু বেশী উদ্‌গ্রীব। বললে: কিন্তু বাড়ী থেকে যদি যেতে না দেয়?

একটু ভেবে বাবলু বললে: 'আমরা নতুন পাঠশালায় যাচ্ছি' একথা বাড়ীতে কেউ বলো না যেন। সবাই নতুন পাঠশালায় গেলে তখন আর কাউকে বকুনি খেতে হবে না।

কথাটা সবাই সমর্থন করল। বাবলু বললে: কাল পাঠশালার বেলা, সবাই নতুন পাঠশালায় এসে হাজির হবে।

ভোলা এগিয়ে এসে বললে: মামাবাবুকে বলে দোব।

বাবলু বললে: বল্ না গিয়ে। আমরা কেউ পাঠশালায় না গেলে মামার পাঠশালা মামা-বাড়ী যাবে।

ভোলা ঘুষি বাগিয়ে বললে: আবার ওকথা বলবি ত এক ঘুষিতে নাক ভেঙ্গে দোব।

বাবলু একলাফে এগিয়ে এসে বললে: মুরোদ তোর। ভাঙ্গ দেখি আমার নাক।

ছেলেরা সবাই বাবলুর পক্ষ নিল আজ। ভোলার উপর সবাই রেগে গেছে। সকালবেলা ভোলাই পণ্ডিতমশাইর কাছে তাদের ধরিয়ে দিয়েছে। ভোলা পঞ্চমবাহিনীর লোক—তাকে তারা কেউ চায় না।

ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে ভোলা হাতের উদ্যত ঘুষি সামলে নিয়ে

আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ল। একাই সে বাড়ীর পথ ধরল। পেছন থেকে ছেলেরা টিটকারি দিতে লাগল :

সিংহের মামা আমি ভোলানাথ দাস,
সাতাশ বাঘেতে হয় একটি গেরাস !

ভোলা পিছন ফিরে তাকাল না। মামাবাবুকে সব বলে দেবে ভোলা ! মজা টের পাওয়াবে মামাবাবু।

পরদিন পণ্ডিত একটু তাড়াতাড়িই পাঠশালায় এল। প্রতিপক্ষেরা কাল ছেলেদের কি জানি শিখিয়ে দিয়েছে ! পণ্ডিতের কাউকে আর বিশ্বাস নেই।

গান শুনতে গিয়ে পাছে সুরথ ও সুরুচির প্রভাবে পড়ে ছেলেরা নতুন পাঠশালায় চলে যায়, তাই পণ্ডিত তাদের আটকে রেখেছিল। কিন্তু দিবানিদ্রাই সবকিছু পণ্ড করে দিল। সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে, দিবানিদ্রা মহাপাপ ! এবার থেকে পাঠশালার বাইরেও ছেলেদের গতিবিধির উপর পণ্ডিত পাহারা রাখবে !

পণ্ডিত হাই তুলে ধীরে ধীরে এক ছিলিম তামাকু সাজলে। দেখতে দেখতে এক সময় কল্কের আগুন নিভে এল। পাঠশালায় একটিও ছেলে এল না। পণ্ডিত বারান্দায় বেরিয়ে এসে পথের দিকে তাকাল। পথে একটাও ছেলে নেই।

নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে, টেবিলে পা তুলে পণ্ডিত ঝিমাতে লাগল। এত তাড়াতাড়ি না এলেই হত। সরলচিত্ত পণ্ডিতের মনে

একথা একবারও জাগল না যে, ছেলেরা এক বিকালের প্রভাবেই পাঠশালা ছেড়ে দিতে পারে।

দুপুর গড়িয়ে পড়ল। পণ্ডিতের একটু তন্দ্রামত এসেছিল। হুড়মুড় করে ভোলা ঘরে ঢুকতেই পণ্ডিতের তন্দ্রা ছুটে গেল। চোখ মেলে পণ্ডিত বললেঃ কে র‍্যা? ভোলা!

ভোলা মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

পণ্ডিত বললেঃ দুপুর গড়াল অথচ বাবুদের পাঠশালায় আসার নামটি নেই। আর সব কোথায়?

গাঁয়ের আর সব ছেলেরা আজ আসবে না জেনে ভোলা একটু দেরী করেই এসেছে। ভোলা জানে, পণ্ডিতমশাই আজ তাকে পড়া জিজ্ঞাসা করবে না। তাই সকালবেলা বই-এ সে হাতই দেয় নি। দুপুর পর্য্যন্ত একা একা ভোলা ফড়িং ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে।

ভোলা ঢোঁক গিলে বললেঃ মামাবাবু!

পণ্ডিত অভ্যাসমত টেবিল চাপড়ে বললেঃ মিথ্যে বলবি ত পিঠের চামড়া তুলব। বল কোথায় সব? কি করছিলি এতক্ষণ তুই?

ভোলা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেঃ ন্যাপা-গোপলা-হারু-নরুদের ডেকে আনতে গেছলাম। তারা কেউ এল না। আমাকে ভেংচি কেটে সব নতুন পাঠশালায় চলে গেল।

এক মুহূর্ত্ত পণ্ডিতের মুখে কথা সরল না। স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসে রইল পণ্ডিত। অবশেষে নিশ্বাস ছেড়ে বললেঃ কেউ আর আসবে না? না আসুক, আমার বয়েই গেল।

ভোলা নিজের জায়গায় বসে ভাল ছেলে সেজে বই খুললে। পণ্ডিত উঠে বার দুই পায়চারি করে বললে ঃ বিশ্বাসঘাতক নেমকহারামের দল! ...তোকেই বা কে এখানে আসতে বলেছে? দূর হয়ে যা এখান থেকে!

ভোলা পণ্ডিতের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে—বলে কি মামাবাবু?

ঃ নবাব-পুত্তুর আমার!...পণ্ডিত বলতে লাগল ঃ একা তোমাকে নিয়ে আমি পাঠশালা চালাব—না? বেরো এখান থেকে।

ভোলা বইখাতা নিয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়ল।

সহসা পণ্ডিতের খেয়াল হল ভোলাকে গাল না দিয়ে, আদর করাই উচিত। পিছু ডাকলে পণ্ডিত ঃ ওরে ও ভোলা! শোন, বাবা শোন্!

কিন্তু ভোলা ততক্ষণে অনেকদূর চলে গেছে।...

পাঠশালা থেকে বেরিয়ে সোজা দ্বারিকের বাড়ী ছুটে এল পণ্ডিত। এমন দুর্দ্দিনে দ্বারিক ছাড়া কার কাছে সে পরামর্শ নিতে যায়?

দ্বারিক ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে সিন্দুকের টাকা গুণছিল। বাইরে থেকে পণ্ডিত হাঁক দিল ঃ মহাজন বাড়ী আছ গো?

তাড়াতাড়ি সিন্দুক বন্ধ করে দরজা খুলে দ্বারিক বললে ঃ ব্যাপারখানা কি পণ্ডিত? এমন অসময়ে যে!

পণ্ডিত মাদুরে বসে নিশ্বাস ছেড়ে বললে ঃ যা ভয় করেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত তাই হল। পাঠশালাটি ভেঙ্গে গেল।

চমকে উঠে দ্বারিক বললে ঃ এ্যাঁ!

নতুন পাঠশালা

ঃ পাঠশালায় আজ একটিও ছেলে আসে নি।···পণ্ডিত ম্লানস্বরে বললেঃ আজ থেকে গাঁয়ে নতুন পাঠশালা চালু হয়েছে কিনা।

দ্বারিক ঠোঁট কামড়ে বললেঃ একটি ছেলেও এল না তোমার পাঠশালায়?

পণ্ডিত মাথা নেড়ে বললেঃ না! বিশ্বাসঘাতকের দল! এমন করে পাঠশালাটি আচমকা ভেঙ্গে যাবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

দ্বারিক দলিলের ঝাঁপি বার করে বললেঃ যতদিন দ্বারিক মহাজন বেঁচে আছে তোমার কোন ভাবনা নেই, পণ্ডিত!

ঃ তা কি আর আমি জানিনে মহাজন?···কৃতজ্ঞস্বরে পণ্ডিত বললেঃ কিন্তু আমার পাঠশালা! আমার ছেলেরা!···বলতে বলতে তার স্বর করুণ হয়ে এলঃ সুরথ আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে!

দ্বারিক বললেঃ চুলোয় যাক আঠশালা, চুলোয় যাক ছেলেরা। যারা তোমায় চায় না, তাদের তুমি চাইবে কেন?

পণ্ডিত উত্তর দিল না।

ঃ আর এ-ও তোমাকে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি পণ্ডিত,···দ্বারিক বলতে লাগলঃ কালের চাকা আবার ঘুরবে। গাঁয়ের ছেলেরাই শুধু না—তাদের বাপেরাও এসে পড়বে তোমার পায়ে তখন। হ্যাঁ, এ আমি তোমায় বলে রাখছি।

মনা

রাখালের সাংসারিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই চলেছে। বাজারে তাঁতের গামছার কদর নেই। মিলের তোয়ালে ও মারকিন কাপড়ের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে যে দামে গামছা বিক্রী করতে হয় তাতে খরচ উঠে না। অবশ্য বড়লোকদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে কিছু কিছু ফ্যান্সি-কাপড়ের অর্ডার সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ঝামেলা অনেক। প্রথমত স্থতো যোগাড় করার হাঙ্গামা। রাতদিন খেটে অর্ডারের মাল তৈরী করে পূরো দাম পাওয়ার আশা নেই। অগ্রিম যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। মাল নিয়ে যাওয়ার সময় বাবুরা একটি পয়সাও দেয় না। একসঙ্গে দাম চুকিয়ে দেওয়াটাই গ্রাম দেশে নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ। 'কাল এসে বাকী পয়সা নিয়ে যাস।' তারপর কাল যে কবে আসবে, রাখাল ত রাখাল, কালও বুঝি তা বলতে পারেন না। সত্যি বলতে কি, পাঁচখানা গ্রাম ঘুরেও তেমন অবস্থাপন্ন লোক বেশী দেখতে পাওয়া যায় না যে নগদ দাম দেবার ক্ষমতা রাখে।

চুপ-চাপ দাওয়ায় বসে রাখাল এ-সব কথাই ভাবছিল। টবু-বুবু উঠানে মনার সাথে খেলছে। বাবলু পাঠশালা থেকে তখনো ফেরে নি। নতুন পাঠশালা আর পুরানো পাঠশালা রাখালের কাছে সবই সমান। পাঠশালায় পড়ে যদি অন্ন-সমস্যার সমাধান হত তবে ত কথাই ছিল না আর।

নতুন পাঠশালা

রান্নাঘর থেকে বাবলুর মা বেরিয়ে এসে বললেঃ হ্যাঁ গা এত কি ভাবছ ?

রাখাল নিশ্বাস ছেড়ে বললেঃ ভাবছি এমন করে আর ক'দিন চলতে পারে !

বাবলুর মা ভরসা দিয়ে বললেঃ তুমি ছাখো, তাঁতের গামছার আবার কাটতি হবে বাজারে।

বাবলু পাঠশালা থেকে ফিরে এসে বললেঃ জান মা, সুরুচি দিদি ছোটদের জন্য মজার ক্লাস করবেন।

টবু-বুবু দাদার কথা শুনে উঠান থেকে বললেঃ আমরা যাব না।

বাবলু বললেঃ একবার গেলে তখন রোজ যেতে চাইবি। কত মজার মজার খেলা সব ! তুপুরে আবার তুধ খেতে পাবি।

ঃ বলিস্ কি রে বাবলু ?...রাখাল বিস্মিতস্বরে বললেঃ নতুন পাঠশালায় আবার খেতেও দেয় নাকি ?

বাবলু মাথা নাড়ল, বললেঃ আমরা রোজ এক পো করে তুধ খাব ইস্কুলে। পরেশবাবু গোরু কিনে এনেছে না ? আমরা একটা গো-শালা করব।

রাখাল বললেঃ আর তোদের সব্জীবাগান ? সুরথবাবু তোদের নিয়ে আর সব্জী করবে না ?

বাবলু বললঃ হ্যাঁ, করছেন বৈ কি ! আস্তে আস্তে সবই হবে। সুরথদা বলছেন আমাদের হাতে তৈরী জিনিসপত্র সব নাকি বাজারে বিক্রী হবে। এতে আমরা সবাই তু'পয়সা পাব।

ঃ পয়সা উপায় করা অত সোজা আর কি !···রাখাল বললে।

ঃ হ্যাঁ বাবা,···বাবলু বললেঃ সুরুচি দিদি বলেছেন, কাজ শিখতে শিখতে আমরা সবাই নাকি পয়সাও রোজগার করছি।

সুরুচির নাম শুনে রাখাল আর অবিশ্বাস করতে পারল না। বললেঃ বটে!

বাবলু বললেঃ সুরুচি দিদি বলেছেন আমরা সবাই একটা-না একটা হাতের কাজ শিখে পাঠশালা থেকে বেরিয়ে আসব।

রাখাল খুসী হয়ে বললেঃ না, এদের প্রশংসা করতে হয়। গাঁয়ে এমন পাঠশালাই চাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নতুন পাঠশালাটি টিঁকে থাকলেই হয়।

পেছন থেকে দ্বারিক বললেঃ এই যে রাখাল! আজকাল ত তোমার টিকিটিও দেখতে পাই নে আর।

দ্বারিক টাকার তাগিদে রাখালের কাছে এসেছিল। রাখালের শেষ কথাগুলো কানে যেতেই তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল।

দ্বারিককে দেখে বাবলুর মা মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরের ভেতর গেল। বাবলু বারেক আড়চোখে দ্বারিকের দিকে তাকিয়ে মার পিছু পিছু চলল।

রাখাল বললেঃ বসুন মহাজন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

দ্বারিক ঝাঁঝালো সুরে বললেঃ তোমার বাড়ীতে বসবার জন্য আসি নি রাখাল, টাকা চাইতে এসেছি।

রাখাল মাথা চুলকে বললেঃ কি যে করি মহাজন, বাজারে

মালপত্রের মোটেই বিক্রী নেই। যেমন করে হোক আপনার টাকা আমি শোধ করবই।

দ্বারিক বললেঃ নতুন পাঠশালার ত খুব প্রশংসা করছিলে। ওদের কাছ থেকে ধার নিয়ে আমার টাকাটা শোধ করে দাও না!

রাখাল মাথা চুলকে বললেঃ সে কেমন করে হয় মহাজন! বরং না খেয়ে মরব, তবু যেখানে-সেখানে হাত পাততে পারব না।

দ্বারিক মুখ বিকৃত করে বললেঃ তা কেন হাত পাতবে! ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো আমি ত রয়েছি-ই। তোমাদের,—গাঁয়ের দশজনের ভাণ্ডারী আমি কিনা, টাকার প্রয়োজন হলেই আমার কাছে ছুটে আসবে। তারপর আর কারো টিকিটিও দেখবার জো নেই। বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমাকে ধর্না দিতে হবে। তবু যদি টাকা ফেরত পাওয়া যেত। যতসব চোর-বদমায়েস!

রাখাল জোর করে মুখে হাসি টেনে বললেঃ তা গালমন্দ যদি কারো সহ্য করতে হয় ত আপনারই। আপনি দুটো গাল দিলেও জীবন সার্থক। আপনার দোর খোলা না থাকলে গাঁয়ের চাষাভূষা কেউ বাঁচত না। সব মরে যেত মহাজন!

দ্বারিক বললেঃ তবে র‍্যা ব্যাটা, শত্তুরের মুখ আলো করে ওদের পাঠশালায় ছেলে পাঠিয়েছিস্ যে বড়? ওখানে ছেলে পাঠাবি না বলে ত আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলি!

রাখাল মাথা চুলকে বললেঃ সবাই ছেলে পাঠালে, আমিও পাঠালাম। গাঁয়ের দশজনের বিরুদ্ধে কেমন করে যাই মহাজন!

তিক্তস্বরে দ্বারিক বললেঃ তোদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। নেমকহারামের দল! চুলোয় যাক পাঠশালা আর ছেলে। আমার মাথাব্যথাটা কিসের? তোদের ভালর জন্যই বলা।...কালকের দিনটা সময় দিচ্ছি। কাল যদি স্নুদ-আসল আমার টাকা শোধ না করিস্, পরশু কোর্টে যাচ্ছি।

দ্বারিক ঘুরে দাঁড়িয়ে যেতে উদ্যত হল। রাখাল ওর সামনে এসে হাতজোড় করে বললেঃ দোহাই আপনার মহাজন! আমাকে সাতদিনের সময় দিন।

দ্বারিক বললেঃ সাতদিনের ভেতর তুই টাকা কেমন করে শোধ করবি, আমায় বলতে পারিস্?

রাখাল এক মুহূর্ত্ত উত্তর খুঁজে পেল না। দ্বারিক বললেঃ কারো ঘরে সিঁধ কাটবি নাকি? আজকাল কি তাই সুরু করেছিস্?

উঠানের অপর-পার্শ্বে দণ্ডায়মান মনার উপর দৃষ্টি পড়ল দ্বারিকের। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ দৃষ্টিতে মনার দিকে তাকিয়ে দ্বারিক বললেঃ বেশ সুন্দর গোরু ত! এটা কি তোমার নাকি?

দ্বারিকের উদ্দেশ্য বুঝতে রাখালের দেরী হয় না। বারেক ইতস্ততঃ করে রাখাল বললেঃ ওটা ঠিক আমার না, মহাজন!

টবু-বুবু খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দ্বারিকের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।

দ্বারিক বললেঃ তোমার না? তবে কার?

ঃ মনার মালিকেরা ওই যে দাঁড়িয়ে আছে মহাজন !···ইসারায় টবু-বুবুদের দেখিয়ে রাখাল বললে।

দ্বারিক টবু-বুবুদের দিকে বারেক তাকিয়ে রাখালকে বললেঃ ও—হো !

দ্বারিক মনার দিকে এগিয়ে আসতেই মনা শিং নেড়ে তাড়া করল। দ্বারিক ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললেঃ নতুন শিং গজিয়েছে দেখছি !

রাখাল বললেঃ ঐ ত মোটে দু'বছর বয়স হল মনার।

দ্বারিক বললেঃ কি নাম বললে, মনা ? বেশ সুন্দর নাম ত !··· তারপর সন্তর্পণে মনার দিকে এগোতে এগোতে আদর করে ডাকলঃ মনা !

এবার মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল মনা।

দ্বারিক মনার গলায় হাত বুলিয়ে বললেঃ অবোলা জীব !

টবু-বুবু দ্বারিকের ভাব-ভঙ্গী মোটেও বরদাস্ত করছিল না। কিন্তু কিছু বলারও সাহস তাদের ছিল না। দ্বারিক এবার মোলায়েম স্বরে বলতে লাগলঃ হাজার হোক তুই আমার প্রতিবেশী। দিনে দশবার পরস্পরের মুখ দেখি। নালিশ করে তোর ঘটি-বাটি যথাসর্ব্বস্ব আমি নীলাম করব, তোর ছেলেমেয়ে কান্নাকাটি করবে—এ কি আমারই ভাল লাগবে ?

রাখাল বললেঃ দয়ার শরীর আপনার মহাজন ! পনের দিনের ভেতর আপনার পাওনা আমি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করব।

দ্বারিক বললেঃ তাঁতের কাপড় বেচে আর ঋণ শোধ করতে হবে না।

ম্লানস্বরে রাখাল বললেঃ ঠিকই বলেছেন মহাজন! বাজারে আজকাল এক পয়সা বিক্রী নেই।

দ্বারিক বললেঃ এদিকে শুনতে পাই, তোদের সুরথবাবু নাকি তাঁত চালিয়ে স্বরাজ আনবে গাঁয়ে! তোরা না বুঝেই যাকে-তাকে নিয়ে মেতে উঠিস্, ঐ ত মুস্কিল। নতুন পাঠশালা গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের মন্দ বই ভাল করবে না।

রাখাল চুপ করে আছে দেখে দ্বারিক বললেঃ থাকগে ওসব কথা। হ্যাঁ, কি বলছিলাম—সুদের কথা। সুদের টাকাটা দিয়ে দে, তোকে আমি তিন মাস সময় দোব। টাকা না দিতে পারিস্, এই গোরুটা সুদের উপর দিয়ে দে আমায়।

টবু-বুবু উঠানে জ্বালানি কাঠ জড় করছিল। দ্বারিকের কথা শুনে করুণ অসহায় দৃষ্টিতে রাখালের দিকে তাকাল।

রাখাল বললঃ তা গোরুটা আপনি চাইছেন—সে ত আমার ভাগ্যি। কিন্তু মনার মালিকেরা কেমন করে আমায় দেখছে, চেয়ে দেখুন। মনা ওদের খেলার সাথী কিনা। মনাকে ছাড়া ওদের এক মুহূর্ত্তও চলে না।

দ্বারিক রেগে বললেঃ বেশ ত। তোর ছেলেমেয়ের সখের জিনিস আমি কি আর জোর করে কেড়ে নোব? মন আমার বড় নরম, তাই ভাবলাম টাকা যখন তোর নেই, গোরুটাই নিয়ে যাই।

অমন অনেক গোরু বাজারে পাওয়া যায়।···একটু থেমে দ্বারিক বললেঃ আচ্ছা তা'লে আমি আসি। সময় যদি নিতে চাস, কাল ভোরে সুদের টাকাটা নিয়ে আসবি। তা না হলে পরশু আমাকে সদরেই যেতে হবে।

দ্বারিক চলে গেল।

দ্বারিকের শ্যানদৃষ্টি শেষ পর্য্যন্ত মনার উপরই পড়বে, আর সুদের টাকার বিনিময়ে মনাকেই সে চেয়ে বসবে, একথা রাখাল কল্পনাও করে নি। এক মুহূর্ত্ত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবলুর মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই টবু-বুবু ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে ঃ মা, মনা!

ওদের মা এসব কথাবার্ত্তা শুনতে পায় নি। কিছুই বুঝতে না পেরে বললে ঃ কি হল মনার?

নিশ্বাস ছেড়ে রাখাল বললেঃ মহাজন সুদের টাকার উপর মনাকে চায়।

মা উত্তর দিল না; উঠান থেকে শুকনো কাঠ তুলতে লাগল।

রাখাল বলতে লাগলঃ না দিলে নালিশ করবে শাসিয়ে গেল।

মা টবু-বুবুদের দিকে তাকিয়ে বললেঃ এই তোরা দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? কাজ কর না।

টবু-বুবু তেমনি মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা বললেঃ এই ছ্যাখো,—মহাজন ত আর এক্ষুণি মনাকে নিয়ে যাচ্ছে না! যখন নেবে, তখন নেবে!

রাখাল বললেঃ আমিও ত তাই বলি। করুক না নালিশ। নালিশ করে ডিগ্রিজারি করিয়ে নীলাম করতে ঢের সময় লাগবে। যখন নেবে তখন নেবে, এক্ষুণি দোব কেন ?

বুবু ঠোঁট ফুলিয়ে বললেঃ কক্‌খনো দোব না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবলু রেড়ীর তেলের আলোয় ইস্কুলের পড়া তৈরী করছে। নতুন পাঠশালায় যাওয়া অবধি বাবলু লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠেছে। টবু-বুবু অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। মা মেঝেয় বসে কাঁথা সেলাই করছিল। রাখাল খুঁটীতে হেলান দিয়ে বসে দ্বারিকের টাকার কথাই ভাবছিল। বললেঃ তা বুঝলে বাবলুর মা, ভেবে দেখলাম মহাজনকে চটিয়ে কিছু লাভ নেই। ঐ ত আমার অবস্থা। আবার কখন ওর দ্বারে হাত পাততে হয়, কে জানে !

মা সায় দিয়ে বললেঃ সে ত ঠিকই।

রাখাল বলতে লাগলঃ ওসব মামলা-মকদ্দমায় যাওয়া খরচান্তের একশেষ। উকিল-মোক্তার-মুহুরী-পেয়াদা কাকে—না পয়সা দিতে হয় ! তা বাদে গাড়ীভাড়া। এ খরচাই বা পাই কোথায় ?

মা বারেক মুখ তুলে বললেঃ টাকা যখন শেষ পর্য্যন্ত শুধতেই হবে, মিছিমিছি খরচা করে কি লাভ ?

রাখাল বললেঃ তা ত দিতেই হবে। ওর হকের টাকা। রাখাল না খেয়ে মরবে, তবু কারো হকের টাকা মারবে না।

মা উত্তর দিল না। রাখাল একটু কেশে বললেঃ আর ওটাকে

রেখেই বা কি লাভ ?···মনা, আমি মনার কথা বলছি। শুধু বসে বসে ঘাস খাওয়া ছাড়া ত আর কোন কাজ নেই।

বাবলু বই থেকে মুখ তুলে বাবার কথা শুনতে লাগল।

ঃ মহাজন যখন নিজে থেকে চাইছে,···রাখাল বলতে লাগল ঃ আমি বলি কি, নিয়েই যাক্ না।

মা বললে ঃ তাই ভাল। আমরা গরীব মানুষ। মকদ্দমায় যাওয়া আমাদের পোষায় না।

বাবলু মার কাছে সরে এসে অভিমানের স্বরে বললে ঃ মনাকে দিয়ে দেবে, মা !

মা কাঁথা থেকে মুখ না তুলেই বললে ঃ হ্যাঁ বাবা ! ও নিয়ে তুমি আবার একটা ফ্যাসাদ বাধিও না যেন।

মা মুখ তুলতেই বাবলু দেখল, তার চোখ সজল। বাবলুকে কিছু বলার অবসর না দিয়েই মা বললে ঃ ছুঁচটা আঙুলে ফুটে গেল।

রাখাল ওপাশ থেকে বললে ঃ রক্ত বেরোয়নি ত ?

ঃ না।···মা বললে।

মনা গোরু হলেও, রাখাল-পরিবারেরই একজন। শুধু টবু-বুবুর নয়—সবার সাথী সে। ঋণের দায়ে মনাকে দ্বারিকের হাতে তুলে দিতে হবে, তাই মার চোখ সজল হয়ে উঠেছে।

বাবলু নিঃশব্দে নিজের জায়গায় ফিরে এসে ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে, বিছানায় শুয়ে পড়ল।

নতুন পাঠশালা

পরদিন সকালবেলা। টবু-বুবু রান্নাঘরে খেতে বসেছে। রাখাল তাদের অলক্ষিতে মনার গলায় দড়ি বেঁধে দ্বারিকের বাড়ী নিয়ে এল। দ্বারিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। দূর থেকে রাখাল আসছে দেখতে পেয়ে বললেঃ গোরুটাকে হাটে নিয়ে চললি রাখাল? ভেবেছিস্ বেচে দিয়ে টাকাটা মুঠো করে আমায় ঠকাবি?

জিভ কেটে রাখাল বললেঃ বলেন কি মহাজন! আমার ঘরের লক্ষ্মী মনাকে বাজারে বেচব!

ঃ তবে?...দ্বারিক বললেঃ পাশের গাঁয়ে আত্মীয়-বাড়ী রেখে আসবি বুঝি!

রাখাল বললেঃ কথা ঠিকই মহাজন! খাতকের আত্মীয় মহাজন। তাই আপনার জিম্মায়ই ওকে রাখতে এলাম।

রাখালের কথা শুনে খুসীতে দাঁত বার করে দ্বারিক বললেঃ শেষকালে সুমতি হল তবু। তা বেশ। আমার ঘরে তোর মনার অযত্ন হবে না, বরং সুখেই থাকবে।

দ্বারিকের পিছু পিছু রাখাল উঠানে ঢুকে দাওয়ার খুঁটীতে মনাকে বেঁধে রাখল। দ্বারিক বললেঃ অত বড় বাড়ীটা রয়েছে ওর চরে খাওয়ার জন্য। দু'দিনেই মনার চেহারা ফিরে যাবে।

রাখাল বললেঃ তাই ভেবেই ত নিয়ে এলাম মহাজন! মনার জন্য আমার ছেলেমেয়েরা যা কান্নাকাটি করবে, সে আর বলে লাভ নেই।

দ্বারিক সে কথায় কান না দিয়ে বললেঃ গোরুটাকে দেখেই আমার

মনে লাগল। তা না হলে কড়কড়ে টাকার বদলে কে ওকে চায়? ভেবে দেখ, ও আমার কোন্ কাজে লাগবে! বিয়োতে এখনো বছরদিন বাকী।

রাখাল বললেঃ আচ্ছা মহাজন, আমি এবার আসি। এক্ষুণি আবার দত্তগ্রামে যাব গামছা নিয়ে। দেখি, দু'একখানি গামছা বেচতে পারি কিনা।

রাখাল চলে যাচ্ছিল। দ্বারিক পিছু ডাকলঃ শোন রাখাল!

রাখাল ঘুরে দাঁড়াল; বললেঃ আমায় ডাকছেন?

দ্বারিক বললেঃ হ্যাঁ।...তারপর ঘর থেকে একগাছি দড়ি বার করে এনে রাখালের হাতে দিয়ে বললেঃ পরের দড়ি রাখতে নেই। তোর দড়ি খুলে নিয়ে এই নতুন দড়িটা বেঁধে দে মনার গলায়।

রাখাল নিজের দড়ি খুলে, নতুন দড়ি পরিয়ে দিলে মনার গলায়। মনা শিং নেড়ে বার বার প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

দ্বারিক বললেঃ তা'লে তোকে আরো তিন মাসের সময় দিলাম।

এদিকে মনাকে আগচালায় না দেখে টবু-বুবু চেঁচামেচি সুরু করলঃ মনা—মনা কোথায়?

বাবলু পাঠশালায় গেছে। মা রান্নাঘরে বাসন তুলছে। টবু-বুবু মার কাছে ছুটে এসে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেঃ মা, মনাকে নিয়ে গেছে গো!

সান্ত্বনা দিয়ে মা বললেঃ কাঁদিস্ নি তোরা। মনার চেয়ে সুন্দর আর একটি গোরু তোদের কিনে দোব।

টবু কাঁদতে কাঁদতে বললেঃ চাইনে তোমার সুন্দর গোরু।

বুবু দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলঃ মনা, আমার মনারে!

মা বারেক টবু-বুবুর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। মনাকে যে এরা কত ভালবাসে, মার অজানা ছিল না। তাই মিথ্যে সান্ত্বনার ভাষা যোগাল না ওর মুখে।

পুকুরঘাট থেকে মা বাসন নিয়ে ফিরে এল। তখনো টবু-বুবু ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে মা বললেঃ যাও তো মা টবু, ভাইকে নিয়ে চেলাকাঠগুলো উঠানে রদ্দুরে মেলে দাও।

টবু উঠল না, তেমনি বসে বসে কাঁদতে লাগল।

মা বললেঃ ওঠো। শেষকালে উঠানে রদ্দুর থাকবে না। লক্ষ্মীমেয়ে কথা শোন।

টবু উঠল। আস্তে আস্তে সে চেলাকাঠের ঢিবির দিকে যেতে লাগল। বুবু কিন্তু বসে রইল। মা বুবুর দিকে বারেক তাকিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

টবু উঠানে কাঠ ছড়িয়ে ফেলতে লাগল। একটু বাদে বুবুও টবুর সাথে যোগ দিল।

বাজারে গামছা বিক্রী হয় না। ক'দিন ধরে তাঁত বন্ধ। মার কাজ নেই। দুপুরবেলা টবু-বুবুকে নিয়ে মা শুয়েছিল। বাড়ীটা নিঝঝুম। মা ঘুমিয়ে পড়তেই টবু-বুবু পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে

এল। এসময়টা তারা প্রায়ই মনার সাথে খেলা করত। নিজেদের অজান্তে টবু-বুবু আগচালায় এসে থমকে দাঁড়াল। মনার শূন্য জায়গাটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভাই-বোনের চোখে জল এল।

বুবু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে : দিদিভাই! আমার মনা।

টবু চোখের জল মুছে বললে : ঐ যে রাক্ষুসে বুড়ো কাল এসেছিল, ওই মনাকে নিয়ে গেছে!

বুবু বললে : কেন নিয়ে গেছে?

টবু উত্তর খুঁজে পেল না। তাদের মনাকে বুড়ো কোন্ অধিকারে নিয়ে গেল, সত্যিই ত!

বুবু শুধাল : মনা আর আসবে না রে?

টবু বললে : কেমন করে আসবে? বুড়ো ওকে বেঁধে রেখেছে যে!

বুবু হতাশস্বরে বললে : তবে কি হবে দিদিভাই?

টবু-বুবু শূন্য আগচালায় চুপ-চাপ বসে রইল। তাদের মনা আর আসবে না। সহসা দূরে মনার খুরের শব্দ শুনতে পেয়ে তারা উঠে দাড়াল। পরক্ষণেই মনা ছুটতে ছুটতে এসে গোয়ালে ঢুকল।

মনাকে এমন করে ফিরে পেয়ে টবু-বুবুর আনন্দের সীমা রইল না। বুবু মনার গলা জড়িয়ে ধরল, টবু তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। খুসীতে তাদের চোখে জল এসে পড়েছে। বুবু আদর করে ডাকলে : মনা মনা আমার!

টবু বললে : লক্ষ্মী সোনা!

বন্ধুদের ফিরে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে মনার চোখেও ঘুমিয়ে
অস্ফুটস্বরে মনা সাড়া দিল ঃ মেঁা-উ-উ ! ঃ টবু-বুবু

মনার গলায় তখনো দড়ি ঝুলছে। টবু দড়িতে হাত দিয়ে পরী
করে বললে ঃ নতুন দড়ি—দেখেছিস্ ! না।

বুবু বললে ঃ দিদিভাই, ঘাস নিয়ে আয়। মনা সারাদিন কিছু খায় নি। বুড়ো ওকে উপোস রেখেছে।

ঃ মেঁা-উ-উ !···মনা অস্ফুটস্বরে সায় দিলে।

বুবু মনাকে আদর করে বললে ঃ আর কখনো যাস্ নি ওখানে।

টবু বললে ঃ যদি বুড়ো এসে টেনে নিয়ে যায় ?

বুবু বললে ঃ বুড়োকে মারব।

উঠানের পেছন থেকে হাতে ছিঁড়ে টবু হু'মুঠো ঘাস নিয়ে এসে বললে ঃ দাদাকে বল—বিকালে ওকে মাঠে চরাতে নিয়ে যাবে।

পায়ের শব্দে টবু-বুবু ফিরে তাকাল। মূর্ত্তিমান বিভীষিকার মত পেছনে দ্বারিক দাঁড়িয়ে। টবুর হাত থেকে ঘাস নীচে পড়ে গেল বুবুর মুখ শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেল।

হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকে দ্বারিক বললে ঃ আমি আগেই জানি, বাছাধন এখানেই ছুটে আসবেন। কি বদমায়েস গোরু !

দ্বারিক মনার দিকে এক পা এগোতেই মনা শিং নাড়লে ; মানে—কাছে এস না ! ভাল হবে না বলছি !

দ্বারিক বললে ঃ আবার শিং তেড়ে মারতে চায়। বদমায়েস কোথাকার !···বলতে বলতে দ্বারিক লাঠি উঁচিয়ে ধরল।

এল বুবু কেঁদে উঠল ঃ মা-মাগো ! মেরে ফেলল গো !
অজঘরের ভেতর মার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে বাইরে জাবিয়ে এসে দ্বারিককে দেখে মা মাথায় ঘোমটা টেনে দিল।

দ্বারিক আপ্যায়িত স্বরে বললে ঃ বুঝলে বাবলুর মা ! এমন শয়তান গোরু আমি আর দেখি নি। রাখাল বেঁধে রেখে এসেছিল। ভাবলাম, আহা কৃষ্ণের জীব, একটু চরিয়ে নিয়ে আসি। যেই না খুঁটী থেকে দড়িটা খুলেছি—একদৌড়ে তোমাদের বাড়ী এসে হাজির !

মা বললে ঃ মনাকে নিয়ে যান।…তারপর টবু-বুবুর দিকে তাকিয়ে বললে ঃ আয়, তোরা ঘরে আয়।

বুবু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে ঃ আমার মনা।

দ্বারিক বললে ঃ তা মনাকেই বা আর দোষ দি' কেন ? তোমার ছেলেমেয়েরা অমন যত্ন না করলে, সে কি আর ছুটে আসত ?

মা দ্বারিকের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বললে ঃ আপনার গোরু নিয়ে যান।

ঃ সেজন্যই ত ছুটতে ছুটতে এলাম, বাবলুর মা !…দ্বারিক বললে ঃ ওদিকে আমার কত কাজ পড়ে আছে। খাতকেরা হয়ত বসে আছে। চান-খাওয়া এখনো হয় নি।

মা টবু-বুবুর দিকে তাকিয়ে বললে ঃ ঘরে আয় তোরা।

টবু-বুবু কাঁদো-কাঁদো মুখে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। মা তাদের হাত ধরে টেনে বললে ঃ আয়—।

নতুন পাঠশালা

সারাদিন কেঁদে কেঁদে টবু-বুবু বিকালের দিকে দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাখাল বাড়ী ফিরে টবু-বুবু ঘুমোচ্ছে দেখে বললেঃ টবু-বুবু মনার জন্য খুব কান্নাকাটি করছিল নাকি?

মা বললেঃ তা কাঁদুক গে'। দু'একদিন বাদে আর কাঁদবে না। তুমি চান করবে নাকি? এই অবেলায় আর চান করে কাজ কি?

রাখাল টবু-বুবুর গালে অশ্রুর শুকনো দাগ দেখে কাপড়ের খুঁট দিয়ে আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিয়ে বললেঃ সারাক্ষণই কাঁদছিল বোধ হয়!

মা উত্তর দিল না। রাখালের স্পর্শে টবু-বুবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে তারা উঠে বসল।

রাখাল বললেঃ টবু-বুবু, বাজার থেকে তোমাদের জন্য কি এনেছি বল ত? বিস্কুট। যাও, মার কাছ থেকে চেয়ে নাও গে'।

টবু-বুবুর কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ঘুমের ঘোর চোখে নিয়ে তারা বারান্দায় বসে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে রাখাল রান্নাঘরে খেতে বসেছে। মা খাবার দিচ্ছে। টবু-বুবু আস্তে আস্তে আগচালার সামনে এসে দাঁড়াল। শূন্য আগচালাটা খাঁ-খাঁ করে। টবু-বুবু পরস্পরের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। অন্যমনস্কভাবে ঘুরে ঘুরে পথের ধারে আমবাগানে এসে দাঁড়াল তারা একসময়। ছুটোছুটি, পুতুলখেলা কিছুই তাদের ভাল লাগে না আজ। যেদিকেই তাকায় মনে হয়—মনা নেই, মনা নেই।

বুবু ম্লানস্বরে টবুকে শুধায় : মনা আর আসবে না দিদিভাই ?

টবু একটু ভেবে বললে : কেমন করে আসবে ? বুড়ো ওকে মারে যে !

বুবু বললে : আমি যখন বাবার মত বড় হব, বুড়োকে মেরে ফেলব।

টবু বললে : বুড়ো কাঁদবে যে !

বুবু সে কথায় কান না দিয়ে বললে : আমার মনা !

টবু বললে : আয়, আমরা পুতুল খেলি গে'।

সন্ধ্যা হতে দেরী নেই। মা ঘর থেকে ডাকল : টবু-বুবু ঘরে এস।

আমবাগান থেকে টবু সাড়া দিল : যাই মা !

টবু-বুবু হাত ধরাধরি করে ঘরের দিকে চলল। আগচালার সামনে আসতেই বুবুর দুঃখ উথলে উঠল। কাঁদো-কাঁদো স্বরে বুবু বললে : আমার মনা !

: আম্‌বা !···আগচালার ভেতর থেকে অস্পষ্ট ডাক ভেসে এল মনার।

: মনা !···খুসীতে বুবু লাফিয়ে উঠল : মনা এসেছে দিদিভাই !

বাইরে থেকে প্রায়ান্ধকার আগচালার ভেতরটা দেখা যায় না।

টবু আগচালার দিকে যেতে যেতে বললে : মনা এসেছে কাউকে বলো না যেন।

বুবু তার পিছু পিছু আগচালায় ঢুকে বললে : না।···দ্বারিকের মত, বাবা-মাও যে মনার শত্রু, একথা তারা ধরে নিয়েছিল।

আগচালায় ঢুকে টবু-বুবু মনার গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বুবু বললে : লক্ষ্মী সোনা আমার। বুড়ো তোমাকে মেরেছে, না ?

সহসা টবুর খেয়াল হল, দ্বারিক হয়ত মনাকে ফিরিয়ে নিতে এক্ষুণি আসবে। বললে : বুবু, বুড়ো এক্ষুণি আসবে রে !

এমন নিদারুণ সম্ভাবনাটা মনে জাগতেই বুবু আঁতকে উঠল। বললে : কি হবে দিদিভাই ?

টবু বললে : মনাকে লুকিয়ে রাখব।

বুবু মতলবটা অনুমোদন করে বললে : কোথায় লুকিয়ে রাখবে ?

টবু বললে : কেন, বাইরের ঘরটায়।

তখন টবু-বুবু মনাকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরের ছোট ঘরটায় এনে ভেতরে ঢুকিয়ে—বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিলে।

মা রান্নাঘরের দাওয়া থেকে চেঁচিয়ে ডাকল : টবু-বুবু !

টবু-বুবু একসঙ্গে সাড়া দিল : যাই মা !

তারপর ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা বললে : সেই কখন ডেকেছি—এতক্ষণ ছিলি কোথায় ?

বুবু টবুর দিকে তাকাল।

টবু ঢোঁক গিলে বললে : খেলছিলাম মা !

বাইরের রাস্তা থেকে দ্বারিক হাঁক দিল : রাখাল বাড়ী আছ ?

দ্বারিকের গলা শুনে টবু-বুবুর মুখ শুকিয়ে গেল। রাখাল পাড়ায় গিয়েছিল। মা ঘোমটা টেনে বললে : বুবুর বাবা বাড়ী নেই।

নতুন পাঠশালা

দ্বারিক উঠানে ঢুকে বললেঃ না বাবলুর মা, তোমাদের গোরু নিয়ে হয়েছে আমার এক জ্বালা। দড়ি ছিঁড়ে আবার পালিয়ে এসেছে!

মা বললেঃ ক'দিন গেলেই তখন আপনার. ঘরই ওর ঘর হয়ে উঠবে।

দ্বারিক বললেঃ কিন্তু এই ক'দিনেই যে আমার প্রাণান্ত হচ্ছে। গোরু সামলাব, না খাতক সামলাব,—না বাগানবাড়ী সামলাব?

মা উত্তর দিল না।

দ্বারিক বলতে লাগলঃ এদিকে আবার অন্ধকার হয়ে এল। তোমাদের গোয়ালটা কোন্ দিকে বাবলুর মা?…ঐ যে। বাছাধন যে এখানেই আসবেন সে ত জানা কথাই।

তারপর আগচালার দিকে যেতে যেতে বললেঃ আর ওকেই বা দোষ দি কেন! অবোলা জীব।

পরক্ষণেই দ্বারিক আগচালা থেকে বেরিয়ে এসে বললেঃ তাই ত! এখানে আসে নি দেখছি।

মা তখন রান্নাঘরে। টবু-বুবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে শঙ্কিতচিত্তে দ্বারিকের কাণ্ডকারখানা দেখছিল।

দ্বারিক শুধালঃ মনাকে তোরা দেখেছিস্?

টবু-বুবু প্রায় একসঙ্গেই উত্তর দিলঃ আমরা জানি না।

মুখ বিকৃত করে দ্বারিক বললেঃ তা আর জানবে কেন!

এখন ত আর মনা তোদের নয়। বাঘে নিলেই কি আর হারিয়ে গেলেই কি!

দ্বারিক বাড়ীর পথ ধরল। গাঁয়ে ত গোরু-চোরের ছড়াছড়ি। দ্বারিক আপন-মনে গজ-গজ করতে লাগল: কেউ যদি ধরে নিয়ে সোনাপুরের হাটে বিক্রী করে দেয়, আমি জানতেও পারব না। কি দুর্ম্মতিই না হয়েছিল আমার। টাকাও গেল, গোরুও গেল। তায় আবার এই ঝামেলা। অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না। হ্যারিকেন জ্বেলে আর একবার খুঁজে দেখতে হবে।

এদিকে এক সময় হাওয়ায় দোর খুলে যেতেই মনা ঘর থেকে বেরিয়ে আগচালায় নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রান্নাঘরে টবু-বুবু মুখ গুমড়ো করে একধারে বসে আছে। দ্বারিক যদি টের পায়, মনা ঘরের ভেতর রয়েছে? মনার কথা ভেবে তারা কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিল না।

বুবু ফিস্-ফিস্ করে বললে: দিদিরে! কি হবে?

টবু উত্তর দিল না।

মা রান্নাঘরে ঢুকে বললে: হয়েছে কি তোদের! চুপ করে বসে আছিস্ যে?

টবু-বুবু পরস্পরের দিকে তাকাল। মা বললে: এখন ত মনাকে ও ঘরটায় লুকিয়ে রাখলি। কিন্তু কাল দিনের বেলা?

মার কাছে এমনভাবে ধরা পড়ে টবু-বুবু অপ্রস্তুত না হয়ে মাকে দু'পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে বললে: মনা থাকবে।

মা বললে : ছাড় আমাকে।

টবু বললে : বাবাকে বলো না মা, মনা থাকবে।

মা বললে : মনা এখন আর আমাদের নেই। মহাজন পাওনা টাকার সুদের উপর নিয়ে গেছে।

কিন্তু বুবু কিছুতেই শুনবে না। সে বলে, মনা মহাজনের না—মনা কারো না, মনা ওর।

মা ভাত নামিয়ে বললে : পিঁড়ি পেতে জল নিয়ে খেতে বস।

টবু-বুবু বেঁকে বসল। তারা খাবে না—কিছুতেই খাবে না, যতক্ষণ না মা বলে, মনাকে দ্বারিক নিয়ে যাবে না। মনা থাকবে।

মা রেগে ঠাস্-ঠাস্ করে টবু-বুবুর পিঠে দু'ঘা লাগিয়ে দিয়ে বললে : দিন নেই রাত নেই—মনা মনা মনা! আর পারিনে বাপু!

টবু-বুবু কাঁদতে লাগল।

: মা!···দাওয়ায় উঠতে উঠতে বাবলু ডাকল।

রান্নাঘর থেকে মা বললে : বাবলু এলি?

বাবলু বই-খাতা শোবার ঘরে রেখে রান্নাঘরে ঢুকে বললে : এরা কাঁদছে যে!

মা বললে : কাঁদুক। তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

বাবলু টবু-বুবুর পাশে বসে বললে : আজ আমাদের গানের ক্লাস ছিল। জান মা, আমি হারমোনিয়াম বাজাতে শিখে গেছি।

তারপর টবু-বুবুর দিকে বারেক তাকিয়ে বাবলু বললেঃ কাল আমি ওদের পাঠশালায় নিয়ে যাব মা! সুরুচি দিদি বলেছেন, কাল থেকে ছোটদের ক্লাস সুরু হবে।

টবু-বুবুর কান্না থেমে এসেছিল। এবার তারা একসঙ্গে আপত্তি জানালঃ আমরা যাব না। কক্ষণো যাব না।

বাবলু বললেঃ যেয়ো না। কেউ তোমাদের যেতেও বলছে না।...দাও মা খেতে।

মা তিনজনকে খেতে দিল। এবার টবু-বুবু আর খেতে আপত্তি করল না। টবু খেতে খেতে বললেঃ পাঠশালায় গান হয়—না দাদা?

ঃ হুঁ।...বাবলু বললে।

বাইরে উঠান থেকে দ্বারিকের স্বর ভেসে এলঃ রাখাল, বাড়ী আছ?

বাবলু রান্নাঘর থেকে বললেঃ কে?

লণ্ঠন ও লাঠি হাতে দ্বারিক আগচালার দিকে যেতে যেতে বললেঃ এই—এই যে বাছাধন!

তারপর দ্রুত আগচালায় ঢুকে মনাকে টেনে বার করে আনল উঠানে। বাবলু আবার বললেঃ কে, কে ওখানে?

দ্বারিক কঁকিয়ে উঠলঃ নবাবের ব্যাটা নবাব, বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে পার না কে! ওখান থেকে 'কে কে' করছ!

দ্বারিকের গলা শুনে টবু-বুবুর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। মা

বললেঃ না তোদের নিয়ে আমি কি যে করব!···মনা যদি সত্যি-সত্যিই তোদের হয়, কেউ কেড়ে নিতে পারবে না ওকে।

বাইরে মনাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে দ্বারিক। এক হাতে তার লণ্ঠন ও লাঠি অন্য হাতে মনার গলার দড়ি। দ্বারিক আপন-মনে বলছিলঃ এদিকে আমি বন-বাদাড় ঘুরে ঘুরে হয়রান আর তুমি এখানে, এঁ্যা? মেরে হাড় গুঁড়ো করে দিতে ইচ্ছে করছে। নেহাৎ কৃষ্ণের জীব বলেই বেঁচে গেলে।

সহসা পায়ের সামনে কি একটা দেখে দ্বারিক লাফিয়ে উঠল। হাত থেকে তার লণ্ঠনটা নীচে পড়ে দপ্ করে নিভে গেল। সাপ নয়—দড়ি! দ্বারিক মনার গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে অন্ধকার পথে এগিয়ে চলল।

ঃ কপালের দুর্ভোগ!···বিড়-বিড় করে সে বললেঃ লণ্ঠনের চিমনিটাও গেল।

সকাল থেকে টবু-বুবু মুখ ভার করে বসে আছে। মা ঘর ঝাট দিচ্ছিল। টবু-বুবুর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললেঃ আবার তোরা মুখ ভার করে বসে আছিস্! হাড়মাস জল হয়ে গেল আমার।

রাখাল উঠানের এক কোণে কুমড়োগাছে জল দিচ্ছিল। টবু-বুবুর দিকে তাকিয়ে বললেঃ কাল দত্তগ্রামে চাঁদকপাল সাদা বাছুর দেখে এসেছি তোদের জন্য। আবার যেদিন দত্তগ্রাম যাব নিয়ে আসব'খন। মনার চাইতে ঢের সুন্দর দেখতে।

কিন্তু টবু-বুবুর কোন উৎসাহই দেখা গেল না। রাখাল ডাকল: বুবু!

বুবু ঠোঁট ফুলিয়ে বললে: চাইনে।

রাখাল বললে: অতই যদি ত আগে বলিস্ নি কেন? একবার বেচে দিয়েছি, এখন কেমন করে ফিরিয়ে আনি?

বাবলু পাঠশালা যাচ্ছিল। মা বললে: যাবার পথে ধাইমাকে একবার আসতে বলিস্ বাবলু!

বাবলু টবু-বুবুর দিকে তাকিয়ে বললে: ধাইমাকে তোরা ডেকে নিয়ে আয় না। ওপথে গেলে আমার দেরী হয়ে যাবে।

টবু-বুবু সাড়া দেয় না। মা বললে: যাবি তোরা?

অন্যান্য দিন পাড়ায় যাবার নাম শুনেই টবু-বুবু আনন্দে নাচতে সুরু করে। কিন্তু আজ তাদের কোন উৎসাহ নেই। মা বললে: কি রে টবু?

টবু উঠে দাঁড়াল।

মা বললে: বাড়ীটা মনে আছে ত? পশ্চিমদিকের পথে চারখানা বাড়ীর পরেই ধাইমার বাড়ী। পথ চিনে যেতে পারবি ত?

টবু মাথা নাড়ল। মা বলল: যাবি আর আসবি। আর কোথাও যাস্ নি যেন।

সবুজ গালিচার উপর রূপালি সুতোর মত গাঁয়ের পায়ে-হাঁটা পথে ভাই-বোন হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে। এক-একখানি বাড়ীর সীমানা পার হয়ে খানিকটা গাছগাছড়া ও ঝোপ-ঝাড়ে ভর্ত্তি

জঙ্গল। দিনের আলোয় এসব ঝোপ-ঝাড়ে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা গাছের ফল কুড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এক জায়গায় কয়েকটা গোরু চরে বেড়াচ্ছে। গোরু দেখে টবু-বুবুর মনার স্মৃতি নতুন করে জেগে উঠল।

ঃ দিদিভাই !···বুবু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে ঃ আমার মনা !

মনার কথা ভেবে টবুরও কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু বুবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে ঃ কাঁদে না। ধাইমার বাড়ী যেতে হবে না আমাদের ?

ঃ আমার মনা !···ঠোঁট ফুলিয়ে বুবু বললে।

হেঁটে হেঁটে দ্বারিকের বাড়ীর সামনে আসতেই রাস্তা থেকে তারা দেখতে পেল, উঠানে খুঁটীতে মনা বাঁধা রয়েছে ! বুবু থমকে দাঁড়াল। টবু বুবুকে হাত ধরে টানতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্বারিক লাঠি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে নেমে মনার চারপাশে পায়তারা করে বলছিল ঃ হতভাগা গোরু। বশ মানবে না ? আমার রক্ত জলকরা সুদের টাকার বদলে তোমায় ঘরে এনেছি, মনে থাকে যেন।···মারের চোটে ভূত ভাগাব।

তারপর ঘা কয়েক ওর পিঠে লাগিয়ে দিয়ে বললে ঃ পালাবি আর কখনো ?

ঃ হাম্‌-বা ! হাম্‌-বা !···মারের চোটে খুঁটীর চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে মনা চেঁচাতে লাগল।

দ্বারিক বলতে লাগল ঃ এবার—এবার কে তোকে বাঁচায় ? পালাবি আর কখনো ?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুবু সহসা ডুকরে কেঁদে উঠল : মাগো !

কান্না শুনে দ্বারিক ফিরে তাকাল।

: এখানেও এসেছিস্ তোরা ?···দ্বারিক চেঁচিয়ে বললে : পুচকে শয়তান সব। দূর হ' এখান থেকে, তা না হলে এমনি করে তোদেরও মারব।···দ্বারিক তেড়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

টবু-বুবু ভয় পেয়ে উল্টোদিকে ছুটতে লাগল। ছুট ছুট—অবশেষে তারা রাখাল-ঠাকুরের বেদীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। কদমগাছের তলায় সদ্য-নিকানো ঝকঝকে পরিষ্কার মাটির তৈরী বেদী। চাষীদের বিশ্বাস এখানে রাখাল-ঠাকুর থাকেন। রাখাল-ঠাকুর গাঁয়ের লোকের বন্ধু, কারো উপকার ছাড়া অপকার করেন না। চাষীরা প্রায়ই রাখাল-ঠাকুরের নামে মানত করে—ঠাকুর, আমার গোরু হারিয়েছে খুঁজে দাও, তোমার নামে হরির লুট দোব।···এমনি কত লোকের কত কি কাজ করে দিয়ে রাখাল-ঠাকুর ভোগ খেয়ে থাকেন !

টবু-বুবু মনার দুঃখে এত বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে, বাড়ীর কথা, ধাইমার কথা তারা ভুলে গেল।

অবশেষে বুবুই প্রথমে কথা কইল : দিদিভাই, মনাকে মেরে ফেলবে !

টবু বললে : গোরু মারলে আর-জন্মে গোরু হতে হয়।

অতদিন অপেক্ষা করতে বুবু রাজী নয়। বললে : এজন্মে হয় না কেন দিদি ?···কিন্তু নিজের প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে বুবু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে : দিদিরে ! আমার মনাকে এনে দে।

নতুন পাঠশালা

সহসা রাখাল-ঠাকুরের বেদীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই, টবু বললেঃ এস ঠাকুরকে নম করে বলি আমাদের মনাকে এনে দিতে।

বুবু টবুর পাশে হাঁটু গেড়ে নমস্কারের ভঙ্গীতে বসে বললেঃ ঠাকুর সত্যি-সত্যি মনাকে এনে দেবে—দিদিভাই ?

টবু বললেঃ ঠাকুর খুব ভাল। যে যা চায়, তাই পায়।

বুবু একটু ভেবে হতাশ-স্বরে বললেঃ ঠাকুর এনে দিলে কি হবে, বুড়ো আবার এসে নিয়ে যাবে যে।

টবু বললেঃ নিক না একবার। ঠাকুর বুড়োর ঘাড় মটকে দেবে।

টবু-বুবু তখন হাত জোড় করে একসঙ্গে বলতে লাগলঃ হে ঠাকুর! তুমি খু-উ-ব ভাল। আমাদের মনাকে ফিরিয়ে দাও। তোমার কাছে আমরা আর কিছু চাইনে।

টবু একটু ভেবে বললেঃ কিন্তু ঠাকুরকে কি দেবে ?

বুবু বললেঃ আমাদের নতুন গাছের পেয়ারা। লুকিয়ে এনে দোব, কেউ জানবে না।

নির্জ্জন দুপুর। আশে-পাশে কোথাও জনপ্রাণী নেই। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদের মতই সহসা কদমগাছে স্নিগ্ধ হাওয়া ছুটল। ক্লান্ত ভাই-বোন বেদীতে হেলান দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মনার স্পর্শে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনা তখন বুবুর গালে নাক লাগিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলছিলঃ মোঁ-উ-উ!

এমন ভাবে মনাকে পেয়ে টবু-বুবুর আনন্দ আর ধরে না। মনার পিঠে কালসিটে দাগ দেখতে পেয়ে টবু বললেঃ মেরেছে!

বুবু একটু ভেবে বললে : বাড়ী গিয়ে চুণ-হলুদ লাগিয়ে দিস্ দিদি-ভাই, তখন আর ব্যথা করবে না মনার।

সহসা দূরে দ্বারিককে দেখে টবু-বুবুর মুখ শুকিয়ে গেল। বুবু বললে : বুড়ো আসছে রে দিদিভাই !

টবু বললে : ঠাকুর মনাকে এনে দেয় নি ? মনাকে নিয়ে যেতে কিছুতেই দোব না আমরা।

পরক্ষণেই দ্বারিক কাছে এসে বললে : এই যে আবার তোরা মনাকে ডেকে এনেছিস্। বলি, মনার মালিক আমি না তোরা ?

: আমরা।···টবু-বুবু মনার গলা জড়িয়ে ধরে বললে।

সহসা এরা এত সাহস কি করে পায় ভেবে দ্বারিক বিস্মিত হল। বললে : বটে ?

বুবু বললে : মনা আমাদের। ঠাকুর এনে দিয়েছে।

ঠাকুরের নাম শুনে দ্বারিক দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বেদীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললে : ঠাকুর এনে দিয়েছে ! ঠাকুরের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোদের জন্য গোরু চুরি করছে আজকাল ! পুচকে শয়তান সব।···বলতে বলতে দ্বারিক মাটি থেকে একটা কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে বললে : সরে দাঁড়া, তা না হলে এই কঞ্চি তোদের পিঠে ভাঙ্গব।

টবু-বুবু তেমনি মনার গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। দ্বারিক দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে এসে মনার গলার দড়ি ধরে দিলে এক টান।

ধাক্কা লেগে বুবু মাটিতে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল : মেরে ফেলল রে !

দ্বারিক তখন গায়ের ঝাল মেটাতে মনার পিঠে ঠাস্-ঠাস্ করে মারতে লাগল।

ঃ নেমকহারাম! পাঁজি গোরু!...দ্বারিক বলতে লাগল ঃ ছুটে ছুটে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে এল। কাজকর্ম্ম সব শিকেয় উঠল। চল্— চল্ বাড়ী।

দ্বারিক যতই মনাকে মারতে লাগল টবু-বুবুর গলার স্বর ততই পর্দ্দার পর পর্দ্দা চড়তে লাগল। তারা এমন গলা-ফাটানো কান্না সুরু করল, যেন দ্বারিক তাদেরই মারছে।

সাব-ডেপুটি ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ঝোপের আড়ালে কদমতলায় ছোট ছেলেমেয়ের কান্না শুনে, ঘোড়া থামিয়ে একলাফে নীচে নেমে এল।

সহসা সাব-ডেপুটিকে সামনে দেখে দ্বারিক হাত তুলে বললে ঃ সালাম হুজুর!

টবু-বুবুরও কান্না থেমে গেল। সাব-ডেপুটি দ্বারিককে বললে ঃ ব্যাপার কি? এরা কারা আর কাঁদছেই বা কেন?

দ্বারিক বললে ঃ এরা হুজুর রাখাল তাঁতির ছেলে-মেয়ে।...কি নাম রে তোদের?

টবু-বুবু উত্তর দিল না, ফোঁপাতে লাগল।

সাব-ডেপুটি বললে ঃ কিন্তু এরা কাঁদছে কেন, সেকথার জবাব দিলেন না ত!

দ্বারিক বললে ঃ রাস্তা থেকে এদের চীৎকার শুনে আপনি হয়ত

ভাবছিলেন, কেউ ওদের মারছে। জিজ্ঞেস করুন না হুজুর, আমি ওদের মেরেছি কিনা।…এমন দুষ্টু ছেলেমেয়ে হুজুর গাঁয়ে আর নেই।

সাব-ডেপুটি তীব্রস্বরে বললেঃ আমার কথার সোজা উত্তর দিন। এরা কাঁদছিল কেন ?

দ্বারিক বিরক্তি চেপে বললেঃ তা ওরা যদি কাঁদে হুজুর, আমি ত আর ওদের মুখ সেলাই করে দিতে পারি না। পরের ছেলেমেয়ের উপর আমার কি অধিকার !

সাব-ডেপুটি রেগে বললেঃ আমার কথার উত্তর এখনো পাই নি। আপনি জানেন ছোট ছেলেমেয়েদের উপর অত্যাচার করা আইনে দণ্ডনীয় ?

আইনের কথা শুনে দ্বারিকের গলার স্বর মোলায়েম হয়ে এল। বললেঃ হুজুর, আমি কেন ছোট ছেলেদের অত্যাচার করতে যাব ? ছি ছি ! গাঁয়ে আমারও ত একটা মান-সম্ভ্রম…ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি। এই যে গোরুটি দেখছেন,—

কেশে গলা সাফ করে দ্বারিক বলতে লাগলঃ যত নষ্টের গোড়া এই-ই। ক'দিন আগে রাখাল ওটা আমার কাছে বিক্রী করেছে।

সাব-ডেপুটি বললেঃ পাওনা টাকার সুদের উপর আপনি নিয়ে আসেন নি ত ?

ঃ সে একই কথা হল হুজুর !…দ্বারিক বললেঃ এখন হয়েছে কি, এরা বার বার মনাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। হুজুর, আপনি এদের একটু বলুন ত। গোরুটার উপর ওদের আর কোন অধিকার নেই।

নতুন পাঠশালা

সাব-ডেপুটি বললেঃ তোমাদের বাবা গোরুটা বেচে দিয়েছে। ওর জন্য আর কান্নাকাটি করো না।

বুবু জোর গলায় বললেঃ মনা আমার।

ঃ দেখলেন ত হুজুর!…দ্বারিক বললেঃ কেমন বেহায়া ছেলেমেয়ে! আপনার কথার উপর কথা বলতে ভয় পায় না!

সাব-ডেপুটি মাথা নেড়ে বললেঃ সে-কথাই ভাবছি। আচ্ছা গোরুটার গলার দড়ি খুলে দিন ত!

দ্বারিক একটু ইতস্তত করে মনার গলার দড়ি খুলে দিতেই সে ছুটে এসে টবু-বুবুর গা শুঁকতে লাগল। টবু-বুবু মনার গলা জড়িয়ে বললেঃ মনা! লক্ষ্মী মনা!

দ্বারিক কঞ্চি নিয়ে মনার দিকে যাচ্ছিল। সাব-ডেপুটি বাধা দিয়ে বললেঃ দাঁড়ান। সত্যি-সত্যিই গোরুটা ওদের। ওদের বাবা গোরুটা যদিই বা আপনাকে দিয়ে থাকে, শিশুর সম্পত্তির উপর আপনার কোন অধিকার নেই।

দ্বারিকের মুখ বিবর্ণ হয়ে এল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সাব-ডেপুটির কথা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেঃ হে হে হে! বলেন কি হুজুর!

সাব-ডেপুটি বললেঃ আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—ঐ গোরুটির উপর আপনার কোন অধিকার নেই, বাস্! মনে রাখবেন, তমিজুদ্দীন সাব-ডেপুটির যেমন কথা তেমন কাজ।

দ্বারিক এবার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। ম্লানস্বরে বললেঃ

আপনি যখন বলছেন হুজুর, তাই সই। যাই, দেখি রাখালের কাছ থেকে টাকাটা আদায় হয় কিনা।

বারেক মনার দিকে তাকিয়ে দ্বারিক রাখালের বাড়ীর পথ ধরল।

সাব-ডেপুটি বুবু ও টবুর পিঠ চাপড়ে বললেঃ খুসী ত! এবার থেকে মহাজন আর কখনো মনাকে নিতে আসবে না। মনা তোমাদের। মনাকে নিয়ে এবার বাড়ী যাও।

সাব-ডেপুটি ঘোড়ায় চড়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হল।

এদিকে মা টবু-বুবুর সন্ধানে সারা গাঁ পই-পই করে খুঁজে অবশেষে রাখাল-ঠাকুরের কাছে ছুটে এল মানত করতে।

দূর থেকে মাকে দেখতে পেয়ে টবু-বুবু চেঁচিয়ে উঠলঃ মা, মনা আমাদের।

মা রেগে বললেঃ হতচ্ছাড়া ছেলেমেয়ে, এখানে এসে বসে আছে, আর আমি ভেবে ভেবে মরি!

বুবু বললেঃ মনা আমাদের। ডেপুটিসাব বুড়োকে বকেছে আর বলেছে, কক্ষণো মনাকে পাবে না।

মা টবুর দিকে তাকিয়ে বললেঃ সত্যি?

টবু মাথা নাড়ল।

টবু-বুবুর খুসীতে মা দুপুরের ছুটাছুটির কষ্ট ভুলে গেল। মনাকে নিয়ে তারা বাড়ী চলল।

আদর্শ গ্রামের গোড়া-পত্তন

সুরথের পাঠশালায় সমস্যা দেখা দিল, ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিন নিয়ে। শিক্ষার্থীদের টিফিনের বন্দোবস্ত করা, নতুন পাঠশালার অন্যতম দায়িত্ব। ছোটদের শরীর গঠনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য একান্ত আবশ্যক। খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় যে-সব উপাদান ঘরে জুটে না, বিদ্যালয়ে তা পূর্ণ করে দিতে হবে। কারণ, কেবল সুস্থ ও সবল শিশুই পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের অধিকারী হতে পারে। রুগ্ন উপবাসী শিশুকে দিয়ে নতুন পাঠশালা চলতে পারে না।

শিশুদের টিফিনের কথা বলতে গেলে, প্রথমেই দুধের কথা মনে পড়ে। আমাদের শিশুদের প্রধান অভাব দুধের। গ্রামে ক'জন চাষীর ঘরেই বা দুধ থাকে! যদি কারো ঘরে দুগ্ধবতী গাভী থাকে, জীবিকার্জ্জনের দায়ে, সে দুধ তাকে চড়া দামে বাজারে বিক্রী করতে হয়—নিজের শিশুদের বঞ্চিত, উপবাসী রেখে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গোড়ার কথা হচ্ছে, আত্মনির্ভরশীলতা। শিক্ষার্থীদের টিফিনের ব্যয় বহন করবার সামর্থ্য অবশ্য গ্রামের চাষীদের নেই, তা ছাড়া বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকা চলে না। আর অর্থ-সাহায্য যদিই বা পাওয়া যায়, গ্রামদেশে শিক্ষার্থীদের আবশ্যক অনুযায়ী খাঁটী দুধ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই সুরথ নতুন পাঠশালার তত্ত্বাবধানে

একটি গো-শালা করলে। পরেশবাবু নিজে দেখে শুনে কয়েকটা দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করে আনলেন। কিন্তু গো-শালা পরিচালনার কাজও শিক্ষা সাপেক্ষ। উপযুক্ত খাদ্য ও যত্নের অভাবে ভাল গাভীও বিগড়ে যায়। আবার সাধারণ গোরুকে বৈজ্ঞানিক ভাবে খাদ্য দিয়ে আশাতীত উন্নত করা যায়। বছর খানেক হাতে-কলমে শেখার পর, সুরথের গো-শালা এখন ভালই চলছে। পাঠশালার ছেলেমেয়েরাই গো-শালার যাবতীয় কাজ করে। আজকাল তারা সবাই গো-শালা থেকে রোজ একপো করে টাটকা দুধ টিফিন খায়।

দুধ ছাড়াও শরীর গঠনের জন্য প্রচুর শাকসব্জী ও টাটকা ফল-মূলের দরকার। রাঙামাটি গ্রামে অন্যান্য গ্রামের মতই পতিত জমির অভাব নেই। এ-সব জমিতে কপি, টম্যাটো, বেগুন, লাউ, মিষ্টিকুমড়ো, ঝিঙ্গে, করলা প্রভৃতি সব্জী, ও আম, পেঁপে, তরমুজ, শশা, আতা, কালজাম প্রভৃতি ফলের চাষ অল্প আয়াসেই করা যায়। এ সম্বন্ধে চাষীদের উপদেশ দিলে তারা মুচকি হেসে বলে: এ-জমিতে শাকসব্জী ভাল জন্মে না।...কিন্তু সার ব্যবহার করে যে জমির উৎ-পাদিকাশক্তি আশাতীত বাড়ানো যায়, একথা তাদের মনেই পড়ে না। আসল কথা উদ্যম ও উৎসাহের অভাব। গান্ধীজির কথায় শ্রমের সঙ্গে বুদ্ধির অসহযোগ ঘটেছে, তাই গ্রামগুলো ক্ষয়রোগীর মত দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

পরেশবাবুর বাড়ীর সামনে কয়েক বিঘে পতিত জমি ছিল। সুরথ নতুন পাঠশালার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে শাকসব্জী ও ফলমূলের

চাষ করে গ্রামবাসীদের চোখ খুলে দিলে। দ্বিতীয় বছরে নতুন পাঠশালার বাগানের ফসল এত ভাল হল যে, শিক্ষার্থীদের প্রচুর বিলিয়ে দিয়েও গড়পড়তা মাসে দু'শ টাকার শাকসব্জী বিক্রী করতে লাগল তারা। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ টাকায় পাঠশালায় ক'জন নতুন শিক্ষক নিযুক্ত করা হল। রাঙামাটিতে সাড়া পড়ে গেল। চোখের উপর এই কাণ্ড দেখে বাড়ীতে দুটো শাকসব্জীর চাষ করতে কার না সাধ জাগে! চাষীরা নিজেদের পতিত জমিতে ও প্রাঙ্গণে সব্জীর চাষ সুরু করলে। পাঠশালার বাগানে কাজ করে অভ্যস্ত শিশুরা বাড়ীর বাগানে অবসর সময় শাকসব্জী ফলাতে সুরু করল। রাঙামাটির ঘরে ঘরে এবার সব্জীর চাষ করা হয়। একসময় এই গ্রামে দুটো পরিবারের চাহিদা মেটাবার মত শাকসব্জীর চাষও হত না। কিন্তু আজকাল গ্রামের ফসল থেকে প্রত্যেক পরিবারের চাহিদা ত মেটেই—তা ছাড়া অনেকেই হাটে শাকসব্জী বিক্রী করে বেশ দু'পয়সা উপায় করে। নতুন পাঠশালার শিক্ষার গুণে এ সম্ভব হয়েছে।

গ্রামের একটি শিশুকেও আজকাল অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা দেখা যায় না। নতুন পাঠশালায় তারা জেনেছে, স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবন-ধারণের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা একান্ত আবশ্যক। অপরিচ্ছন্নতা দেহ ও মনের শুচিতা নষ্ট করে, মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। নোংরা থাকাটাই যাদের মজ্জাগত ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা কেমন করে সৎ ও উচ্চচিন্তার অধিকারী হবে? শিশুরা শিখেছে ছেঁড়া জামা-কাপড় পরতে লজ্জা নেই—নোংরা কাপড় পরতেই লজ্জা। শুধু নিজের

শরীর ও কাপড়-জামা পরিষ্কার রাখাটাই যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিজের আবাসভূমি—ঘরদোর, জলাশয়, রাস্তাঘাট সব কিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

নতুন পাঠশালা প্রথমেই গ্রামসংস্কারের কাজে মন দিল। সুরথ ও সুরুচির নেতৃত্বে বাবলুরা মাটি কেটে পথ-ঘাট, নালা-নর্দ্দমার সংস্কার করল। জলাশয় পরিষ্কার করতে লাগল। জল-নিকাশের ব্যবস্থা করে, এঁদো ডোবা ও নালা সব বন্ধ করে দিলে তারা। তারপর সুরু করল জঙ্গল সাফাই।

রাঙামাটির প্রায় সর্ব্বত্রই জলা ও জঙ্গলের ছড়াছড়ি। এগুলো সাধারণতঃ ম্যালেরিয়ার বাহক মশার ডিপো। সুরথের নেতৃত্বে নতুন পাঠশালার ছেলেরা গ্রাম পরিষ্কার করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে বাধা পেল। এমন কি কেউ কেউ তাদের লাঞ্ছিতও করল। কিন্তু অজ্ঞ গ্রামবাসীদের নিকট বাধা পেয়ে, তারা দমল না।···অবশেষে বিরুদ্ধবাদীরাও বুঝতে পারল, অপরিচ্ছন্নতাই গ্রামের স্বাস্থ্যহীনতার একটা প্রধান কারণ। এমন কি, নতুন পাঠশালার পরাক্রান্ত শত্রু দ্বারিকও শেষ পর্য্যন্ত বাবলুদের আর বাধা দিতে সাহস করল না।··· পায়ে-চলা উঁচু সড়ক, বর্ষাকালে জল জমে ভেঙে পড়ে না, পরিষ্কার পতিত জমিতে এখানে সেখানে শাকসব্জীর বাগান, স্বচ্ছ জলাশয়—রাঙামাটি গ্রামের শ্রী ফিরে আসছে আবার।

জঙ্গল সাফাই করে পতিত জমিতে নতুন পাঠশালার শিশুরা কার্পাসের বীজ বুনলে। দু'বছরেই গাছগুলোয় তুলো দেখা দিল।

নতুন পাঠশালা

আজকাল সে-সব গাছের তুলোয় পাঠশালার কাজ চলছে। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভোরবেলা যখন গাছে গাছে লাফালাফি দাপাদাপি করে কার্পাস চয়ন করে বেড়ায়, কত ভাল লাগে দেখতে! রাঙামাটির সাত-আট বছরের শিশুরাও আজকাল কার্পাস তুলতে পারে। টবু-বুবুও আর-সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কার্পাস তুলতে যায়।

নতুন পাঠশালার ছেলেরা বার বছর বয়সেই স্নুতো কাটায় দক্ষ হয়ে উঠে। বাবলুর হাত এত পরিষ্কার যে, স্নুতো কাটায় বড়দের সঙ্গে সে টেক্কা দিতে পারে। কিন্তু বাবলুর কথা বাদ দিলেও, নতুন পাঠশালার ছেলেমেয়েরা আজকাল নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রত্যেকেই তৈরী করছে। দেখা গেছে, পাঠশালার শিশুরা যদি দৈনিক আধঘণ্টা করে স্নুতো কাটে, নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড়-জামা তৈরী করবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত স্নুতোর জন্য আর তাদের পরমুখাপেক্ষী হতে হয় না।

এগার বছরের শিশুরা প্রতি আধঘণ্টায় ১৬০ তার বা এক লট্টি স্নুতো কাটতে পারে। এ বয়সে শিশুদের স্নুতোকাটার গড়পড়তা গতি, ঘণ্টা প্রতি ৩২০ তার বা আধ গুণ্ডী। এই হারে দৈনিক আধঘণ্টা করে স্নুতো কাটলে, বছরে তারা প্রায় ৯০ গুণ্ডী স্নুতো কাটতে সমর্থ। বার থেকে ষোল নম্বরের স্নুতো যা এই বয়সের শিশুরা কাটে, এই স্নুতোর ৪ গুণ্ডীতে এক বর্গগজ কাপড় হিসাবে, ৯০ গুণ্ডীতে সাড়ে বাইশ গজ কাপড় তৈরী হয়। গ্রামের ক'টা শিশু বছরে সাড়ে বাইশ গজ কাপড় ব্যবহার করতে পায়!

বার থেকে চৌদ্দ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ চার ঘণ্টায় এক বর্গগজ কাপড় বুনতে পারে। এই হিসাবে সাড়ে বাইশ গজ কাপড় বুনতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসে সাড়ে সাত ঘণ্টা অথবা দৈনিক পনের মিনিট কাজ করতে হয়। সুতরাং, কার্পাস চয়ন, তুলো ধোনা, পাঁজ করা, সুতো কাটা ও কাপড় বোনার কাজে গড়পড়তা দৈনিক একঘণ্টা করে ব্যয় করে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের ব্যবহারের কাপড় নতুন পাঠশালা থেকে পেতে পারে। এই আত্মনির্ভরশীলতাই আদর্শ গ্রামের বুনিয়াদ।

দ্বারিক ও কবিরাজ কিন্তু প্রথমে সুরথের বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিল: মিলের কাপড় বাজারে যখন সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, সুতো কাটা ও কাপড় বোনার এসব ঢং কেন বাপু আবার! না 'স্বদেশীদের' কার্য্যকলাপই তাদের মাথায় ঢুকে না।...সুরথ চুপ করেই ছিল। যুক্তি যারা মানে না, তাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এদিকে যুদ্ধের বাজারে মিলের কাপড় দিন দিন দুর্মূল্য ও দুর্লভ হয়ে উঠল। বিরুদ্ধবাদীরা এতদিনে নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। নতুন পাঠশালার শিক্ষাই সত্যিকার শিক্ষা। অন্নবস্ত্রের ব্যাপারে যে গ্রাম পরমুখাপেক্ষী, তাকে এমনি করেই শুকিয়ে মরতে হবে।

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। এই অল্প কালের ভেতরই নতুন পাঠশালা একদল আত্মনির্ভরশীল কর্ম্মঠ কিশোর-কিশোরী তৈরী করে রাঙামাটির নতুন বুনিয়াদ গড়ে তুলতে সুরু করেছে।

নতুন পাঠশালা

সত্যিই নতুন পাঠশালা গ্রামে নবজীবনের সাড়া এনেছে। সেদিনকার পিলে-বার-করা, সর্দ্দিঝরা, ঝগড়াটে, নোংরা শিশুদের সাথে আজকের ছেলেমেয়েদের তুলনা করে অবাক হয়ে যেতে হয়। আগে যারা কথায় কথায় ঝগড়াঝাটি, মারামারি করত—খেলাধূলোয় এমন কি পথে যেতে যেতে যাদের ভেতর বিরোধ বেধে যেত, নতুন পাঠশালার মায়াকাঠির স্পর্শে তারা আজ সামাজিক দায়িত্ব-বোধ-সম্পন্ন কুশলী কর্ম্মী হয়ে উঠেছে। সবাই মিলে একসঙ্গে কি করে কাজকর্ম্ম ও বসবাস করতে হয় তারা তা শিখেছে।

রাস্তা দিয়ে দল বেধে—বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে চলে তারা। অহেতুক ভয়-ডর নেই আর কারো। তারা জেনেছে, অহেতুক লজ্জা-সঙ্কোচ ভয়-ডর মনুষ্যত্ব-বিকাশের একটি প্রধান অন্তরায়। পাঠশালা পলায়নের কথা? ভাবাই যায় না আজকাল আর।

নতুন পাঠশালা একাধারে শিশুদের খেলাঘর ও শিক্ষাকেন্দ্র।

দুপুর। পুকুরঘাটে নারকেলগাছের ছায়ায় বসে চাষীরা ঝিমায়। শীতের শেষ। মাঠে চাষ সুরু হওয়ার এখনো দেরী। এখন চাষীদের কাজকর্ম্ম বলতে গেলে নেই-ই। সব্জীবাগানে যা এক-আধটু কাজ, ছেলেমেয়েরাই তা করে। বড়রা শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে মন্থর দিনগুলো কাটায়। কিছুদিন ধরে পুকুরের জলে আবার কচুরীপানা দেখা দিয়েছে।

এই পুকুরের জলের উপর রাঙামাটির প্রায় অর্দ্ধেক লোককে

নির্ভর করতে হয়। গোড়ার দিকে পাড়ার সবাই মিলে দু'দশ মিনিট পরিশ্রম করলেই কচুরীপানা পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু চিরদিনকার অভ্যাসবশত চাষীরা কেউ খেয়ালই করল না। দেখতে দেখতে কচুরীপানায় গোটা পুকুর ছেয়ে গেল।

ভরত বললে ঃ জলটা একদম পচে গেছে।

রহিম বললে ঃ এ জল আর খাওয়া চলে না। ওপাড়ার পুকুর থেকে এবার খাবার জল আনতে হয়।

মূরত বললে ঃ যা বলেছ। কিন্তু কচুরীপানা পরিষ্কার করা দরকার।

নন্দ বললে ঃ দরকার ত বটে, কিন্তু অতবড় পুকুর সাফ করতে সাতদিন সময় লাগবে।

সাতদিন লাগবে শুনে সবার উৎসাহ যেন দপ করে নিবে গেল। রহিম তামাকু টানতে লাগল। ভরত অন্যকথা পাড়ল ঃ এই—আজ রাত্তিরে বাউল-কীর্ত্তন হবে নাকি, নন্দমামা ?

সহসা বাবলু ও তার দল-বলকে সেদিকে আসতে দেখে নন্দ বললে ঃ ছেলেরা সব কচুরীপানা পরিষ্কার করতে আসছে হে !

বাবলু, গোপাল ও ন্যাপা দলের আগে আগে আসছিল। বাবলু বললে ঃ গোটা কয়েক বাঁশের দরকার।

ন্যাপা বললে ঃ বাঁশ কেন ?

বাবলু বললে ঃ বাঁশ দিয়ে ঠেলে পুকুরের মাঝখানকার কচুরী-পানাগুলো পারে ভিড়িয়ে তবে ত উপরে তুলবে !

নতুন পাঠশালা

ছেলেদের কথা শুনে রহিম বললেঃ তোরা কি সত্যি সত্যিই কচুরীপানা সাফ করবি ?

বাবলু বললেঃ সেজন্যই ত এসেছি আমরা।

ইতিমধ্যে ছেলের দল হল্লা করতে করতে এসে পড়ল। গোপাল ও ন্যাপা দা নিয়ে ঝাড়ে বাঁশ কাটতে গেল।

ছেলেরা সব গায়ের জামা খুলে এক জায়গায় জড় করে রেখে, পুকুরের একদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকে দশ হাত দূরে দূরে এমন সুবিন্যস্তভাবে দাঁড়াল, চাষীরা ত দেখেই অবাক। নন্দ বললেঃ অত বড় পুকুরটা ঐ পুচকে ছোকরাদের সাফ করতে সারা বছর লাগবে, তোমরা দেখে নিও।

বাবলু ওদের কাছে দাঁড়িয়েছিল। নন্দর কথা শুনে বললেঃ দু'তিন ঘণ্টায় সাফ করে দিচ্ছি, নন্দমামা !

নন্দ বিদ্রূপ করে বললেঃ বেঁচে থাকলে দেখতে পাব।

গোপাল ও ন্যাপা বাঁশ নিয়ে ফিরে এল। দুটো বাঁশ বেঁধে পুকুরের এপার-ওপার জলের উপর ভাসিয়ে রেখে, কয়েকটা ছেলে দু'পাশ থেকে কচুরীপানা ঠেলে পারের দিকে নিয়ে আসতে লাগল। এদিকে তখন অন্যান্য ছেলেরা জলে নেমে টুপ-টুপ করে কচুরীপানা তুলে পারে ছুঁড়ে মারছে। সবাই কচুরীপানা তুলছে। কারো মুখে কথা নেই, নীরবে কাজ করে যাচ্ছে তারা।

মূরত উঠে দাঁড়াল ; বললেঃ আমাদের ছেলেরা কাজ করছে, আর আমরা বসে আরাম করছি !

রহিমও উঠল। বললেঃ না এ রীতিমত লজ্জার কথা। চল, আমরাও নেমে পড়ি।

গাছের নীচে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নন্দ এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙ্গল, বিকাল হয়ে এসেছে। কচুরীপানা সাফ করে ছেলেরা অনেকক্ষণ চলে গেছে।

পুকুরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই নন্দর চক্ষু চড়ক-গাছ হয়ে গেল। জলে আর একটি কচুরীপানাও নেই!

সুরথের চেষ্টায় রাখালের আর্থিক অবস্থাটা আজকাল আশাপ্রদ হয়ে উঠেছে। এখন সে সহরের কো-অপারেটিভ উইভিং স্টোর্স্‌এর সভ্য। সুতো ও ডিজাইন ওরাই সরবরাহ করে রাখালকে। মালও ওরা বিক্রী করে। কারিগর রাখাল ভালই। ওর তৈরী কাপড় ক্রেতামহলে প্রশংসা অর্জ্জন করেছে।

সপ্তায় দু'দিন রাখাল নতুন পাঠশালায় ছেলেদের বয়ন-শিল্প শিক্ষা দেয়। সুতো কাটা ও বয়ন-শিল্প বিভাগে আর একজন শিক্ষক সহর থেকে এসেছেন। কিন্তু হাতের কারিগরীতে রাখালের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

সেদিন সকালবেলা বাবলুর মা বললেঃ টবু-বুবু ঘরগুলো পরিষ্কার করব। তোমাদের ইস্কুল যেয়ে কাজ নেই আজ।

ঃ না মা, ইস্কুলে যাব।···টবু বললে।

বুবু বললেঃ আমিও যাব।

নতুন পাঠশালা

মা বিরক্তস্বরে বললেঃ কথা শোন্। বাড়ীতে অত কাজ আমি একা করে উঠতে পারব না।

টবু-বুবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীরবে কাঁদতে লাগল। গাঁয়ের আর সব ছোট ছেলে-মেয়েদের মত টবু-বুবুর কাছে ইস্কুল একটা মজার খেলাঘর। সেখানে এমন কি একদিন যেতে না পারার মত দুঃখ আর কিসে আছে! খেলাধূলোর ভেতর দিয়ে এরি মধ্যে তারা কখন প্রথম ভাগ শেষ করে দ্বিতীয় ভাগ স্থুরু করেছে, কেউ জানে না। স্থুরুচি নিজে কিণ্ডারগার্টেন ক্লাসে পড়ায়।

মা বললেঃ একি—কাঁদতে স্থুরু করলি!

বাবলু ঘরের ভেতর ইস্কুলের বইপত্র সব গুছাচ্ছিল। দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে টবু-বুবুর দিকে বারেক তাকিয়ে মাকে বললেঃ ইস্কুলে কত মজা সে ত আর তুমি জান না মা! কাল ত রোববার, আমরা সবাই মিলে ঘরের কাজ করে দোব। আজ যেতেই দাও ওদের।

মা বললেঃ তাই ত! কাল রোববার, ভুলেই গেছলাম। আগে তোমাদের ইস্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থুরুচি দিদি কি সাধ্য-সাধনাই না করত; এখন স্থুরুচি দিদি ছাড়া তোমাদের একদিনও চলে না! আর কান্নাকাটি করতে হবে না।

মার কাছে ইস্কুলে যাবার অনুমতি পেয়ে টবু-বুবুর খুসী আর ধরে না। নিজেদের ইস্কুল-ব্যাগ নিয়ে তারা উর্দ্ধশ্বাসে রাস্তায় নামল! বাবলু তাদের পেছনে আসতে আসতে বললেঃ ছুটছিস্ কেন—আমিও ত আসছি!

কিন্তু টবু-বুবু ততক্ষণ পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রাস্তার মোড়ে এসে ভোলার সাথে দেখা। ভোলা মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল। বাবলু পথ আগলে দাঁড়াল। বললে: কেমন আছিস্ ভোলা! তোকে ত আজকাল দেখতেই পাইনে।

ভোলা মুখ বিকৃত করে বললে: তোরা সব নেমকহারাম। তোদের সাথে কথা কইতে মামাবাবু আমায় বারণ করে দিয়েছে।

একদিন ছিল যখন ভোলা এমনভাবে মুখের উপর গাল দিলে, বাবলু ঠাস্ করে কষে এক চড় বসিয়ে দিত ওর গালে। কিন্তু বাবলু বদলে গেছে আজকাল। হেসে বললে: পণ্ডিতমশাই কেমন আছেন রে ভোলা?

ভোলা ফেটে পড়ল: লজ্জা করে না ও কথা জিজ্ঞেস করতে?

বাবলু শান্তস্বরে বললে: লজ্জা করবে কেন? আমরা ত কিছু অন্যায় করি নি।

ইতিমধ্যে পাঠশালা যাওয়ার পথে গোপাল, গোপা আর দু'তিনটা ছেলে-মেয়ে এসে বাবলুর সাথে যোগ দিল।

ভোলা সবার দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে: মামাবাবুর পাঠশালা ভেঙ্গে দিয়ে খুব ন্যায়টা করেছিস্, না?

গোপাল এগিয়ে এসে বললে: জানিস্ নতুন পাঠশালায় আমরা কত কি শিখছি—!

গোপা বললে: আমার হাতের তৈরী 'লেস্' সহরের প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

ভোলা ভেংচি কেটে বললে : বাজে কথা বলিস্ নি!

গোপা বললে : আয় না তুই একদিন নতুন পাঠশালায়। তখন নিজের চোখেই দেখবি।

: কক্ষণো যাব না।...ভোলা প্রতিজ্ঞা করার ভঙ্গীতে বললে : তোরা ভেবেছিস্ মিছে কথা বলে আমায় ভুলিয়ে দলে টানবি, না? ভোলারাম অত বোকা নয়।

বাবলু বললে : কে তোকে বোকা বলছে! আসছে রোববারের পরের রোববার পীরের দরগায় আমরা চড়ুইভাতি করতে যাব। পাঠশালার বাগানের শাকসব্জী ও ফলমূল দিয়ে চড়ুইভাতি হবে। তুই আসবি?

চড়ুইভাতি!...বলতে বলতে ভোলার মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। বললে : মামাবাবুকে বলব তোরা আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলি! ঠিক বলব, হ্যাঁ।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে পাশের রাস্তায় অদৃশ্য হল। ছেলেরা পরস্পরের দিকে বারেক তাকিয়ে নতুন পাঠশালার পথ ধরল।

খানিকদূর যেতেই তারা দেখল, ডানপাশে ছোট্টখালের দুপারে রহিম ও ভরত দাঁড়িয়ে রীতিমত বচসা সুরু করেছে। দুই বাড়ীর মাঝখানকার খালের মালিকানা-স্বত্ব কার—এই নিয়েই বচসা। বচসা ক্রমে কলহে পরিণত হয় আর রহিম ও ভরত পরস্পরকে মুখভরা গাল দিতে সুরু করে। বুঝি এবার মাথা ফাটাফাটিই হল। তিনহাত পরিসর ছোট্ট খালটি সারা বছর নীরবে শুয়ে

থাকে—এর মালিকানা স্বত্ব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বর্ষায় যখনই খালে মাছ পড়ে তখনই কলহ স্বুরু হয়।

বাবলু রহিমের কাছে এসে বললে ঃ ব্যাপার কি চাচা ?

উত্তর দিলে ভরত। বললে ঃ ব্যাপার আর কি, স্বার্থ! আমার খালের মাছ ও গায়ের জোরে মেরে নিতে চায়।

রহিম বাধা দিয়ে বললে ঃ খাল আমার।

বাবলুর পিছু পিছু ছেলেরাও এসে দাঁড়িয়েছে। রহিম তাদের দিকে তাকিয়ে বললে ঃ শুনেছি পাঠশালায় তোমরা নাকি নিজেদের বিচার নিজেরা কর। এ বিচারটাও তোমরা কর না হয়।

ভরত বললে ঃ বেশ ত। আমিও রাজী।

বাবলু বললে ঃ ভরতমামা, খালটা তোমাদের দু'জনেরই। অনর্থক ঝগড়া না করে, খালের মাছগুলো আধা-আধি ভাগ করে নিলেই ত সব গোল মিটে যায়। পাশাপাশি বাড়ী, ঝগড়াঝাটি করা কি ভাল ?

রহিম ও ভরত পরস্পরের দিকে তাকাল। আপোষের একটা সন্ধান পেয়ে দু'জনই খুসী হল। রহিম বললে ঃ যা বলেছ বাবলু! কথাটা আমাদের আগে মনে পড়ে নি।

ভরত বললে ঃ তা'লে এস রহিম ভাই, মাছগুলো আগে ধরে নেওয়াই যাক্।

বাবলু ও ছেলেরা চলে গেলে রহিম বললে ঃ পাঠশালা বটে স্থরথবাবুর। গাঁয়ের ছেলেদের মানুষ বানিয়ে দিলে।

ভরত তামাকু ধরিয়ে বললে ঃ যা বলেছ! ... ...

নতুন পাঠশালা

বয়ন-শিল্প বিভাগের নতুন শিক্ষক ছেলেদের কাছে বয়ন-শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাসের গল্প বলছিলেন। কেমন করে কার্পাস তুলো আবিষ্কৃত হল, তারপর সুরু হল কার্পাস তুলোর চাষ,—পৃথিবীর কোন্ কোন্ জায়গায় কার্পাস তুলোর চাষ হয়; কেমনধারা আবহাওয়া, জল ও মাটি কার্পাস তুলোর চাষের পক্ষে প্রশস্ত।… এমনি সব। ছেলেদের পাশে বসে রাখাল অবাক হয়ে শুনছিল। এসব কথা কেউ তাদের শেখায় নি। আজ ছেলেদের সাথে বুনিয়াদী পাঠশালায় বসে তার যেন চোখ খুলে গেল। যা শেখবার ও জানবার সুযোগ রাখালের জীবনে আসে নি, বাবলু সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না দেখে একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে সে।

শরাফত ও মূরত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। নতুন পাঠশালার সামনে তারা থমকে দাঁড়াল। বাইরে বারান্দায়, কোথাও বা গাছের ছায়ায়, ছেলেরা শিক্ষককে ঘিরে, দলে দলে জড় হয়ে হল্লা করছে দেখে শরাফত ও মূরত একটু নিরাশই হল। এই কি তবে নতুন পাঠশালা! কোথায় সেই ভারিক্কি-চালের নাকের ডগায় চশমা-ঝুলানো গুরুমশাই আর তার বেত! এ যে রীতিমত খেলাঘর!

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললে: যাই বল, সুরথবাবুর পাঠশালা গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের স্বভাব-চরিত্র পালটে দিয়েছে একদম।

মূরত বললে: এক হিসাবে তা কি আর কেউ অস্বীকার করে? কিন্তু ছেলেরা যে খালি খেলছেই দেখছি।

শরাফত বললে ঃ এস না ভেতরে যেয়েই দেখি কি করছে এরা।

বারান্দায় একখানি প্রশস্ত টেবিলের উপর কার্ডবোর্ড মডেলের সাহায্যে সুরথ ঘর-বাড়ী তৈরী সম্বন্ধে ছেলেদের গল্প করছিল। এক এক করে কার্ডবোর্ডের প্লেট্‌গুলো সাজিয়ে সুরথ তাদের বোঝাচ্ছিল কেমন করে ঈশানের খুঁটী থেকে সুরু করে ঘরের ছাদ অবধি তৈরী করা হয়।

ঃ আচ্ছা ঘর ত তৈরী হল।···সুরথ বললে ঃ এবার দরজা-জানালা দিতে হবে। ঘরের এদিকটা পশ্চিম, এটা পূব ; উত্তর আর দক্ষিণ। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে তোমরা পড়েছ মানুষের জীবনধারণের পক্ষে আলো-হাওয়া খাদ্যের মতই প্রয়োজনীয়। ঘরের ভেতর প্রচুর আলো-হাওয়া না এলে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।···গোপাল, জানালা-দরজাগুলো এবার তুমি বসাও।

গোপাল এগিয়ে এসে বললে ঃ এটা হল পূব—এখানে একটা দরজা ও একটা জানালা। পেছনে পশ্চিমদিকেও আর একটা দরজা থাকবে।

সুরথ বললে ঃ আর দক্ষিণ ?

গোপাল বললে ঃ যমের দক্ষিণ-দ্বার—সেজন্য দক্ষিণদিক বন্ধ রাখতে হয়।

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে মুরতকে বললে ঃ সাবাস্‌! মিস্ত্রীর ছেলে কিনা—সবই জানা ওর।

সুরথ বললে ঃ ঐখানেই ত ভুল গোপাল! দক্ষিণদিক—যেখান থেকে সবচেয়ে বেশী আলো-হাওয়া আসে, যমের দক্ষিণ-দ্বার বলে কিনা

সেদিকটাই বন্ধ করে দিলে! ওসব বুলি ভুলে যাও তোমরা। আমাদের নতুন ঘরে আমরা দক্ষিণ খোলা রাখব। যম ত যম—যমের বাবাও আসতে তখন ভয় পাবে।

ছেলেরা সবাই হেসে উঠল।

সুরথ বলতে লাগল: সহরে আলো-হাওয়ার কত দাম! যে বাড়ীর দক্ষিণ খোলা, সে বাড়ীর দাম অনেক বেশী। তাই ভাড়াও বেশী। গ্রামে আলো-হাওয়ার ছড়াছড়ি কিনা তাই ঘর তৈরী করতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির অপার করুণা আলো-হাওয়ার কথা ভুলেই যাই।...হ্যাঁ, এবার সত্যিকার ঘর তোমাদের তৈরী করতে হবে একদিন।

: সত্যিকার ঘর?...ছেলেরা শুধাল।

: হ্যাঁ গো।...সুরথ বললে: ইস্কুল-ঘর তৈরী করতে হবে না? তখন তোমাদের বিদ্যার দৌড় দেখা যাবে।

বাবলু বললে: মিস্ত্রী আসবে না?

সুরথ হেসে বললে: এলই বা মিস্ত্রী। সে ত আর একা কিছু অত বড় ইস্কুল-ঘর তৈরী করতে পারবে না।

গোপাল বললে: আমি মিস্ত্রীর কাজ করব।

সুরথ পেছন ফিরে শরাফতকে দেখতে পেয়ে বললে: শরাফত চাচা! দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসে বসো না। এস মূরতরাম!

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললে: কাজে যাচ্ছিলাম, ছেলেদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। খেলতে খেলতে ছেলেরা কিছু শিখছে বটে।

যম ত যম—যমের বাবাও আসতে ভয় পাবে

পৃঃ ২২৮

মূরত সায় দিয়ে বললে : এক হিসাবে শিখতে শিখতে খেলছেও বলা যায়।

স্থরথ নীরবে হাসল।

নতুন পাঠশালায় স্থানাভাব হয়ে পড়েছে। শুধু রাঙামাটিই নয়, আশে-পাশেকার গ্রামগুলো থেকে ছেলে-মেয়েরা নতুন পাঠশালায় যোগ দিচ্ছে। হাটে-মাঠে-ঘাটে নতুন পাঠশালার জয়-জয়কার।

পরেশবাবুর চণ্ডীমণ্ডপ ঘরটা নেহাৎই ছোট। তা ছাড়া মণ্ডপের বাইরে উঠানও তেমন প্রশস্ত নয় যে সেখানে একসঙ্গে কয়েকটা 'আউট ডোর' ক্লাস নেওয়া যায়।

সেদিন ছুটীর দিন। সকালবেলা বারান্দায় বসে পরেশবাবু ও স্থরথ ইস্কুল-বাড়ীর কথাই আলোচনা করছিল। স্থরুচি অদূরে একখানি চেয়ারে বসে সোয়েটার বুনছিল।

পরেশবাবু বললেন : ইস্কুল-বাড়ীর একটা ব্যবস্থা করতেই হয়, স্থরথ! এমন করে আর চোখ বুজে বসে থাকলে চলে না।

স্থরথ বললে : ব্যবস্থা যত শীগগির করা যায়, ততই ভাল, সেকথা ত ঠিক। কিন্তু জায়গা কোথায়?

পরেশবাবু বললেন : জায়গা আমি একটা দেখেছি। কিন্তু—

স্থরথ পরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে : ছণ্টাইএর বাড়ী ত?

পরেশবাবু খুসী হয়ে বললে : বাড়ীখানি তুমিও দেখেছ?

স্থরথ বললে : ও-বাড়ীতে পাঠশালা তৈরী করলে বর্ষায় ছেলে-

মেয়েদের নদী পার হওয়াই ত একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া এমনিতেই একটু দূরে হয়ে যায় না কি!

পরেশবাবু ম্লানস্বরে বললেন: সেকথা ভেবেই, ঐ বাড়ীখানি সম্বন্ধে আমি কিছুই স্থির করি নি।

সুরুচি মুখ তুলে বললে: ফুলবিহার পেলে চমৎকার হত।

সুরথ বললে: তা ত হতই। কিন্তু দ্বারিক যখন কিছুতেই দেবে না, ওকথা ভেবেই বা কি লাভ?

পরেশবাবু গলার স্বর নামিয়ে বললে: আমি শুনেছি সুরথ, রায়মশাই ফুলবিহার গাঁয়ের ছেলেদের দান করেছিলেন। তাই যদি হয়, দ্বারিক কেমন করে ফুলবিহার অধিকার করে বসল, আমি তাই ভাবি।

সুরথ উঠে দাঁড়িয়ে বললে: কেন, পাওনা টাকার জন্য। সুদস্য সুদ, তস্য সুদ। ব্যস্, বাড়ীখানি নীলাম।

পরেশবাবু বললেন: কিন্তু রায়মশাই মৃত্যুর পূর্ব্বে ওর ঋণ শোধ করেন নি—একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

: ও-বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই।···সুরথ বললে: সেখানেই ত যত মুস্কিল। সাংসারিক ব্যাপারে আমি চিরকালই অনভিজ্ঞ।

পরেশবাবু বললেন: কিন্তু সুরথ, দশজনের কাজে যারা জীবন উৎসর্গ করতে চায়, সাংসারিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ হলে মোটেই চলে না তাদের।

সুরথ হেসে বললে: আজকাল সেকথা একটু-আধটু উপলব্ধি করছি।

নতুন পাঠশালা

নতুন পাঠশালার প্রথম চড়ুইভাতি কাল—তোমরা ভুলে যাও নি আশা করি! সুরুচি বললে।

সুরথ ও পরেশবাবু মাথা নাড়লে—না তারা ভুলে নি।

নতুন পাঠশালায় প্রথম চড়ুইভাতি। চড়ুইভাতির নামে ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ আর ধরে না। গ্রামের ছেলেমেয়েদের বাইরে বেরোবার সুযোগ প্রায়ই হয় না। দাদা কি কাকার সাথে বছরে একবার হয়ত দু'ক্রোশ কি পাঁচ ক্রোশ দূরের গাঁয়ে কোন আত্মীয়-বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। কিন্তু দাদা-রূপী অভিভাবকের কড়া শাসনে সেই স্বল্প-সময়টুকুর জন্যও ছুটীর আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। ঠিক হল, নীচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া হবে না। কারণ অতখানি হেঁটে যেতে তাদের কষ্ট হবে। শুনে অবধি টবু-বুবুর ত কান্নাই থামে না। শেষ পর্য্যন্ত সুরুচি টবু-বুবুকে সাথে নিতে বাধ্য হল।

সেদিন ভোরে উঠে ছেলেমেয়েরা চান করে কাপড়-জামা পরে পাঠশালা ঘরে এসে জড় হল। খুসীতে সবাই টগবগ করছে। বাইরে যাওয়ার এত আনন্দ, গাঁয়ের ছেলেরা এর আগে কখনো জানত না। বাবলু এসে তাদের দলে দলে ভাগ করে, সব ছোটদের আগে পাঠিয়ে দিলে। তারপর চড়ুইভাতির এটা ওটা খুঁটিনাটি জিনিসপত্র কাঁধে নিয়ে সবাই এগিয়ে চলল পীরের দরগার উদ্দেশ্যে।

গ্রাম থেকে মাইল দুই দূরে সবুজ গাছপালায় ঢাকা ছোট্ট একটি

নতুন পাঠশালা

পাহাড়—পীরের দরগা। অসংখ্য গাছপালা ও লতাগুল্মে ভর্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মনোরম এই পাহাড়ে কবে কোন্ এক পীর এসে বসতি করেছিলেন, আজ কেউ বলতে পারে না; কিন্তু আজো তার স্মৃতি বহন করছে একটা বুড়ো বটগাছ। বুড়ো বটগাছটি আজো তার সুদীর্ঘ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। পীরসাহেব বটগাছের গোড়ায় যেখানটায় ধুনি জ্বালিয়ে বসতেন, গাঁয়ের লোক আজো সেখানকার ধূলি কুড়িয়ে নিয়ে যায়। পাহাড়টার নীচে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দীঘি।

উপরে উঠে নিমেষে ছেলেমেয়েরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক পাশে বটগাছের ছায়ায় ক্যাম্প করা হল। সুরুচি কয়েক টুকরো পাথর কুড়িয়ে এনে উনুন তৈরী করল। সুরথ জায়গাটা পরিষ্কার করে নিল। পরেশবাবু হারমোনিয়ামটা এক পাশে রেখে বললেন: এরা সব কোথায় উধাও হল, সুরথ!

সুরথ বললে: তাই ত। পালিয়েছে বোধ হয়। এবার তা'লে আমাদেরই নীচে থেকে জল তুলে আনতে হয়।

সুরথের কথা শেষ হতে না হতেই বাবলু ও গোপাল বাঁশে ঝুলিয়ে এক বালতি জল নিয়ে উপরে উঠল। জলের বালতি উনুনের পাশে রেখে বাবলু বললে: আর সব বালতি কোথায়?

সুরথ বললে: জল পরে তুলো'খন। আগে সবাইকে ডেকে নিয়ে এস। তরকারি কুটতে হবে। চাল ডাল ধুয়ে আনতে হবে, তারপর শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আনা চাই।

ঃ এক্ষুণি সবাইকে ডেকে আনছি।...বাবলু বললে। পরক্ষণেই সে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল।

দেখতে দেখতে ছেলেমেয়েরা সব রান্নাবান্নায় মেতে উঠল। আনাজ কুটা, মশলা বাটা, জল তোলা, উনুন ধরানো, হাঁড়ি চাপানো—নিজেদের ভেতর তারা কাজগুলো ভাগ করে নিয়েছে। এই যে চড়ুইভাতি এতে ছেলেমেয়েদের শরীর ও মন সজীব হয়ে উঠে। তারা উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে।

সবচেয়ে বড় কথা চড়ুইভাতির ভেতর দিয়ে শিশুরা রান্নাবান্নার কাজে দক্ষ হয়ে উঠে। এখানে হাতে করে তারা শিখে উন্নততর খাদ্য ও দেহবিজ্ঞান-সম্মত রান্নাবান্না; আর শিখে কেমন করে খাদ্যের অপচয় নিবারণ করা যায়। এখানেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের চড়ুইভাতির বৈশিষ্ট্য।

রান্না-খাওয়া সেরে বনে জঙ্গলে অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় সুরথ ও সুরুচিকে ঘিরে বসল তারা। এবার গান-বাজনা ও গল্প-গুজবের পালা।

সুরথ গল্প বলছে—কংগ্রেসের গল্প, মহাত্মার গল্প, নেতাজীর গল্প, রাজনীতির গল্প, দেশের গল্প। গল্পের ভেতর দিয়ে ছোটদের যত সহজে শিক্ষা দেওয়া যায়—অমন আর কিছুতেই না। কারণ গল্প শোনা ছোটদের সহজাত প্রবৃত্তি। উপদেশ ও বক্তৃতা বিরক্তিকর তাদের কাছে।

সুরথের গল্প শেষ হলে, ছেলেরা ধরলে সুরুচিকে একটা রূপকথায় গল্প বলতে হবে।

ঃ সত্যিকারের রূপকথা ?···সুরুচি শুধাল ঃ আচ্ছা বলছি।

কেশে গলা সাফ করে সুরুচি বলতে লাগল ঃ এক ছিল রাজপুত্র। তার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, কিন্তু আছে এক সঙ্কল্প—দৈত্যদের হাত থেকে রাজপুরী উদ্ধার করতে হবে।

শত অত্যাচার তার সঙ্কল্প টলাতে পারল না। সহসা একদিন কারা-প্রাচীরের অন্তরাল থেকে রাজপুত্র নিরুদ্দেশ হল। দেশের লোক রাজপুত্রের জন্য শোক করতে লাগল। দৈত্য স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আপদ গেছে। কিন্তু স্বস্তি তার আশঙ্কায় পরিণত হল যখন খবর এল রাজপুত্র স্বসৈন্যে রাজপুরী অধিকার করতে আসছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দৈত্যের বাহুবলের কাছে রাজপুত্র পরাজিত হল।

গল্প শেষ করে সুরুচি এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইল। ছেলেমেয়েদের কারো মুখে কথা নেই, সবাই ম্লান, বিমর্ষ। রাজপুত্রের পরাজয়ে পরাজিত।

সুরথ বলল ঃ ত্যাগ ও মহত্ত্বে তোমরা সবাই রাজপুত্রের মত বিরাট হয়ে উঠ, কামনা করি। রাজপুত্রকে আদর্শ রেখে তোমাদের জয়-যাত্রা সুরু হোক।

···একটা দিন। এসব দিনের কথা সারাজীবন মনে থাকে। এসব দিনের কথা আমরা বড় হয়েও ভুলি না। স্বপ্নের মত, হাসি-গান আর খেলাধূলোয় সারাটা দিন কেটে যায়। নিস্তব্ধ পীরের পাহাড় সহসা প্রাণ ফিরে পেয়ে জেগে উঠল। এত কথা এত গান আর এত হাসি।— ভয় হয়, সব বুঝি পালিয়ে গেল।

নতুন পাঠশালা

বিকালবেলা দ্বারিক পাশের গ্রাম থেকে শূন্য হাতে ফিরছে। দ্বারিকের মন-মেজাজ ভাল নয়। আজকাল খাতকের কাছ থেকে টাকাপয়সা সে মোটেই আদায় করতে পারছে না। ছেলেমেয়েরা দল বেধে তখন চড়ুইভাতি থেকে ফিরছে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে মূরতও অবাক হয়ে ছেলেমেয়েদের দেখছিল। দ্বারিক এগিয়ে মূরতের কাছে এসে বললে : বলি ব্যাপারখানা কি মূরতরাম !

সহসা দ্বারিককে দেখতে পেয়ে মূরতের মুখে কথা সরল না। মহাজনের পাওনা টাকা সেও শোধ করতে পারে নি। কিন্তু দ্বারিক অন্যকথা পাড়লে। ছেলেমেয়েদের দিকে ইসারা করে বললে : এরা সব গেছল কোথায় ?

মূরত বললে : আর বলেন কেন মহাজন ! সে যে কি বলে— চড়ুইভাতি করতে সব গেছল।

দ্বারিক মুখ বিকৃত করে বললে : বলি—পেটে নাই ভাত, নিধিরাম সর্দ্দার ! অমন সহুরেপানা চড়ুইভাতির মুখে ঝাঁটা। আশ্চর্য্য ! এই ক'টা লোক দেশটাকে উচ্ছন্ন করলে।

মহাজনকে খুসী করবার জন্য মূরত বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে : তা এক হিসাবে ঠিকই বলছেন মহাজন !

ভেংচি কেটে দ্বারিক বললে : এক হিসাবে নয়—সব হিসাবে। সকল হিসাবে ;—হ্যাঁ !

জোর পায়ে মূরতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল দ্বারিক।

ভোলা

পণ্ডিতের সঙ্কল্প কিন্তু অটল। একটিমাত্র ছাত্র ভোলাকে নিয়ে পণ্ডিত পাঠশালা চালাতে রাজী, তবু সুরথের পাঠশালায় যোগ দেওয়া চলে না। এদিকে ভোলাই কি আর নিয়মিত পাঠশালায় আসে? মাঝে মাঝে পণ্ডিত ওকে ডেকে নিয়ে আসে। এক একদিন পণ্ডিত ভোলাকে একটু আধটু পড়ায়। কোনদিন বা ভোলা মামাবাবুকে তামাকু সেজে দিয়েই ছুটী পায়। পণ্ডিত টেবিলে পা তুলে আরাম করে হুঁকো টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়ে।

বেচারা ভোলা! তার মনে সুখ নেই। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের সাথে আজকাল সে মিশতে পারে না। মিশতে গেলেই কেন জানি নিজেকে অপরাধী মনে হয়। পাঠশালায়, খেলার মাঠে, গাঁয়ের পথে—সর্ব্বত্র, সাথিহারা ভোলার জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাবলুরা নতুন পাঠশালায় কত মজা লুটছে। গান-বাজনা, চড়ুইভাতি—একটা না একটা কিছু লেগেই আছে নতুন পাঠশালায়। আর এখানে সে একা একা ফড়িং ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাবলুরা দল বেধে এটা-ওটা কত 'পাবলিক' কাজ করে। গাঁয়ের লোক নতুন পাঠশালার ছেলেদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভোলার মুখ ম্লান হয়ে আসে বাবলুদের প্রশংসা শুনে। নতুন পাঠশালায়

ভর্ত্তি হলে আজ সেও এমনি দশজনের প্রশংসাভাজন হয়ে উঠতে পারত।

সেদিন গোপার মুখে চড়ুইভাতির গল্প শুনে ভোলা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। পাঠশালায় ঢুকেই সে কেঁদে ফেললে।

পণ্ডিত কিছু বুঝতে না পেরে বললেঃ কাঁদছিস্ কেন? পেট-ব্যথা করছে?

ভোলা নীরবে কাঁদতে লাগল। পণ্ডিত ব্যস্ত হয়ে বললেঃ বাড়ী যেতে চাস্? তা কাঁদছিস্ কেন? বললেই ত পারিস্! পড়াশুনা যে তোর কোন কালে হবে না, সে আমি জানি।

ভোলার কান্না তবুও থামে না। পণ্ডিত বিরক্ত হয়ে বললেঃ কী বিপদ! আমাকে না বললে আমি জানব কি করে?

এতক্ষণে ভোলা মুখ তুলে তাকাল। কান্নাজড়িত স্বরে বললেঃ আমি নতুন পাঠশালায় যাব।

বিস্ময়ে পণ্ডিতের মুখে এক মুহূর্ত্ত কথা সরল না। কিছুক্ষণ ভোলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পণ্ডিত বললেঃ অবশেষে তোরও মনে এই ছিল ভোলা! তা যাবি ত যা। আমি তোকে আটকাব না।

পণ্ডিতের গলার স্বরে ভোলা চমকে উঠল। মামাবাবুকে এমন ভাবে একা ফেলে সে চলে যাবে! মুখ নীচু করে ভোলা আস্তে আস্তে বললেঃ আর কখনো ওকথা বলব না মামাবাবু!

ঃ তোমার গিয়ে মামাবাবুর জন্য মায়া হচ্ছে বুঝি?...পণ্ডিত কঁকিয়ে উঠলঃ দূর হয়ে যা', দূর হ আমার সামনা থেকে।

নতুন পাঠশালা

ভোলা অপরাধীর মত আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পণ্ডিত এক মুহূর্ত্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভোলা—নিজের ভাগ্নে ভোলাও যখন নতুন পাঠশালায় যেতে চায়, গাঁয়ের কোনো ছেলের আর এ পাঠশালায় আসার সম্ভাবনা নেই। গভীর নৈরাশ্যে পণ্ডিত এলিয়ে পড়ল চেয়ারে। এতকাল ধরে সে পাঠশালা আলগে আছে এই আশায় যে, ছেলেরা একদিন ফিরে আসবেই। না, তারা আসবে না। শূন্য বেঞ্চগুলোর দিকে তাকিয়ে পণ্ডিত নিশ্বাস ছাড়ল। গাঁয়ের ছেলেরা আর তাকে চায় না। নতুন পাঠশালায় নতুন মাষ্টারদের কাছে আজ সে পরাজিত।

না, পণ্ডিত নিশ্বাস ছেড়ে ভাবলে, ভোলাকে আর সে জোর-জবরদস্তি করে আটকে রেখে, ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে না। ভোলার সমবয়সীরা নতুন পাঠশালায় অনেকদূর এগিয়ে গেছে। নতুন পাঠশালায় যদিও পণ্ডিত কোন দিন পা দেয় নি, বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির গুণ-গান তার কানে এসে পৌঁছেছে। চোখের উপর পণ্ডিত গাঁয়ের ছেলেদের এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখে বিস্মিত হয়েছে।

বিস্মিত হবারই কথা। পাঠশালায় শিক্ষা দিয়ে গাঁয়ের ছেলেদের স্বভাব-চরিত্রের এমন আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব, পণ্ডিত কল্পনায়ও আনে নি কোনদিন। সেই সব ঝগড়াটে অপরিচ্ছন্ন শিশুদল এখন গাঁয়ের সম্পদ হয়ে উঠেছে নতুন পাঠশালার আওতায়। গাঁয়ের দশজনের অসুখে-বিসুখে, আপদ-বিপদে, কাজকর্ম্মে ছেলেরা এসে পাশে দাঁড়ায়;

আর পণ্ডিত কিনা মোহান্ধ হয়ে ভোলাকে এই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। ভোলাকে নিজে থেকেই নতুন পাঠশালায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

সুরথের উপর এখন আর পণ্ডিতের কোন অভিমান নেই। সুরথ পণ্ডিতের পাঠশালা ভেঙ্গেছে গ্রামের নতুন বনিয়াদ গড়ে তুলবার জন্য। দোষ তারই। সুরথকে সে ভুল বুঝে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু নিশ্বাস ভারী হয়ে উঠে তার। নিজের হাতে গড়া পাঠশালা, এমন ভাবে ভেঙ্গে গেল!

দ্বারিক ও কবিরাজ দাওয়ায় বসে দাবা খেলছিল। পণ্ডিতকে দেখে কবিরাজ দূর থেকে বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেঃ দাও তো হে হুঁকোটা।

দ্বারিক বললেঃ আগে চাল ফিরাও। হুঁকো টানবে'খন।

কবিরাজ দ্বারিকের কথার উত্তর না দিয়ে পণ্ডিতের হাত থেকে হুঁকোটি টেনে নিয়ে গোটা দুই দম মেরে মুখ বিকৃত করে বললেঃ খালি হুঁকো দিয়ে তামাসা করছ নাকি?

পণ্ডিত বললেঃ বয়ে গেছে আমার তোমাকে হুঁকো দিতে!

কবিরাজ হুঁকোটা দাওয়ায় ফেলে দিয়ে বললেঃ দেখলে মহাজন, পণ্ডিতের দেমাকটা দেখলে?

পণ্ডিত মাদুরের এক কোণে বসতে যাচ্ছিল। কবিরাজের কথা শুনে ধনুকের ছিলার মত লাফিয়ে উঠে বললেঃ হুঁকোটা মাটিতে ফেলে দিলে ত! দেমাকটা কার শুনি, আমার না তোমার?

কবিরাজও উঠে দাঁড়াল। বললে: খুব যে মেজাজ দেখাচ্ছ! তবু যদি লাথি মেরে পাঠশালাটা ভেঙ্গে না দিত।

পণ্ডিত ফেটে পড়ল: সাবধানে কথা বল, কবিরাজ!

কবিরাজ পণ্ডিতের মুখের কাছে হাত নেড়ে বললে: সত্যিকথা বললেই যত গায়ে লাগে। সুরথ আর পরেশ এমন যে তোমায় পথের ভিখারী করল, করেছ কিছু ওদের?

পণ্ডিত অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বললে: কি আমি করতে পারি?

কবিরাজ বললে: লালঘোড়া ছুটিয়ে দাও। রাতারাতি সব উঠে যাবে। পয়সা না থাকে ত দেশলাই-এর কাঠি আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।

দ্বারিক এতক্ষণ মুখ টিপে হেসে এদের বচসা উপভোগ করছিল। বললে: ছি ছি ওকথা বলতে নেই। পণ্ডিতের মাথায় ওসব ঢুকিয়ে দিয়ো না কবিরাজ—শেষকালে অনর্থ ঘটে যাবে।

: এসব কথার অর্থ?…পণ্ডিত বললে: আমাকে কচি খোকা পেয়েছ, না? তোমাদের মতলব আমার জানতে বাকী নেই। আমি আজই সুরথকে সাবধান করে দিচ্ছি।

কবিরাজ চোখ ছোট করে কঠিনস্বরে বললে: কিন্তু তার আগে তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি। সুরথের পাঠশালার সাথে আমাদের স্বার্থের সম্বন্ধ নেই, কিন্তু তোমার আছে। সুরথের পাঠশালা থাকুক কি উঠে যাক, আমাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু তোমার এসে যায়। এসব কথা ওদের বলতে গিয়ে নিজেই নিজের হাতে হাতকড়া পরবে।

পণ্ডিত উত্তর দিল না। মাতুরের এক কোণে বসে পড়ল নিঃশব্দে। দাবার চালটা নির্ঘাত লেগেছে দেখে কবিরাজ খুসীতে দাঁত বার করে বললেঃ তা পাঠশালা গেছেই যখন, ভেবে আর করবে কি! মহাজনের সুদী কারবারটা ত এখনো আছে।

দ্বারিক বললেঃ কারবার! কারবার কোথায়?

বলতে বলতে তার স্বর করুণ হয়ে এলঃ আর কারবার চলবেই বা কেমন করে? যারা টাকা নিয়েছে, একটা পয়সাও ফিরিয়ে দিচ্ছে না। খাতকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে আমার পায়ের তলা ক্ষয়ে গেল।··· বুঝলে কবিরাজ, টাকা চাইতে গেলেই ওরা চোখ রাঙিয়ে কথা বলে, কোর্টে যাও। মন আমার নরম বলেই ত ঘরের টাকা বিলিয়ে দিয়ে আজ এমন চোর সাজতে হয়েছে।···না, আর না।

কবিরাজ মুচকি হেসে বললেঃ তাই ত। পণ্ডিতের দেখছি দু'দিক থেকেই পোয়া বারো। ওদিকে পাঠশালা উঠল, এদিকে তোমার কারবারও উঠল।···তা এক-একটা লোক এমন মন্দভাগ্য হয়েই জন্মায়।

পণ্ডিত উঠে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণস্বরে দ্বারিককে বললেঃ ব্যাপার কি মহাজন! কবিরাজকে দিয়ে এমনভাবে আমাকে অপমান করানোর হেতুটা জানতে পারি কি?

দ্বারিক উঠে দাঁড়িয়ে বললেঃ কাজকর্ম্ম হারিয়ে দেখছি তোমার মাথার গোলমাল হল। এর মধ্যে অপমানের কথাটা কি হল? কবিরাজ বন্ধুলোক। যদি কিছু বলেই থাকে, তোমার আমার ভালর জন্যই তো বলেছে।

নতুন পাঠশালা

পণ্ডিত হুঁকোটি তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে পথে নামল। দ্বারিক পণ্ডিতের পিছু পিছু আসতে আসতে ডাকলেঃ যেয়ো না পণ্ডিত, কথা আছে, বসো।···আরে, তোমার হল কি!

পণ্ডিত কিন্তু পেছন ফিরে তাকাল না।

দ্বারিকের গলা শুনে ফুলবিহারের দরজার সামনা থেকে কয়েকটা ছোট ছেলে-মেয়ে, ইতস্ততঃ ছুটে পালাল। দেখতে পেয়ে দ্বারিক তাদের তাড়া করলঃ তবেরে পাজি ছুঁচোর দল!

কিন্তু খড়ম পায়ে বেশীদূর এগোতে পারল না। চীৎকার শুনে কবিরাজ বাইরে বেরিয়ে এল। বললেঃ কাকে তাড়া করছ মহাজন?

দ্বারিক হতাশস্বরে বললেঃ আর বল কেন! আগে তবু ছেলে-মেয়েরা মাঝে মাঝে বাগানে ঢুকত, আজকাল রোজই ঢুকে ফল চুরি করছে। শুনতে পাই, পরের বাগানে কেমন করে চুরি করতে হয় নতুন পাঠশালায় নাকি তাও শেখানো হয়!

কবিরাজ সায় দিয়ে বললেঃ তা যা বলেছ! শুধু কি চুরি? ওরা ডাকাতিও শিখছে। স্বদেশী ডাকাত!···বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল।

দ্বারিক বাড়ীর দিকে যেতে যেতে বললেঃ ঐ ফুলবিহারই আমার কাল হল। বেচে দোব, যা দাম পাই এবার সত্যিই বেচে দোব। হ্যাঁ, ঐ আপদ আর রাখব না।

দ্বারিক ও কবিরাজের উদ্দেশ্য ভাল নয়। পরেশবাবুর বাঁশবেতের

চণ্ডীমণ্ডপ, দ্বারিক ইচ্ছা করলে যে মহা-অনর্থ ঘটাতে পারে, সন্দেহ নেই। একবার আগুন ধরলে পরেশবাবুর গোটা বাড়ীটাই ভস্মীভূত হয়ে যাবে—ভাবতেও পণ্ডিতের গা শিউরে উঠে। কিন্তু কেন এই অহেতুক শত্রুতা ? সুরথেরা ত দ্বারিকের কোন অনিষ্টই করে নি।

সহসা বিছানায় লাফিয়ে উঠল পণ্ডিত। পণ্ডিতের প্রতি সহানুভূতি নয়—ফুলবিহার নিয়ে যাতে ভবিষ্যতে কোন গোলমাল না বাধে, তাই দ্বারিক সুরথকে সদলবলে গ্রাম থেকে তাড়াতে চায়। কথাটা মনে পড়তেই, পণ্ডিতের কাছে দ্বারিকের ভাবভঙ্গী পরিষ্কার হয়ে এল। আর কবিরাজ ত দ্বারিকের অনুচর মাত্র।

না, আর নয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পণ্ডিত তার কর্ত্তব্য স্থির করে নিল। ভুল মানুষ একবারই করে। ভুল সে একবারই করেছে সুরথকে অবিশ্বাস করে। দ্বারিকের মতলব ফাঁস করে দিয়ে পণ্ডিত তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে এবার। শুধু তাই নয়, ফুলবিহারের গোপন কথাও সে ফাঁস করে দেবে। পণ্ডিত তার কর্ত্তব্য স্থির করে নিল।

পরদিন সকালবেলা ভোলা উঠানে ফড়িংএর ঘুড়ি উড়াচ্ছিল। পণ্ডিত ভেতরে পা দিয়েই ডাকল ঃ ভোলা !

ঃ যাই মামাবাবু !…সাড়া দিলে ভোলা।

পণ্ডিত বললে ঃ সারাদিন ফড়িং ফড়িং ফড়িং। শেষকালে ফড়িং খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে তোকে, তোমার গিয়ে এ আমি বলে দিচ্ছি।

নতুন পাঠশালা

ভোলার মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে : তোমার জন্যই ত সব। গাঁয়ের একটা ছেলেমেয়ে আসে না ওর কাছে। নতুন পাঠশালায় যায় না বলে কেউ ওর সাথে মেশে না। বাছা আমার সারাদিন করে কি ?

ভোলা ফড়িংএর সুতোগাছি দাওয়ার খুঁটীতে বেঁধে পণ্ডিতের কাছে এসে দাঁড়াল। পণ্ডিত ভোলার দিকে স্নেহার্দ্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে : পাঠশালায় যাবি নি ?

: যাব মামাবাবু !

: তবে আয়।

মামা-ভাগ্নে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ভোলা আগে আগে যাচ্ছিল, পণ্ডিত পেছনে। রাস্তার মোড়ে এসে পণ্ডিত বললে : ওরে ভোলা ! ওদিকে নয়—ওদিকে নয়, এদিকে আয়।

ভোলা বিস্মিত হয়ে বললে : পাঠশালায় যাবেন না মামাবাবু ?

পণ্ডিত বললে : পাঠশালায়ই ত যাচ্ছি। তবে পুরানো পাঠশালায় নয় আর—নতুন পাঠশালায়।

নতুন পাঠশালায় ! আনন্দে ভোলার চোখে জল এসে পড়ল ! প্রকাশ্যে বললে : সত্যি মামাবাবু !

পণ্ডিত বললে : হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সত্যি।

সুরথ, সুরুচি ও পরেশবাবু বারান্দায় বসেছিলেন। তখনো পাঠশালার বেলা হয় নি। ব্যক্তিগত জরুরী কাজে পরেশবাবুকে কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে—তিনজনে মিলে সেই আলোচনাই

আসুন পণ্ডিতমশাই পৃঃ ২৪৫
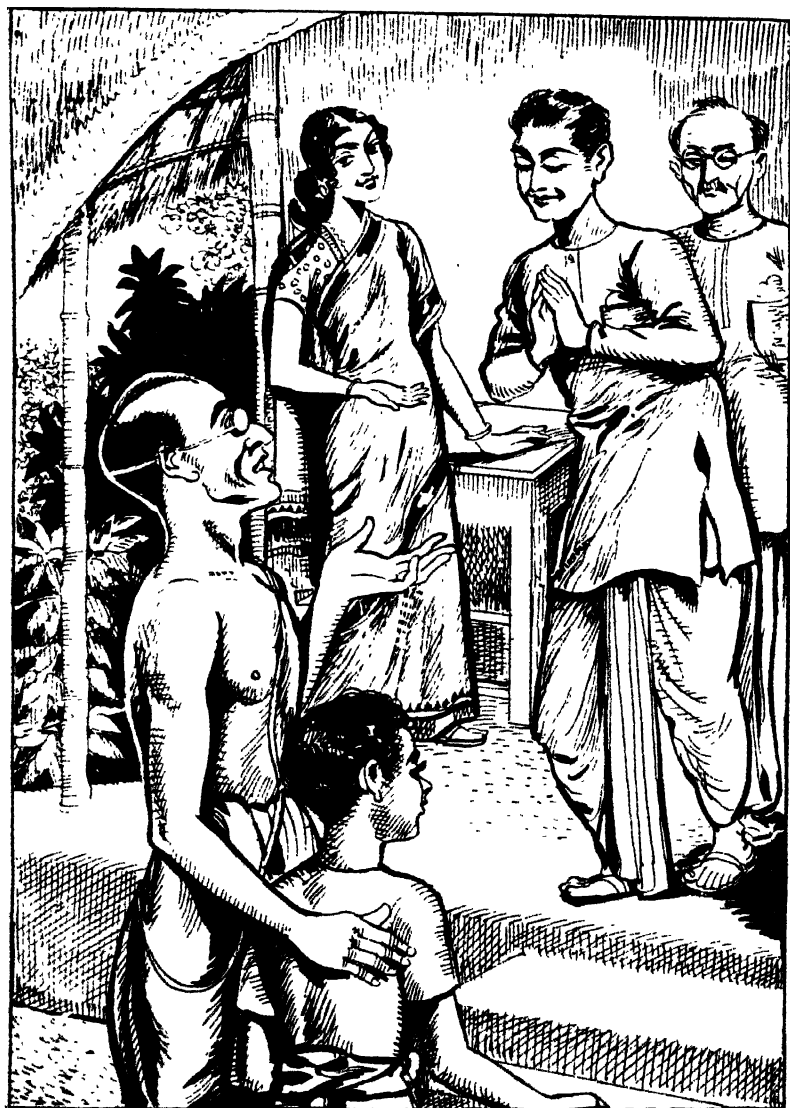
চলছিল। সহসা পণ্ডিতকে দেখতে পেয়ে সবাই বিস্মিত হল। পণ্ডিতের পেছনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল ভোলা।

সবার আগে সুরথ উঠে দাঁড়াল পণ্ডিতকে অভ্যর্থনা করতে। খুসীর স্বরে বললে : আসুন পণ্ডিতমশাই, বসুন।

সুরুচি নিজের চেয়ারখানি পণ্ডিতের দিকে এগিয়ে দিল।

পরেশবাবু স্মিতমুখে বললে : এই বোধ হয় প্রথম এখানে আপনার পায়ের ধূলো পড়ল।

পণ্ডিত চেয়ারের পিঠে হাত রেখে কম্পিতস্বরে বললে : ভোলাকে নিয়ে এলাম সুরথ! নতুন পাঠশালায় ভর্ত্তি হওয়ার জন্য কাল বড় কান্নাকাটি করছিল ভোলা।

সুরথ এগিয়ে এসে ভোলার কাঁধে হাত রেখে বললে : তুমি আস নি বলে আমাদের বড় দুঃখ ছিল ভোলা! এক্ষুণি ছেলেমেয়েরা সব আসবে। ততক্ষণ তুমি ঘুরে ঘুরে ক্লাসগুলো দেখগে'।

ভোলা পণ্ডিতের দিকে তাকাতেই পণ্ডিত বললে : আজ থেকে সুরথদার জিম্মায় তোমাকে রেখে গেলাম। উনি যা বলবেন, তাই করবে।

ভোলা ছুটে ক্লাসের দিকে চলে গেল।

সুরথ পণ্ডিতকে বললে : পণ্ডিতমশাই, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

পণ্ডিত বসল।

: আমার পাঠশালা উঠে গেছে বলে আজ আর আমার বিন্দুমাত্র

দুঃখ নেই সুরথ !···পণ্ডিত আস্তে আস্তে বলতে লাগল ঃ বিশ্বাস কর, তোমার গিয়ে এতে আমি খুসীই হয়েছি। নতুন পাঠশালা গ্রামে নতুন জীবনের বুনিয়াদ গড়ে তুলবে, এ-সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ নেই এখন।

পরেশবাবু খুসী হয়ে বললেন ঃ ঠিক এইদিনেরই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। পাঠশালার গুরুমশাই আজ নতুন পাঠশালায় এসে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রশংসা করছেন! আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

সুরথ বললে ঃ তা'লে কাল থেকে আসছেন ত, পণ্ডিতমশাই ?

পণ্ডিত ম্লানস্বরে বললে ঃ না সুরথ! শিক্ষকতা আর করব না ঠিক করেছি। বয়সও ত হয়েছে। এবার অবসর গ্রহণ করব।··· আর হ্যাঁ, কি বলছিলাম। একটা গোপনীয় কথা তোমাদের বিশেষ করে বলতে চাই, শোন।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললে ঃ রাত্তিরে বাড়ীতে পাহারাদার আছে ত ? না থাকলে, আজ রাত থেকে কাউকে রেখে দাও।

পণ্ডিতের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে সুরথ ও পরেশবাবু পরস্পরের দিকে তাকাল।

পণ্ডিত চাপাগলায় বলতে লাগল ঃ গ্রামে আপনাদের শত্রুর অভাব নেই পরেশবাবু! বাঁশের ঘর—দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে মারলেই ব্যস্। ভগবান না করুন, একটা কিছু যদি ঘটে, তখন আমার উপর যত সন্দেহ পড়বে আপনাদের।

পরেশবাবু পণ্ডিতের কথা শুনে বিমূঢ়স্বরে বললেন : বলেন কি! কিন্তু ইস্কুল-ঘর আর আমাদের বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে ওদের কি লাভ হবে, বুঝতে পারছি নে।

সুরুচি বললে : তাই যদি ওদের মনে থাকে, আমরা আর কি করতে পারি!

সুরথ সে-সব কথায় কান না দিয়ে বললে : নতুন পাঠশালার বাড়ী তৈরীর জন্য উপযুক্ত জমি পাচ্ছি না পণ্ডিতমশাই! সে এক ভাবনার কথা। এই ছোট মণ্ডপঘরে ক'টা আর ক্লাস হয় বলুন!

পণ্ডিত বললে : কেন ফুলবিহার! ফুলবিহারে পাঠশালা করা যায় না?

পরেশবাবু বললেন : সে চেষ্টা কি আর আমরা করি নি! কিন্তু দ্বারিক মহাজন ফুলবিহার আমাদের কিছুতেই দিলে না।

পণ্ডিতের ভুরু কুচকে গেল। বললে : কিন্তু কি অধিকার দ্বারিকেব! ফুলবিহার দ্বারিকের সম্পত্তি নয়, পরেশবাবু! ফুলবিহারের মালিক গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা আর,—আর সুরথ। তোমার বোধ হয় মনে পড়ে সুরথ, রায়মশাই গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের বাড়ীখানি দান করেছিলেন।

সুরথ পণ্ডিতের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললে : আপনি বলতে চান, ফুলবিহারের মালিক দ্বারিক নয়? কিন্তু পাওনা টাকার উপর সে ফুলবিহার অধিকার করে নি?

পণ্ডিত বললে : দ্বারিকের সব সুদী কারবারের দলিল লেখক ত

আমি। রায়মশাই জীবদ্দশাতেই দ্বারিকের পাওনা টাকা কড়ায় গণ্ডায় শেষ করেছিলেন, আমি তার সাক্ষী।

পরেশবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন: তাই নাকি! তবে দ্বারিক ফুলবিহারের মালিক কেমন করে হল?

পণ্ডিত বললে: ফাঁকি দিয়ে। সুরথ তখন বিদেশে। দ্বারিক ঢোল বাজিয়ে গাঁয়ের লোকেদের জানিয়ে দিলে, পাওনা টাকার উপর ফুলবিহার সে দখল করছে। গাঁয়ের কেউ এ নিয়ে কথাটি কইলে না। প্রথমতঃ রায়মশাইর সঙ্গে দ্বারিকের কারবার ছিল। দ্বিতীয়তঃ গাঁয়ের সবাই তার কাছে ঋণী। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাড়ীর তিন পাশে খাল কাটিয়ে কাঁটা-তারের বেড়া দিলে, লোহার দরজা বসালে বাড়ীর গেটে।

সুরথ বললে: কিন্তু আপনি—এতকাল আপনি কেন চুপ করে ছিলেন পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিত লজ্জিত স্বরে বললে: আমি যে তার মুহুরী ছিলাম সুরথ! তা ছাড়া, সে-সময়টা তুমি ত গাঁয়ে ছিলে না।

বাবলু ও গোপাল বারান্দায় দাঁড়িয়ে এঁদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। বাবলু এগিয়ে এসে বললে: ফুলবিহার আমাদের পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিত বললে: তোমাদের, তোমাদের বই কি! আমি কোর্টে যেয়ে সাক্ষী দোব, ফুলবিহারের উপর দ্বারিকের কোন স্বত্ব নেই। বে-আইনিভাবে সে ফুলবিহার দখল করেছে।

পণ্ডিতমশাইর খবরটা এমন বিস্ময়কর যে শিক্ষক ও ছাত্রেরা ক্লাসের

কথা ভুলে গেল। যে বাগানবাড়ী নিয়ে এত কাণ্ড তার উপর কোন অধিকার নেই দ্বারিকের!

পরেশবাবু ও সুরথ, এক মুহূর্ত্ত কারো মুখে কথা নেই। অবশেষে সুরথ বললেঃ এখন আর ফুলবিহার দখল করবার পক্ষে কোন বাধা নেই।

পণ্ডিত চলে গেলে পরেশবাবু বললেনঃ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উনি আমাদের পক্ষে থাকবেন ত? আদালতে গিয়ে শেষে যদি আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিয়ে বসেন!...গ্রাম্য-রাজনীতি আমার ত জানতে বাকী নেই সুরথ!

সুরথ বললেঃ আদালত! আদালতে যাব কি করতে?

পরেশবাবু বিস্মিত স্বরে বললেনঃ তবে কি তুমি জোর করে দখল নিতে চাও? শেষকালে যদি একটা মারদাঙ্গা হয়?...না না সুরথ, আদালতের সাহায্য নেওয়াই ভাল।

সুরথ বললেঃ ফুলবিহারের মালিক আমরা। ও-ই ত জোচ্চুরি করে ফুলবিহার অধিকার করে বসে আছে। কোর্টে যেতে হয় ও-ই যাক। আমরা যাব না।

পরেশবাবু একটু ভেবে বললেনঃ আমি ত কাল যাচ্ছি। দিন পনের বাদে ফিরে আসব। তখন এ-সম্বন্ধে যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

সুরথ উত্তর দিলে না।

দাবি

পাঠশালা ছুটীর পর সেদিন বটগাছতলায় ছেলেমেয়েরা সব জড় হল। ফুলবিহারের উপর দ্বারিকের কোন অধিকার নেই, ফুলবিহার গ্রামের ছেলেমেয়েদের—পণ্ডিতমশাইর মুখে কথাটা শোনা অবধি ছেলেমেয়েদের ভেতর উত্তেজনার সীমা ছিল না। ফুলবিহারে গিয়ে দ্বারিকের হাতে ধরা পড়ে মার খায় নি গ্রামে এমন ছেলেমেয়ে খুব কমই ছিল।

ছেলেমেয়েরা সবাই চুপ করে বসেছিল। বাবলু বলতে লাগল: স্মরথদা পাঠশালা-ঘর তৈরী করবার জন্য মহাজনের কাছে ফুলবিহার চেয়েছিলেন, মহাজন দেয় নি। কিন্তু আমরা ফুলবিহার দখল করে পাঠশালা-ঘর তৈরী করব।

ছেলেমেয়েরা সবাই এক বাক্যে সায় দিল।

ভোলা এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বললে: কিন্তু মুখে বললেই ত হয় না। ফুলবিহার দখল করবে কেমন করে?

কবিরাজ হাট থেকে সে-পথ দিয়ে ফিরছিল। ছেলেরা উত্তেজিত ভাবে কি নিয়ে আলোচনা করছে জানবার জন্য রাস্তা থেকে নেমে বট-গাছের পেছনে, নীচু জমিটায়, সবার অলক্ষিতে এসে দাঁড়াল সে।

ওদিকে তখন গোপাল বলছিল: দরজা ভেঙ্গে সবাই ভেতরে ঢুকে পড়ব।

ভোলা বললে: মহাজন যখন লাঠি নিয়ে তাড়া করবে?

গোপাল বললে: মারুক না, কত মারবে? আমরা পালাব না।

পেছন থেকে একটা ছেলে বললে: আমরা বুঝি লাঠি চালাতে জানি না?

বাবলু বললে: কাল রোববার। কালই আমরা ফুলবিহার দখল করব। কিন্তু লাঠি চালিয়ে নয়—দরকার হলে মার খেয়ে। বিকাল বেলা সুরথদা ও সুরুচিদিদি ষ্টেশন থেকে ফিরে এসে দেখবেন ফুলবিহারে নতুন পাঠশালার নিশান উড়ছে।

ছেলেরা সব জয়ধ্বনি করে সায় দিলে।

কবিরাজ আর দাঁড়াল না, ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্বারিকের বাড়ীর দিকে ছুটল।

দ্বারিক বাড়ী ছিল না। এত বড় একটা সংবাদ নিজের কণ্ঠে চেপে রেখে কবিরাজ হাঁস-ফাস করতে লাগল। তালা বন্ধ দরজার বাইরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে।

ফুলবিহার দখল করবার এই চক্রান্তের পেছনে যে সুরথ ও পরেশ-বাবুর হাত রয়েছে, সে বলাই বাহুল্য। সুরথ ও পরেশবাবু ছেলে-মেয়েদের দিযে নিজেদের কাজ আদায় করে নেবার চেষ্টায় আছে—কবিরাজ একথা ভাল করেই জানে।

দাওয়ায় বসে কবিরাজ সাত-পাঁচ অনেক কিছুই ভাবতে লাগল। কিন্তু দ্বারিক ফিরল না।

রাত দশটার সময় কবিরাজ আর একবার ঢুঁ মেরে গেল। দ্বারিক তখনো ফিরে নি। বিরক্ত হয়ে কবিরাজ বাড়ী ফিরে গেল।

নতুন পাঠশালা

পরদিন ভোরবেলা। অন্ধকার তখনো ভাল করে কাটে নি, কবিরাজ ছুটে এসে দ্বারিকের দরজায় ধাক্কা দিলে।

ঘরের মাঝখানে মেঝেয় পোঁতা সিন্দুকের ভেতর আলো জ্বালিয়ে বসে দ্বারিক পয়সা গুণছিল। দরজায় শব্দ উঠতেই তার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। হাত থেকে পয়সাগুলো সিন্দুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল —ঝন-ঝন-ঝনাৎ। ডাকাত নয় ত?

এদিকে কবিরাজ আবার দরজায় ঘা দিলে: ও মহাজন, মহাজন!

গলার স্বর ঠিক ধরতে না পেরে দ্বারিক ভাঙ্গাস্বরে বললে: কে বাবা, অত রাত্তিরে আমার দরজা ঠেলছ?

কবিরাজ বললে: আমি মহাজন, আমি।

কবিরাজ! দ্বারিকের সাহস ফিরে এল। সিন্দুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে: এত রাত্রে কিসের জন্য কবিরাজ!

কবিরাজ বিরক্তস্বরে বললে: রাত না দিন দরজা খুলেই ছাখো না একবার। সারারাত বসে বসে টাকা গুণলে দিনরাতের ভেদাভেদ থাকবে কেন?

কবিরাজের কথা শুনে দ্বারিক উপরে—হাওয়া-জানালায় তাকাল। তাই ত। কখন ভোর হয়ে গেছে, তার খেয়াল নেই! তাড়াতাড়ি সিন্দুক বন্ধ করে, দরজা খুলে বেরিয়ে এল দ্বারিক। বললে: সক্কাল বেলা কি মনে করে?

কবিরাজ বিরক্তস্বরে বললে: আমার পিতৃশ্রাদ্ধ কিনা। কাল বিকাল থেকে কতবার এসেছি।

দ্বারিক বললে ঃ ভেতরে এস। রফিক মিঞার তমস্সুকের মামলায় কাল সহরে গিছলাম। ফিরতি পথে বাসে জায়গা পেলাম না। হেঁটেই আসতে হল সারা পথ। কপালের দুর্ভোগ আর কাকে বলে!

কবিরাজ বললে ঃ কপালে তার চেয়েও বেশী দুর্ভোগ রয়েছে তোমার। তাই বলতে এসেছি।

ঘরের ভেতর মাদুরে বসে যতখানি সম্ভব রং ফলিয়ে কবিরাজ ফুলবিহার দখলের ষড়যন্ত্রের কথা দ্বারিককে জানাল।

বটগাছতলার সভায় সুরথ, পরেশবাবু ও তাদের দলের অন্যান্য দু'একজন লোক উপস্থিত ছিল, কবিরাজ নিজের চোখে দেখেছে। আর তারা যে সবাই লাঠি-সোটা নিয়ে আসবে সে ত জানা কথাই!

দ্বারিকের মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। করুণ-স্বরে বললে ঃ আমার বাগান-বাড়ী—আমার ফুলবিহার ওরা গায়ের জোরে দখল করবে আর আমি চুপ করে বসে থাকব? দেশে কি বিচার নেই? আইন-আদালত নেই? ধর্ম্ম নেই?

কবিরাজ বললে ঃ আমিও ত তাই বলি। যা করবার এক্ষুণি কর মহাজন! এতক্ষণে হয়ত শত্রুপক্ষে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

মূরত ও শরাফত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে দ্বারিক ছুটে বেরিয়ে এল পথে। শরাফত ও মূরত যেন দেখতে পায় নি এমনিভাবে এগিয়ে চলল।

দ্বারিক ডাকলে ঃ শরাফত মিঞা!

শরাফত ফিরে তাকাল ঃ আমায় বলছেন মহাজন?

দ্বারিক বললেঃ পাছে টাকা চাই বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছ ?

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললেঃ তা টাকা আপনার, আমি শোধ করবই মহাজন !

মূরতও দাঁড়িয়েছিল। বললেঃ মহাজনের ঋণ এক হিসাবে মরে গিয়েও শোধ দিতে হয়।

কবিরাজ এক সময়ে দ্বারিকের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বললেঃ শরাফত মিঞা, মূরতরাম ! দেশে কি ধর্ম্ম নেই, বিচার নেই, আইন-আদালত নেই ?

শরাফত দাঁড়ি নেড়ে বললেঃ তা আর নেই !

দ্বারিক করুণ-স্বরে বললেঃ আমার দিকে তাকিয়ে বল, তোমাদের দশজনের কোন উপকার করি নি ! আমার বাগান-বাড়ী সুরথ গায়ের জোরে দখল করতে আসছে, তোমরা ওকে বাধা দেবে না ?

মূরত বিস্মিত-স্বরে বললেঃ এমন কথা ত কখনো শুনি নি।

শরাফত ঘন ঘন দাঁড়ি নেড়ে বললেঃ তাজ্জব !

কবিরাজ বললেঃ আজই ওরা বাগান বাড়ী দখল করতে আসছে,—এক্ষুণি। এতক্ষণে হয়ত রওয়ানা হয়ে গেছে।

দ্বারিক করুণ-স্বরে বললেঃ আমার উপর এমন অত্যাচার—অত বড় জুলুমটা হবে, আর তোমরা সব দাঁড়িয়ে তামাসা দেখবে !... যাও, লাঠি নিয়ে সবাই বেরিয়ে এস। টাকার কথা ভেবো না। তোমাদের পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব আমি নিলাম।

শরাফত মূরতের দিকে তাকিয়ে বললেঃ মূরত ভাই, তোমার পাকা বাঁশের লাঠি আছে ত?

মূরত মাথা চুলকে বললেঃ এস খুঁজে দেখি গে'।

ওরা চলে গেলে কবিরাজ বললেঃ যত সব নেমকহারাম।

ততক্ষণে দ্বারিক দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে এসে বললেঃ বাগ্দীপাড়া থেকে আমি এক্ষুণি লোক ডেকে নিয়ে আসছি।

কবিরাজ বললেঃ ওরাও আসবে না মহাজন, তোমায় আগেই বলে দিচ্ছি।

দ্বারিক কাছার খুঁটে বাঁধা নোটের তাড়া দেখিয়ে বললেঃ এর নাম রূপচাঁদ। ইনি সব করতে পারেন। তুমি বসো, আমি ঘুরে আসছি।

পরেশবাবুকে গাড়ীতে তুলে দিতে সুরথ ও সুরুচি সকালবেলা সহরে গেছে। বয়ন-বিভাগের শিক্ষক ক'দিনের ছুটী নিয়ে দেশে গেছেন। ভোরে উঠে বাবলু সুরথকে নিজেদের মতলবের কথা জানাতে এসে দেখলে বাড়ীতে কেউ নেই।

বাবলু আর দ্বিধা করল না; সুরথের ফিরে আসার আগেই ফুল-বিহার দখল করে তারা ইস্কুল-ঘরের খুঁটী পুঁতবে—ঈশানের খুঁটী।

বেলা দশটার সময় বটগাছতলায় নতুন পাঠশালার ছেলেমেয়েরা এসে জড় হল। সুরথ ও সুরুচির সাহায্যে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা দুনিয়ার ছাত্র-আন্দোলন সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করে নিয়েছিল। আজকের অভিযানের বিশেষত্ব এই যে, নীচু ক্লাসের ছেলেরাও

ওতে যোগ দিয়েছে। প্রকাশ্যে ফুলবিহারে যেতে ছোটদের উৎসাহের সীমা ছিল না।

পরক্ষণেই জয়ধ্বনি করতে করতে যুদ্ধ ফ্রন্টের সৈনিকের মত সারি বেধে ছেলেমেয়েরা এগিয়ে চলল—ফুলবিহারের উদ্দেশে।

ধ্বনি উঠল ঃ

—নতুন পাঠশালা কি জয় !

—সুরথবাবু কি জয় !

—ফুলবিহার, আমাদের।

চাষীরা মাঠ থেকে ছেলেমেয়েদের চীৎকার শুনে ভাবল এ-ও বুঝি এক খেলা। কারণ ছেলেমেয়েরা কেউই ফুলবিহার-অভিযান সম্বন্ধে বাড়ীতে কিছু বলে নি।

পণ্ডিত দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছিল। ছেলেমেয়েদের জয়ধ্বনি শুনে, কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখলে, নতুন পাঠশালার ছেলেমেয়েদের বিরাট এক সারি এগিয়ে চলেছে। পণ্ডিতের মাথায় কিছু ঢুকল না। ভোলা তার সামনা দিয়ে চলছিল। যেতে যেতে সে বললেঃ আমরা ফুলবিহার দখল করতে যাচ্ছি মামাবাবু!

পণ্ডিত চমকে উঠে বললেঃ তবে রে হতভাগা ! মরবার সাধ হয়েছে নাকি ? বাড়ী যা, বাড়ী যা বলছি।

কিন্তু ভোলা ততক্ষণে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। টবু-বুবু যেতে যেতে পণ্ডিতের দিকে বারেক তাকাল।

পণ্ডিতকে পেছনে ফেলে ছেলেমেয়ের দল চলল এগিয়ে।

ঃ তাই ত!···পণ্ডিত আপন-মনে বললেঃ তোমার গিয়ে এখন আমি কি করি! একটা অনর্থ হতে কতক্ষণ!

পরক্ষণেই ফাঁড়ি পথে দ্বারিকের বাড়ীর দিকে ছুটল পণ্ডিত।

দ্বারিক তখন উঠানে পায়চারি করছিল। কবিরাজ গালে হাত দিয়ে দাওয়ায় বসেছিল। পণ্ডিতকে দেখে দ্বারিক বললেঃ এস পণ্ডিত, বস।

দূরে রাস্তা থেকে ছেলেমেয়েদের চীৎকার ভেসে এলঃ

—ফুলবিহার—আমাদের!

—নতুন পাঠশালা—জিন্দাবাদ!

দ্বারিক লাফিয়ে উঠল উত্তেজনায়। বললেঃ শত্রুরা আসছে কবরেজ! কিন্তু রামা ও যদু এখনো এল না যে!

কবিরাজ বললেঃ উতলা হয়ো না। ওরা যখন টাকা নিয়েছে, নিশ্চয়ই আসবে।

পণ্ডিত বারেক কবিরাজের দিকে তাকিয়ে দ্বারিককে বললেঃ রামা বাগ্দী ও যদু বাগ্দীকে দিয়ে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের খুন করাবার মতলব করেছ মহাজন?

দ্বারিক উত্তর দিল না,—উত্তর দিলে কবিরাজঃ একটু সবুর কর, নিজের চোখে দেখতে পাবে।

—ফুলবিহার—আমাদের!

জয়ধ্বনি আবার ভেসে এল। ছেলে-মেয়েরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। পণ্ডিত দ্বারিকের দিকে তাকিয়ে বললেঃ ফুলবিহার গাঁয়ের ছেলে-

মেয়েদের—একথা কি তুমি আজো গোপন রাখতে চাও, মহাজন! ছেলেদের মারপিট করে তুমি কোথায় দাঁড়াবে, সেদিকে খেয়াল আছে?

সহসা এগিয়ে এসে বজ্রমুষ্টিতে পণ্ডিতের হাত চেপে ধরল দ্বারিক। বললে: এসব কথার মানে?

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পণ্ডিত বললে: ভয় দেখিয়ে তুমি আমার মুখ বন্ধ করবে দ্বারিক! তোমার জন্য যত কিছু অন্যায় করেছি, মনে রেখো—ভয়ে নয়, চক্ষুলজ্জায়। কিন্তু আর না। এবার আমি হাটে হাড়ি ভাঙ্গব।

কবিরাজ উত্তেজনায় দাওয়া থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে: তুমি বলছ কি পণ্ডিত!

পণ্ডিত গম্ভীরস্বরে বললে: ফুলবিহার দ্বারিক মহাজনের নয়—ফুলবিহার সুরথের, গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের।

সহসা রাস্তায় কলরোল উঠল। ছোটদের চীৎকারের সাথে, রামা ও যদুর অট্টহাসি শুনে, পণ্ডিত চেঁচিয়ে উঠল: সর্ব্বনাশ!

পরক্ষণেই হাতের হুঁকো ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলল ফুলবিহারের দিকে।

কবিরাজ আমতা-আমতা করে বললে: কাজটা কিন্তু ভাল হল না মহাজন!

দ্বারিক উত্তর দিল না। মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ল।

কবিরাজ বললে: আমি বাড়ী চললাম।

দ্বারিক মুখ তুলে বললে: ও! আচ্ছা, এস।

কবিরাজ বেরিয়ে গেল।

নতুন পাঠশালা

ফুলবিহারের দরজায় লাঠি হাতে রামা ও যদু পাহারা দিচ্ছিল। ছেলেমেয়ের দল এগিয়ে আসতেই, তারা লাঠি শূন্যে তুললে ছুঁড়ে মারবার ভঙ্গীতে। ছেলেমেয়েরা কিন্তু এক পা-ও নড়ল না।

রামা পায়তারা করে বললে : কেন মিছিমিছি আমাদের বদনামীটা করবে বাছারা! বাড়ী ফিরে যাও।

যদু বললে : তোমাদের মারলে দেশের লোক আমাদের নিন্দে করবে জানি, কিন্তু উপায় কি? নূন খেয়ে ত মহাজনের নেমকহারামি করতে পারি না।

বাবলু তাদের সামনে এগিয়ে এসে বললে : দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও, আমরা ভেতরে ঢুকব।

রামা লাঠি তুলে বললে : ছোকরা মিছিমিছি পৈতৃক প্রাণটা কেন হারাবি?

উল্কার বেগে পণ্ডিত ছুটে এল। বাবলুকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রামার দিকে তাকিয়ে বললে : লজ্জা-সরম বলে তোদের কিছু নেই? টাকা খেয়ে দুধের ছেলেদের মারতে এসেছিস্! তোদেরও ত ছেলেমেয়ে আছে। ছি ছি!

যদু বললে : এই ব্যাটাই দলের চাঁই। মার ওকে।

বলে নিজেই পণ্ডিতের মাথায় এক ঘা বসালে। মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল পণ্ডিত। বাবলু জানু পেতে মাটিতে বসে পণ্ডিত-মশাইর মাথা কোলে টেনে নিল। ভোলা কাঁদতে লাগল।

: পণ্ডিতমশাই!...বাবলু আস্তে আস্তে ডাকল : হায়, এ কি হল!

নতুন পাঠশালা

পণ্ডিত মাথা টিপে ধরে চোখ মেলে তাকিয়ে উঠে বসল বললেঃ কিছু হয় নি বাবলু! ভোলা কোথায়?

ভোলা কাঁদতে কাঁদতে বললঃ মামাবাবু!

রাস্তার পাশ থেকে একখানি পাথর কুড়িয়ে যদুর মাথা লক্ষ্য করছিল গোপা। রামা ও যদু কেউ দেখতে পায় নি।

পণ্ডিত হা হা করে উঠে দাঁড়াল। বললেঃ ছি ছি গোপা! এই বুঝি তোমাদের সত্যাগ্রহ! গোপার হাত থেকে পাথরখানি নীচে পড়ে গেল।

রামা ও যদু পরস্পরের দিকে তাকাল। পণ্ডিত বললেঃ ওরে আমায় তোরা মেরেছিস্ দুঃখ নেই। মারতে চাস্, তোমার গিয়ে আর দু'ঘা মার। কিন্তু ওদের জয়যাত্রার পথে বাধা দিস্ নি। তোরা জানিস্ না, এ-বাড়ী ছেলেমেয়েদের। ওদের আটকাস্ নি, ভেতরে যেতে দে'।

রামা ও যদু আর বাধা দিল না। ছেলেমেয়েরা জয়োল্লাস করতে করতে ফুলবিহারে প্রবেশ করল।

ফুলবিহারে নতুন পাঠশালার আজ গৃহ-প্রবেশ উৎসব! দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছেলেরা আটচালা পাঠশালা-ঘর তৈরী করেছে। ছেলেদের নিজেদেরই ডিজাইন করা—এমন সুন্দর বাড়ী গ্রামদেশে খুব কমই দেখা যায়। ফুল, পাতাবাহার আর আমপাতা দিয়ে সকাল থেকেই তারা ঘর সাজাতে ব্যস্ত। টবু-বুবু বারান্দার এক কোণে বসে আমপাতার ঝালর তৈরী করছিল।

দুপুর থেকে উৎসব সুরু হবে। আশে-পাশের গ্রাম থেকে পাঁচ-

জন শিক্ষিত ভদ্রলোক আসবেন, আর আসবে চাষীরা। বক্তৃতা, নাচ, গান, নাটক, অভিনয়—সারাদিন ধরে উৎসব চলবে। পাঠশালার চাঁই ছেলেদের আজ নিশ্বাস ফেলবারও ফুরসত নেই! বাবলু ছুটে যেতে যেতে বললেঃ টবু-বুবু, বাড়ী গিয়ে চান করে খেয়ে নাও। শেষকালে সময় হয়ে উঠবে না।

গোপা এসে বললেঃ বাবলু, সুরুচিদি ডাকছেন।

ঃ যাচ্ছি।···বাবলু যেতে যেতে বললে।

পণ্ডিতের খুসী আর ধরে না! নিজের হাতে সদর দরজা সাজিয়ে পণ্ডিত লিখে দিলে—স্বাগতম্। তারপর ঘুরে ঘুরে ছেলে-মেয়েদের কাজকর্ম্ম দেখতে লাগল। বাবলুকে দেখে পণ্ডিত বললেঃ আমি বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসছি বাবলু!

বাবলু বললেঃ তাড়াতাড়ি আসবেন পণ্ডিতমশাই!

সেদিনকার অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকে পণ্ডিত একবারও দ্বারিকের বাড়ী যায় নি। আজ উৎসবের দিনে দ্বারিকের কথা মনে পড়ল তার। না, দ্বারিকের উপর পণ্ডিতের আর কোন আক্রোশ নেই। দ্বারিককে সে ক্ষমা করেছে। শুধু তাই নয়, দ্বারিকের কথা ভেবে আজ সে ব্যথিত হল। বেচারা! গাঁয়ের কেউই আজকাল ওর সাথে মেলামেশা করে না।

পণ্ডিত দ্বারিকের দাওয়ায় উঠে ডাকলঃ মহাজন!

ঃ কে?···ঘরের ভেতর থেকে দ্বারিক ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দিল।

পণ্ডিত দেখল, দ্বারিক দরজার সামনে মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে

আছে। হুঁকোয় গোটা কয়েক দম মেরে পণ্ডিত বললেঃ তোমার গিয়ে কতদিন তোমায় দেখি নি। মনটা ছটফট করছিল। ভাবলাম মহাজনকে দেখে আসি একবার।...তারপর দ্বারিকের পাশে মাদুরে বসে বললেঃ তা শরীর ভাল নেই বুঝি?

দ্বারিক নিশ্বাস ছেড়ে বললেঃ শরীরে আর কাজ কি পণ্ডিত?

সহসা দ্বারিক উঠে বসে পণ্ডিতের হাত ধরে কান্না-জড়িত স্বরে বললেঃ আমার সর্ব্বস্ব গেছে পণ্ডিত! এবার মরলেই সকল জ্বালা জুড়ায়।

পণ্ডিত সান্ত্বনা দিয়ে বললেঃ ছি, ওকথা বলো না।

দ্বারিক বললেঃ আমার গায়ের রক্ত জল করা টাকা—সারা-জীবনের সঞ্চয়—একটা পয়সাও কেউ ফিরিয়ে দিচ্ছে না। আমার বাগান-বাড়ী তোমরা কেড়ে নিলে। বল পণ্ডিত, কোন্ সুখে বেঁচে থাকব!

পণ্ডিত দ্বারিকের কাঁধে হাত রেখে বললেঃ কেন ওসব কথা ভাবছ?

ঃ ভাবব না?...দ্বারিক বোকার মত বললেঃ ভাবতে মানা করছ?

পণ্ডিত বললেঃ ভুলে যাও।

তারপর হুঁকোটা দ্বারিকের হাতে দিয়ে বললেঃ আজ ফুলবিহারে নতুন পাঠশালার গৃহ-প্রবেশ উৎসব। আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

দ্বারিক হুঁকোয় দম দিয়ে বললেঃ গৃহ-প্রবেশ উৎসব!...আমায় যেতে বলছ?

পণ্ডিত দ্বারিকের হাত ধরে তুলে বারান্দায় নিয়ে এল। বললঃ তুমি আমার পুরানো বন্ধু। তুমি না এলে উৎসব অপূর্ণ থাকবে।

পণ্ডিত নিজেই দরজা ভেজিয়ে দিয়ে শিকল তুলে দিল। বললে ঃ তালা দেবে না ?

ঃ না।···দ্বারিক বললে। তারপর পণ্ডিতের সাথে সাথে উঠানে নেমে এল। ঘরে তালা ঝুলাবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে এসেছে।

ঃ কিন্তু আমার টাকা ? আমার বাগান-বাড়ী ?···সহসা করুণস্বরে বললে দ্বারিক।

ঃ ভুলে যাও।···পণ্ডিত বললে ঃ তোমার টাকায় যদি দেশের দশটা লোকের উপকার হয়ে থাকে, সে ত খুসীর কথা। তোমার টাকা তোমারই আছে—একদিন-না-একদিন টাকা ওদের ফিরিয়ে দিতেই হবে। আর বাগান-বাড়ীর কথা যদি বল, বাগান-বাড়ী আজও তোমার।

বিস্মিতস্বরে দ্বারিক বললে ঃ আমার ?

পণ্ডিত বললে ঃ তোমার বৈ কি ! ভেবে ছ্যাখো তোমার বাগান-বাড়ীতে আজ নতুন পাঠশালার গৃহ-প্রবেশ উৎসব। কত গণ্যমান্য ব্যক্তি আসবেন—কত চাষী-মজুর আসবে। নতুন পাঠশালায় লেখা-পড়া শিখে দেশের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে উঠবে। তুমি—আমি তোমার গিয়ে যাদের নিজেদের কেউ নেই, দেশের ছেলেমেয়েরাই ত আমাদের ছেলেমেয়ে ! ভেবে ছ্যাখো, সত্যি কিনা ?

দ্বারিক মাথা নাড়ল।

পণ্ডিত যেতে যেতে বলল ঃ ঐ অতবড় বাড়ীটা পাহারা দিতে তোমার প্রাণান্ত হত। কি কাজে লাগত ঐ বাড়ী তোমার ?···এখন

আর বাড়ী পাহারা দিতে হবে না। ছেলেমেয়েরাই তোমাকে পাহারা দেবে বরং।

ঃ সত্যি বলছ ?···দ্বারিক শুধাল।

উত্তরে পণ্ডিত তার কাঁধে একটু চাপ দিলে। কথা বলতে বলতে তারা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। কবিরাজ আসছে দেখে পণ্ডিত থমকে দাঁড়াল।

ঃ এই যে পণ্ডিত!···কবিরাজ এগিয়ে এসে বললেঃ শুনলাম আজ নাকি নতুন পাঠশালায় গৃহ-প্রবেশ উৎসব!

পণ্ডিত বললেঃ শুনেছ ঠিকই। তোমাদের ডাকতে এসেছি, চল।···

কবিরাজ খুসীতে দাঁত বার করে বললেঃ তা আর যাব না? নিশ্চয়ই যাব।···তারপর দ্বারিকের দিকে তাকিয়ে বললেঃ তুমিও যাচ্ছ ?

দ্বারিক অনিশ্চিতভাবে পণ্ডিতের দিকে তাকাল। বললেঃ সত্যিই আমায় ডাকছ পণ্ডিত ? আমি ··

পণ্ডিত দ্বারিকের হাত ধরে সামনে এগোতে এগোতে বললেঃ সত্যি মহাজন! তরুণের বিজয়-নিশান আমাদের ডাকছে, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল! তোমার গিয়ে, পিছু পড়ে থাকলে চলবে কেন ?

···নতুন পাঠশালায় ছাত্রদের বিজয়-নিশান উড়ছিলঃ

স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি।